শেষ প্রশ্ন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

...ন অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কো:
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকা...

প্রথম সংস্করণ,
আশ্বিন, ১৮৮১ শকাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ,
জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৫ শকাব্দ

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

কিছুকাল পূর্ব্বে এই গল্পটা ভারতবর্ষ মাসিক পত্রে ধারাবাহিক লিখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু নানা কারণে মাঝখানে বন্ধ হইয়া থাকে। অনেকদিন পরে আবার লিখিতে গিয়া দেখিলাম, গোড়ার দিকের অনেক অংশই পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। সুতরাং ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্যাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই, এ কথা বলা প্রয়োজন।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৮।

—গ্রন্থকার

এক

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী-পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা সহরে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াহুড়া ছাড়া ইহাদের অতিশয় নির্ব্বিঘ্ন জীবন। বাদশাহী আমলের কেল্লা ও ইমারত দেখা ইহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙা ও আভাঙা যেখানে যত কবর আছে, তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে; এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যার উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া, যমুনার এপার হইতে, ওপার হইতে, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোক কবে কি বলিয়াছে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে স্বমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়ঘর ছিল, কোন্ জাঠসর্দ্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে, সে কালির দাগ কত প্রাচীন—কোন্ দস্যু কত হীরা মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত, কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই। এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী-সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আ[illegible], আমেরিকান টুরিষ্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন-ফেরত বৈষ্ণবদের পর্য্যন্ত মাঝে [illegible] ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, [illegible]ন সময়ে একজন প্রৌঢ়-বয়সী ভদ্র বাঙালী-সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা, স্বরূপা পূর্ণযৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য-উদ্ধারের অজুহাতে সহরের একপ্রান্তে মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা, বাবুর্চ্চি, দরওয়ান আসিল; ঝি, চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, শোফার,

সহিস, কোচম্যানে এতকালের এত বড় ফাঁকা বাড়ীর সমস্ত অন্ধরন্ধ্র যেন যাদু-বিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক; কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি-বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্ব্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। মনোরমা বাড়ীর ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাহাকে পর করিয়া না রাখেন। এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুসী হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ী এবং মোটর যখন-তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনাগোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন, গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনের হৃদ্যতা এমনি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক এ কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ-খানেকের অধিক সময় লাগিল না; কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। ইঁহারা হিন্দু বা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয় না। তবে আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া যতটা বুঝা যায়, সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে, ইঁহারা যে সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ বাছবিচার করিয়া চলেন না। বাড়ীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না-জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিতা রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তিনি মূলতঃ যে সমাজেরই অন্তর্গত হোন, বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ মুখুয্যে কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর-দশেকের একটি ছেলে; অবিনাশ

কলেজে পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা সচ্ছল—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর-দুই পূর্ব্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জ্বর ছাড়িল কিন্তু ভগিনীপতি ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহে তিনি কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন, বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে—বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ ক'রো না—কপাল! নইলে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্ব্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেন্টিং, মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এই দিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস-পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোক সমাগম ঘটে। আজ কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন-দুই নীচের ঢালা বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন-দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকী সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটা মাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমন সময় মস্ত একটা ভারী মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতেই সকলে সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন জল হইয়া গেল, ওদিকের খেলাটা উপস্থিত মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে পড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্ত্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বদ্যির অসময়? এত বড় দুর্নাম যে আমার ছোটখুড়োও দিতে পারেন না, অবিনাশবাবু?

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বলচ বাবা ?

আশুবাবু বলিলেন, তবে যাক ছোটখুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি. কিন্তু এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাকরুণের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বলব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে যে পায়ের ধূলোয় এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধূলো ঝাঁট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখতে হ'তো অবিনাশবাবু। কিন্তু আজ আর বসবার যো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্য্যন্ত টেনে এনেছি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যের পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেছি—সপরিবারে যেতে হবে। তারপর একটু মিষ্টিমুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরী করলে হবে না। আর একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস্, মেয়েদের জন্য না হোক, আমাদের পুরুষদের জন্য দু'রকম খাবার ব্যবস্থাই—অর্থাৎ কিনা —প্রেজুডিস যদি না থাকে ত—বুঝলেন না ?

বুঝিলেন সকলেই এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন সকলেই যে, তাঁহাদের প্রেজুডিস্ নাই।

আশুবাবু খুসী হইয়া কহিলেন, না থাকারই কথা। মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলো না। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফিরতে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এসো মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহশূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার সখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত ; কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে ! মাছ-মাংস পিঁয়াজ-রসুন, ও ত স্পর্শ করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাংস খান না ?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই কিন্তু বাবাজীর ভারী অনিচ্ছে, সে হ'লো আবার সন্ন্যাসী গোছের মানুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি সমস্ত বলে যাচ্ছ বাবা!

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন এবং কন্যার কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিল না।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিল না এবং আরও দু-চার মিনিট যাই ইঁহারা বসিয়া রহিলেন, আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষণ্ণতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবুর পুত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত; নিজে আজও সে অনূঢ়া—আয়তির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্প ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ এই সন্ন্যাসী গোছের বাবাজী যেই হোন, অথবা যেখানেই থাকুন তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ তাঁহার নিষেধ নহে, কেবলমাত্র অনিচ্ছার চাপেই এত বড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস রসুন-পিঁয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এবং লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্তমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল এবং এই আগন্তুক পরিবারের সহিত মেলামেশার যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

দুই

মনে হইয়াছিল আশুবাবু সহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না; কিন্তু দেখা গেল বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা, শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসর-মহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন, বাড়ীর মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্ব্বে আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন-দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁসফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারী ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলি! মোষ্ট ওয়েলক্যাম্।

ওস্তাদজীদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না যেন! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যই আহ্বান করে আনি নি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন!

শুনিয়া সকলেই খুসী হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেছি মশাই, আবিষ্কার করেছি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা-নয়, সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্য্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহে এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে যে কি বিস্ময়ের বস্তু হয় তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না।

চাহিলে হঠাৎ চমক লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল; কিন্তু প্রতিনমস্কারের কথা কাহারও মনে হইল না, সকলে অকস্মাৎ এমনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক। কই, আমরা ত কেউ খবর পাই নি?

শিবনাথ কহিল, পান নি বুঝি? আশ্চর্য্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, বুঝতে পারি নি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হোক ইঁহারা যে পূর্ব্ব হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তিটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখ-চ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু, রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কেবল মাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ-প্রকৃতি অবিনাশ পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইল না, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল এবং পরক্ষণেই বাড়ীর সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গান-বাজনা শুরু হইতে পারিতেছে না।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল—বিশেষত্ব-বর্জ্জিত মামুলি ব্যাপার, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্র পরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্য সত্যই একেবারে অপূর্ব্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত, অনবদ্য কণ্ঠস্বরে নহে; এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহাতে পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গি, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব্ব

ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গীণ তান-লয়-পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল, তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্ব্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমির খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নেই শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতে গান-বাজনার চর্চ্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টনটন করিতে থাকে তাহা সে জানিত না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেচি। তুলনাই হয় না। এই বছর-খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিট্‌লি ইমপ্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাঁচ্চা লোক বলিয়া বন্ধুমহলে খ্যাতি আছে। গান-বাজনা ভাল লাগাটা তাহার মতে চিত্তের দুর্ব্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে সহরের আবহাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শান্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দ্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইহাদের ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধু-বাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টি লেগে থাক্‌, এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ প্রথমতঃ অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিল না এবং দ্বিতীয়তঃ গানের প্রাণ থাকা না-থাকার সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় আর কাহারও স্পষ্ট নয়। গুণমুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনাবশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে এবং তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন এবং অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর-মহল। ক্রমশঃ তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্যে আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক্ আহারে রুচি ছিল না, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুন্‌ড্লা হইতে আসিবার পর ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং মাত্র দুই-তিনদিনের আলাপেই কি করিয়া সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে আমার কানের। ওঁর গলার অস্ফুট, সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলি নি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক? বলি নি যে, মণি এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা?

কন্যা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক্ না অক্ষয়। থাক্ না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষুলজ্জার দায় এড়াইয়া বার-কয়েক মাথা নাড়িলেন; কহিলেন, না অবিনাশবাবু, চাপলে চলবে না। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্ত্তব্যজ্ঞান করি। উনি—

আহা-হা, কর কি অক্ষয়! কর্ত্তব্যজ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে, হবে এখন আর একদিন।—বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা টলিল না। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারি নে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই নাকি? কিন্তু তার কি স্থান-কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ সহরে যদি আর না আসতেন, যদি ভদ্র-পরিবারে ঘনিষ্ঠ না হবার চেষ্টা করতেন, বিশেষতঃ কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, it is too much.

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, no, it is not.

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা-হা—করচ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রায় উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি করে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্য।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন, মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এই সকল বাদবিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, মিছে কথাই ত? কারণ প্রফেসারি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লেও পরের অর্থাৎ আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হ'তো। আর তাই ত হ'লো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্য।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদে কহিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সে-ই কখনো না কখনো মাতাল হয়। যে

হয় না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাসতে পারেন, কিন্তু এ অপরাধে আমরা ক্ষমা করতে পারি নে।

শিবনাথ কহিল, পারেন, এ অপবাদ ত আমি দিই নি। আমাকে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করবার জন্য আপনারা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন, এ সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা হ'লে আশা করি আরও একটা সত্য এখনি স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না জানি নে। তবে এ জানি, অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেমনি বিপুল। কি স্বীকার করতে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেছেন। সত্য কিনা?

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন—আপনি কি সব বলেছেন অক্ষয়বাবু? এ কি কখনো হয়, না হ'তে পারে?

শিবনাথ নিজেই জবাব দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আশুবাবু। তাঁকে ত্যাগ করে আমি আবার বিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হ'তে চললো—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট! তাতে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে দাঁত পড়ে, চুল পেকে একেবারে বুড়ী হয়ে গেছে। এই জন্যেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হ'ল।

আশুবাবু বিহ্বলচক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—অ্যাঁ! শুধু এর জন্য? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না। মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্মল সাধুতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ লোকসান চুলোয় যাক, একবার মিথ্যে

করেই বল যে, সে গভীর অপরাধ করেছিল। তাই তাকে ত্যাগ করেছ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বে না।

শিবনাথ রাগ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এরকম অযথা কথা আমি বলতে পারি নে।

হরেন্দ্র সহসা জলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিল না, শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখভোগ করে যাওয়াটাই জীবনধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে, অসুখ ত অপরাধ নয় শিবনাথবাবু? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেন না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হ'লো কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধ হয় বাপ-মা নেই?

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝির বিধবা মেয়ে।

বাড়ীর ঝির মেয়ে! চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানি নে। তাঁতি-টাঁতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর পরিচয়-টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করি নি, করেচি রূপের জন্য। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারী হইয়া রহিল। কৌতূহলে ও উত্তেজনার বশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা হ'লে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহই হ'লো?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না—বিবাহ হ'লো শৈবমতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশ দিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ?

শিবনাথ সহাস্তে কহিল, এটা ক্রোধের কথা, অবিনাশবাবু! নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে ত ফাঁক ছিল না, অথচ ফাঁকি যথেষ্টই ছিল। সেটা বার করার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল! এ কি হইল!

মিনিট দুই-তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক এমনি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক, যাক, যাক—যাক, এসব কথা; শিবনাথ, তা হ'লে সেই পাথরের কারবারটা করচ না?

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর নাবালক ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হয়? তাদের মা আছেন না? অবস্থা কেমন? তেমন ভাল নয় বোধ হয়?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা! হঠাৎ মারা গেলেন, আমরা ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন; কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে! অকৃত্রিম সুহৃদ!

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমার এতখানি সে সময়ে তিনি করতে পেরেছিলেন। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে, একটা অংশের দাবী করলে না কেন? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিল না, কহিল, অংশ কিসের? কারবার ত একলা আমার।

প্রফেসারের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি রকম, শিবনাথবাবু?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বইকি!

অক্ষয় বলিলেন, কখখনো না। আমরা সবাই জানি যোগীনবাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন? কোন ডকুমেণ্ট ছিল শুনেছিলেন?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনি নি কিছুই; কিন্তু এ কি আদালতে পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল নাকি?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রী আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বেশ হয়েছে। তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত বিধবাদের কিছুই দিতে হ'লো না।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপটা খাসা রেঁধেচ হে। আর দু-একটা আন ত?

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কই আপনারা ত কিছুই খাচ্চেন না?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল; শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হ'তেই যে বড় চলে যাচ্ছেন?

মনোরমা একথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; ঘৃণায় তাহার সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।

তিন

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহ কাল গত হইয়াছে। দিন-দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে-কোন সময়েই পুনরায় সুরু হইয়া যাইতে পারে, এমনি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটা রকমের একটা বালাপোষ গায়ে দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাও নি, আজ যে আমাদের এতবারী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল মা, কিন্তু আমার সেই কোমরের বাতটা—

তা হ'লে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি'। কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে! তুই না হয় একটু ঘুরে আয় গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিক পত্রিকাটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল।

আচ্ছা চললুম; কিন্তু ফিরতে আমার দেরী হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনব তা বলে যাচ্চি, বলিয়াই সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ী ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা? শেষ হ'লো? কি লিখেচে?

কিন্তু কথা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল, তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

মনোরমা উত্তর দিল না, শুধু নমস্কারের পরিবর্ত্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা? কেমন লাগল?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা হ'লে আমি নিয়ে যাই, পড়ে এখখুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।—বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড় ছাড়া, হাত মুখ ধোয়া পড়িয়া রহিল, কাগজখানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন্ গল্প, কে লিখিয়াছে কিংবা কেমন লিখিয়াছে।

এই ভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, এই সময়ে চাকরটাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে?

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন গেল?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশী নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুষলধারায় বারিপতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জান এসব আমি ভালবাসি নে। এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছে কি আমি বলচি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জান নে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথবাবুর মত একজন দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্চ?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপীকৃত করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাববশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেই দিকে চক্ষু নির্দ্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া

একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সংবাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল। শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলাম না, আশুবাবু। এখন তা হ'লে চললাম!

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে!

শিবনাথ কহিলেন, তা হোক। ও বেশি নয়। এই বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সেজন্য আপনি লজ্জিত হবেন না। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হ'লেও আমাকে শুনিয়ে বলেন নি। অত নির্দ্দয় আপনি কিছুতে নন।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি যেন একটা মতলব নিয়ে এ বাড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেচি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়—এও আর একটা কথা; কিন্তু যাই হোক আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিল না, আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশী দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধূলো দেবেন, আমি খুশীই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেন না। আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাইরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল, এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরী করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, না, আমার জন্য নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারে নি, ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী-মেয়েদের মত কাপড় পরা—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বললেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে বাবুটি এইমাত্র গেলেন তিনিই কিনা; কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল মেয়েটি শিবনাথের স্ত্রী নহে ত?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথবাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতুম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা বটে মণি; কিন্তু আমার ভয় হচ্চে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ বাড়ীতে আনতে পারেন নি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সেই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল এ বাটিতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কিনা, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু, ওঁদের দুজনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন কে ডাকচে, আমার নাম ক'রো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি, কাজটা হয়ত ঠিক হ'লো না।

কেন বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক—তার

কথা আলাদা; কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানি নে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। ঝি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা!

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা-কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু করব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিল না। বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে, আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্ছি নে।

মনোরমা কহিল, আমার উপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্কহাস্য করিলেন, বলিলেন, তা আছে। তবুও জিনিষটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চি নে। তোমরা যাঁরা সমশ্রেণীর লোক, তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জান। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দ্দোষ, কিন্তু এ হ'লো—কি জান মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ আকরণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাই নে।

মনোরমা বুঝিল এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ, মা? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট জানা নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছে শিবনাথ যেন না আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আসচেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন—বেশ যা হোক শিবনাথবাবু, ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল, তা আমার চেয়ে ইনিই ভিজেচেন ঢের বেশী! এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইঁহারাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছুই ছিল না। জামা

কাপড় ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জলধারা গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। আশুবাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্ব্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয়ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্ত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখাপড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য, তখন তাহাতে কেহ কোন কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারম্বার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবনযাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতিসম্মত নাই হোক, পতি-পত্নী সম্বন্ধে পবিত্রতা ইহাদের মধ্যে নাই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতের তেমনি নশ্বর এই দুটি নরনারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! আর পরমাশ্চর্য্য এই, যে দেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যে দেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সংবাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্ত্ত-কালের অধিক সময় লাগিল না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড়জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সমবয়সী এবং সিক্ত-বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন; কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে, তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। রূপ ইহার যত বড়ই হোক, শিক্ষাসংস্কারহীন নীচ-জাতীয়া এই দাসী-কন্যাটিকে 'এস' বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেমনি ঘৃণা বোধ হইল; কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়ে দিতে হবে।

দিচ্ছি। বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফর্সা—ধোপার বাড়ীর কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাথা-সাবান গায়ে মাখি নে, ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে; কিন্তু শুনচেন, দিদিমণির স্নানের ঘর! তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারি নে, আমার ভারি ঘেন্না করে। তা ছাড়া যার-তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখে ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নির্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখব? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা হ'লে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাৎ মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুণ, সাবান-টাবান মেখে আগে তৈরী হয়ে নাও, তারপরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নেব! দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্যদিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত সে এই অপরিচিত, অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের ওপরে কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

চার

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়; তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য পালনীয় বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংই স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে, কিন্তু ইঁহাদের ঠেকিত না। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসিতেন তাহার সীমা ছিল না; স্ত্রী-বিয়োগের পর আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাঁই দিতেও পারেন নাই, হয়ত তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি। অথচ বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে-তিন মণ ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন সে ত জানি, সেই আশু বত্তির যথেষ্ট।

মনোরমা এ কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার একথা আমার সয় না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে, দুঃখু সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বারো বছরের মেয়ে, জানিস্ ত সব। কার গলায় কিসের মালা পরার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দুচক্ষু ছলছল করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত; কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ

করে নাই এবং পত্নীপ্রেমের নিদর্শন স্বরূপ গৃহের সর্ব্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেচি। অথচ আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি করে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষও দিই নে, ছোটও মনে করি নে। শুধু ভাবি আমি পারি নে। শুধু জানি, মণির মায়ের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব; কিন্তু এ খবর কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশবাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলচি কিনা।

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারি নি আশুবাবু। মাষ্টারি করে খাই, সময়ও পাই নে, বয়সও হয়েচে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই, অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েচি, দেহের ওজন সাড়ে-তিন মণ, বাতে পঙ্গু, কখন চলতে চলতে হার্টফেল করে তার ঠিকানা নেই, মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মরেচে অবিনাশ, মরেচে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি শার্সি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাটির সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেকচে।

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এস, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দুটোর জায়গায় দু'শোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন এটুকুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেন না, সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ী পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হোক, আশু বদ্যির নির্ব্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার যো ছিল না। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সর্ব্বদেহে যৌবনে, স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ—এ সকল কি কিছুই নয়? তবে কিসের জন্য এত সম্পদ ভগবান তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য? মাতাল হইয়াছে? তা কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল ত এমন কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ তিনি নিজেও ত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের ত্রুটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জ্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই বলিয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটিতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেন না, অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোকে এ কাজ করলে কি করে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত ভিতরে কি একটা রহস্য আছে—হয়ত—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বলতে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দ্দোষ এ কথা ত নিজের মুখেই স্বীকার করেচে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা করেচে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা, এটাই বা কি?

আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনি নিজে এ দুষ্কার্য্য করিয়া

ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য—আচ্ছা আদালতই বা তাঁকে ডিক্রী দিলে কি করে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিল, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন, আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল কবে জয়ী হয়েচে আমাকে বলতে পারেন?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়, তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারি নে; কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জান অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করচেন না।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগাইত না।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশি! মুখে সে বিশেষ কিছুই বলিত না, কিন্তু পিতা কন্যাকেই ভয় করিতেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার দিন-দুই পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই; কিন্তু আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা! এমন রূপ কখনও দেখি নি। মনে হ'লো এদের দুজনকে ভগবান কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েছেন।

বলেন কি?

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেন না, তা বলে রাখলাম অবিনাশবাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে; কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা সুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকে না।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে! মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি

নেই। যাই কেননা এঁর সম্বন্ধে বলি মাত্রায় বাঁ-দিকেই থাকবে, ডানদিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্ব্বের পরিহাসের ভঙ্গিও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তাহ'লে অকারণ দম্ভ করে নি বলুন? পরিচয় হ'লো কি করে?

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে আনতে সাহস করেন নি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু বিধি বক্র হ'লে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হ'লোও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড়-বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুশী হ'তে পারে নি। ওর সমবয়সই, হয়ত কিছু বড় হ'তেও পারে, কিন্তু মণি বলে, শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন, মেয়েটি যথার্থ-ই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ সে যে আমাদের ভদ্রসমাজের নয়, তাতে তার সন্দেহ নাই।

অবিনাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, কি করে বোঝা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে কাপড়ের পরিবর্ত্তে একখানি ফর্সা কাপড় চেয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, তিনি কারও ব্যবহার-করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেন না ইহার মধ্যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাই নি; কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গির মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া মেয়েদের চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝি-টির পর্য্যন্ত বুঝতে নাকি বাকি ছিল না যে মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নীচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয়, এরও হয়েচে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা; কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'লো কিভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে নাকি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে, জায়গাটা ভাল লাগচে কিনা—প্রশ্ন করবার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব! বরঞ্চ শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেন না?

না। তার যে কি অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বললাম, মণি, ওদের বিদায় দিতেও একবার এলে না? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ীর দাসী-চাকরকে 'বসুন' বলে অভ্যর্থনা করতেও পারব না, 'আসুন' বলে বিদায় দিতেও পারব না। নিজের বাড়ীতে হ'লেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি!

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু; কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেচেন! এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে ত জানে সবই, তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, হ'তেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন না, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া শুইলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন?

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন না, তেমনি অৰ্দ্ধশায়িতভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন একটা ব্যথার মত লেগেচে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এমন ছটফট করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির—শুধু রূপই নয়!

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তার রূপও দেখি নি, কথাও শুনি নি আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান না? আমি যে কেউ আছি এ কথা নাই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবি করি নে।

অবিনাশ কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, এ ত খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয়, আশুবাবু? শুনলে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্রসমাজে চালিয়ে নিতে চায়।

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ তার কথা শুনে মনে হ'লো সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম, এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করে নি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে; কিন্তু একটা জিনিষ নিশ্চয় সে গোপন করেছে! এই মেয়েটি যে-ই হোক, একে ত সত্যিই বিবাহ করে নি!

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন মেয়েটি তার স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়, কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু এদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই, সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়? অবিনাশবাবু, আপনি ত অক্ষয় নন, এ ত আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করি নে।

অবিনাশ লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে। তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তার শেষ হইতে পাইল না, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হ'তে পারবে না?

না মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নাবিয়ে দিতে পারবে না মনোরমা?

নিশ্চয় পারব, চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে এবং বোধ হয় এক সপ্তাহের পূর্ব্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

পাঁচ

দিন-দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর-দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা—বৈকালে নিশ্চয় আসবেন!—আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসী দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল নাকি—আসতে না আসতেই জরুরি তলব পাঠিয়েছে, যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যেমশাইকে গিলে খেতে চায় নাকি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোটগিন্নী, কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোটগিন্নী, অমৃত ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখলে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বই কি?

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা হ'লে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো; কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বে না।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবে না মুখুয্যেমশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখবো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধার্ম্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত—ইতিমধ্যে অধীনের দশ দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একেবারে দশ-দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দুটো শুধু তাজা হয়েছে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হ'তে উপর এবং উপর হ'তে নীচে গমনাগমন সুরু করেছে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে, আজ কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা-কূলে সমবেত হয়েছেন এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত সমাজ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

ভাল কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু বদ্যি অতি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করেছেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশু উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েছে, বাবাজী স্বয়ং মেরামত কার্য্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্তপ্রায় এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসিমুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটি কে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বলতে গিয়ে হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ; কিন্তু আজ আর বলতে অন্ততঃ আপনাকে বাধা

নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্মসমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম হিন্দুমতেই হয়। যথা-সময়ে, অর্থাৎ বছর-চারেক পূর্ব্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হ'তোও তাই, কিন্তু হ'লো না। কেমন করে এদের পরিচয় ঘটে সেও এক বিচিত্র ব্যাপার—বিধিলিপি বললেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সে কথা এখন থাক।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়ে-হলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়ীতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ীর কর্ত্তা, ছেলেপুলে নেই, খুড়ীমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বললেন, এ বিবাহ এখন হ'তে পারে না। তিনি নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে, এখন বিবাহ হ'লে তিন বৎসর তিন মাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলস্থুল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হ'লো, কিন্তু খুড়োকে আমি চিনতাম, বুঝলাম এর আর নড়চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড়লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ী ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না, তিনি ভয়ানক রাগ করলেন, অজিত দুঃখে, অভিমানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপরে?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হ'লাম, হ'লো না শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বললে, বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে যার জন্য তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে? তিন বছর এমনিই কি বেশি সময়?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে ত জানি। বললাম, মা, তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু এসব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বললে, তোমার ভয় নেই বাবা, আমি তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচল

বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোনদিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখে নি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জানতো এবং তখন থেক সেই যে ব্রহ্মচারিণী জীবনযাপন করলে, একটা দিনের জন্যও তা থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার যো নেই অবিনাশবাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার যো নেই; কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে না। অজিত সর্ব্বাগ্রেই খুড়োমশায়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। না হ'লে এখানে বোধ করি সে আসতো না।

অতঃপর উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেল, বছর-দুই পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করি নি তা নয়; কিন্তু মণি জানতে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বললে, বাবা, এ চেষ্টা তুমি ক'রো না। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান কর নি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বললাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা, কিন্তু মেয়ের দুচক্ষে যেন জল ভরে এলো। বললে, হয় না বাবা। শুধু কথাবার্ত্তাই হয়, কিন্তু তার বেশি— না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেছেন, তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি ক'রো না। দুজনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, মুছে ফেলে বললাম, অপরাধ করেছি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি এবং কত অন্যায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কিসের?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে মেমসাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তার হৃদয়ে স্থান পায় না। কত বড় ভ্রম বলুন ত?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে; কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া, না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে।—এই যে অজিত! মণি কই?

বছর ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য করছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেছে, তাই বদলে ফেলতে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সামনে আনতে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মণির আসতে মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগবে না; কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরী হ'লে সব দেখবার সময় পাওয়া যাবে না। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটে না।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না-মেটবারই যে জিনিষ বাবা; কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ তোমারই দেরী, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকী।

ছেলেটি নিজের পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদলাতে হবে না, এতেই চলে যাবে।

এই কালিসুদ্ধ?

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের

উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই; কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাধাসিধা পোষাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল পিতৃস্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটর-যানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যলুব্ধ নারী ও রূপলুব্ধ পুরুষের ভীড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই তাহাদের সাজসজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্বখ্যাত, অনন্ত সৌন্দর্য্যময় তাজের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে আসিতেছে।

যমুনা-কূলে যাহা কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দলবল ইতি-পূর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বাতব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতি গুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিন্যস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ— বাঁচা গেল! এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ কর গে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই বেগমসাহেবাকে কুর্নিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাঁকে দিয়ে হবে না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সে হবে না বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারব না।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল, লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ কহিল, তা' যদি হযে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে এ কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে বস্তুর মর্য্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হ'তো না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, মনোরমা বলিল, সে হবে না বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে, এর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েই থাকবে। যিনি যত খবর দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশী জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না দেখার ভাণ করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, আশুবাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে!

আশুবাবু উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন এলেন শিবনাথবাবু? এদিকে আসুন।

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, শিবনাথের স্ত্রী; আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানি নে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল; কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়! কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীর পরিচিত। বসো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইযা বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না।

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বইকি। উনি আমার—উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিনকয়েক হ'লো বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখতে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখলে?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা হ'লে তুমি ভাগ্যবতী; কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেননা এই পরম বিস্ময়ের জিনিষটি সে কখনো দেখে নি, এইবার দেখবে; কিন্তু আলো কমে আসচে, আর ত দেরী করলে চলবে না অজিত।

মনোরমা বলিল, দেরী ত শুধু তোমার জন্যই বাবা? ওঠো।

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্য যে আয়োজন করতে হয়।

তা হ'লে সেই আয়োজন কর বাবা।

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি রকম মনে হ'লো?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হ'লো।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইল না। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, ওঠো এইবার।

উঠি মা। বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ প্রস্তাবের জবাবও দিল না, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা, সে হবে না। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্ম্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন একমুহূর্ত্তেই ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে।

অবিনাশের চমক ভাঙিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবে না। মনোরমার বিশ্বাস ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি করা যাবে না।

কমল সরল চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলা ত ঠিক অশিক্ষিত দাসী-কন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানি নে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই—সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানি নে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিও নে কমল। আমি দেখি সম্রাট্ সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখান। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম, যা এই মর্ম্মর কাব্যের সৃষ্টি ক'রে চিরদিনের জন্য তাঁকে এই বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট্ মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশী হতে পারে কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না।

(এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিংবা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।)

কমল কহিল, সম্রাট্ ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন; তাঁর শক্তি, সম্পদ্ এবং ধৈর্য্য দিয়ে এত বড় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম্ম উপলক্ষ হ'লেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র লক্ষ মানুষ-বধ-করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হ'লেও এমনি চলে যেতো! এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি নাই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতিসৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করুন না, মানুষের অন্তরে সে শ্রদ্ধার আসন আর থাকে না।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোক তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেছি, কোনদিন

কোন কারণেই আর পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়!

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসী-কন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না, অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের পক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছিঃ মা!

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারে না। আপনি সত্যিই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহমনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে—এ মরেছে।

এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কিনা, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি?

অজিতের চমক ভাঙিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসি গে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি, কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

ছয়

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ঝুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয়, রব তিনি ইতিপূর্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া উর্দ্ধভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া লইলেন, কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসৎ পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ, ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেমনিই ক্লান্ত ও মলিন; সে যেন কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গিয়াছে।

আশুবাবু শুধু বলিলেন, ব'সো; কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিংবা বসিল কিনা সে দেখিবার সময় পাইলেন না।

অবিনাশ বোধ করি অক্ষয়ের যুক্তিমালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, সম্রাট্ সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক, তার সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল; কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্ব্বেলের মত সাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিল না, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের চেষ্টার ত্রুটি

ছিল না—জানি ত সব, কিন্তু একথা উনি ভাবতে পারলেন না—তাঁর মৃত স্ত্রীর জায়গায় আর কাউকে এনে বসান যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কত বড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিল, এখন এ আলোচনা থাক।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিলেন, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিল না—সেই উদাস অন্যমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিল না, জানিবার চেষ্টাও করিল না।

কমল কহিল, ও—এমনিই। তোমার বাড়ী যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়ীটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হইল না—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া, যেন দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

অবিনাশের দেরী সহিতে ছিল না, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে! তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেন না, কহিলেন, এ ক্ষেত্রে অপরাধ হবে না। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি বল।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি ভালবেসেছি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝতে পারচি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করেছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, কহিলেন, কিন্তু আমার দি[ক] থেকে তোমার কুণ্ঠাবোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশু বদ্যি ব[...]

নিরীহ মানুষ কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেছ, আরও দিন-দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল, এসব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক,এইজন্যই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এই জন্যই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বলতে বাধচে যে নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করি নে, আদর্শ বলেও মানি নে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গিতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেন না, কিন্তু কি মানেন একটু শুনতে পাই কি?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করা যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন ক'রে, বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুবজ্ঞানে জীবনযাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাই নে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিষটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বৈধব্য-জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। একি তুমি মানো না?

কমল বলিল, না। একটি বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিষ সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরঞ্চ বলুন এইভাবে এ দেশের বৈধব্য-জীবন কাটানোই বিধি, বলুন, একটা মিথ্যাকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে—আমি অস্বীকার করব না।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে—না থাক, ব্রহ্মচর্য্যের কথা আর তুলব না, কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবনযাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্যাদাটাও দেব না?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে মর্য্যাদা পেয়ে শেষে এমনি স্ফীত-হয়ে উঠেছে যে, তার আর স্থান-কাল কারণ-অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে; কিন্তু অবস্থা বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয়, এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদিবা ভয় হয়, আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিই নে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ ক'রে না দিলে স্বীকার করেন না?

কমল জবাবও দিল না, রাগও করিল না, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেন না, তিনি আশুবাবু। অথচ কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশি।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এসব কদর্য্য ধারণা আমাদের ভদ্রসমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্রসমাজে অচল হয়েই ত আছে। এ আমি জানি।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল, পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্য বলছি নে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু ভাবে না—এই যেমন আমি। মনির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনও কল্পনা করতেও পারি নে!

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন, আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েছি মানি, কিন্তু সেদিন ত বুড়ো ছিলাম না; কিন্তু তখনো ত এ কথা ভাবতে পারি নি?

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক

একজন থাকেন যাঁরা বুড়ো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। সে বুড়ো শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো মন খুশী হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ! হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্ব কথা! তার কত রকমের কত ভাল ভাল বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা! দুই কান পূর্ণ ক'রে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দলোকের বিসর্জ্জনের বাজনা, এ কথা সে জানতেও পারে না।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়া প্রয়োজন—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া এই উন্মাদ-যৌবনের, এই নির্লজ্জ স্তবগানে সকলের কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন আশুবাবু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে এ সত্যিই কিনা।

কমল কহিল, মনের বার্দ্ধক্য আমি ত তাকেই বলি, আশুবাবু, যে মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশার জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই—বর্ত্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্ব্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকি দিন ক'টা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু, নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময়মত একবার দেখব বইকি!

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আমার একটা প্রশ্ন—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস্ কিসের জন্য? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না?

অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল—না না, সে কি, সে কেমনধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমনধারা নয়। বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন

আমাকে ডাকবার জন্যেই ত। ওতে আমি রাগ করি নে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা, তাই বলে যদি আমি ডাকি, আপনি রাগ করেন নাকি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায় বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত ক'রে শুনতে চায়। দেখেন না রাজারা তাঁদের নামের আগে-পিছে কতকগুলো নিরর্থক বাক্য দিয়ে, কতকগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়। নইলে তাঁদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিলেন, যেমন ইনি। কখনো কমল বলতে পারেন না, বলেন, শিবানী। অজিতবাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাটাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ আমি ত বুঝবই।

কিন্তু কি যে হইল এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিল না, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অঘ্রাণের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা, হিম পড়তে শুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েছেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েছেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, উপরের —উনি। এই বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সবদিক দিয়ে মিল করবার জন্য যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয়

যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন?

অক্ষয় বলিল, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই, তাই জিজ্ঞাসা করি, শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যই বিবাহ হয়েছিল?

আশুবাবু মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট!

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই; কিন্তু আমাদের ত আছে।

কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাসার কথাই না ইহার মধ্যে আছে। কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু? আমি বলচি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয় নি তা নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহই নয়—ফাঁকি। ওঁকে জিজ্ঞেসা করতে বললেন, বিবাহ হলো শৈব মতে। আমি বললাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে শৈবমতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে!

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কিনা, তাই কোনদিন যদি উনি হয় নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই, কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এই রকম কোনদিন?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিল না, তেমনি উদার গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট! উনি যাবেন হয় নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না কি?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই; কিন্তু সে হবে না। আমি আত্মহত্যা করতে যাব এ কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেন না।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা, কমল।

কমল তাহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গিতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানি নে তারই দড়ি দিয়ে ওকে রাখব বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানী, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়।

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলি নে। এই যেমন প্রাণও সত্য দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারি হিম পড়ছে, এখন না উঠলেই যে নয়।

এই যে মা উঠি!

অবিনাশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানী, আর দেরী ক'রো না, চল!

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলকে নমস্কার করিয়া, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'লো যেন কেবল তর্ক করার জন্যই। কিছু মনে করবেন না।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে শিবানী, শিখলে না কিছুই।

কমল বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, না; কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চে না ত!

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইল। পার যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই!

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বলচ কি আজ?

শিবনাথ জবাব দিল না, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চল।

আশুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য্য!

সাত

আশ্চর্য্যই বটে। এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া—পর্দার ও-পিঠে না-জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচর রহিল। সকলেরই মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এইজন্যই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশিরসিক্ত মন্দ জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেতমর্ম্মর মায়াপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠলে তোমার সত্যিই অসুখ করবে বাবা!

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়চে, উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেন্দ্রের টাঙ্গাওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশী ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব কোনমতে ঠেসাঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ। কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন দাসীর মেয়ে হতে পারে না। অসম্ভব! এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ ত গৌরবের পরিচয় নয়, অবিনাশবাবু।

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাবচি!

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হই নি।

এই সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝতে পারি, অত সহজে আমাকে ঠকানো যায় না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপরে! আপনাকে ঠকানো! একেবারে monopolyতে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রূর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্রঘরের culture সিকি পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায় না, অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দু-ই এক, অবিনাশবাবু। দেখলেন না, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাসার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বললে, এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বললেন, তাই নাকি? Absolute indifference, আপনারা কি নোটিশ করেন নি? এ কি কখনো ভদ্র-কন্যার সাজে, না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষন পর্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই অবস্থায় তাঁহার ধ্যান ভাঙিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর form-টার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যা হোক কিছু একটা হ'লেই ওর হ'লো। স্বামীকে বললে, ওরা যে বলে বিয়েটা হ'লো ফাঁকি। স্বামী বললেন, বিবাহ হলো আমাদের শৈবমতে! কমল তাই শুনে খুশী হয়ে বললে, শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে আমার শৈবমতে ত সেই ভাল। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু!

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরে বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেসা করা—হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এই রকম? দেবে নাকি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তারপরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া একটু মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি, আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিলেন না, বলিলেন, আপনারা অবাক্ করলেন অবিনাশবাবু। তাদের যা কিছু সমস্তই মিষ্টি-মধুর, এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা 'নী' যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো?

হরেন্দ্র কহিল, 'নী' যোগ করাতেই হয় না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাকলেই কি মধু ঝরবে!

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হরেনবাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি; আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে, সহস্র খোঁচাখুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায় না। হইলও তাই। অক্ষয়, বাকী পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িল। সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য্য পরিহাস করিয়াছে এবং শিবনাথের শৈবমতে বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে অভিজাতের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ তাহার শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক, ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারম্বার প্রতিপন্ন করিতে করিতে গাড়ী আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেল, হরেন্দ্র ও অক্ষয়কে পৌঁছাইয়া দিতে গাড়ী চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ীর মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়-বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিত না। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বের ধারণা কি আজ বদলায় নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা?

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর তেমনি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধ হয় তেমন কান দেন নি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতিধ্বনি মাত্রই হ'তো ত এ কথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হ'তো না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারের ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এত বড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, কেবল এরই জন্য আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল—তার সেদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু সমস্ত ছলাকলা সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিনতে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—কি যে তোরা সব বলিস মা?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই, আশুবাবু! যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয় নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এখানেই মস্ত মতভেদ আছে।

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে ত শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখচো সে তুমিই জান বাবা; কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়?

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব ত তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায় নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায় নি।

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ পেলেই তার মিথ্যাচার হ'তো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্ব্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে ভালবাসা যায় এই কথাই আমাকে সে বলেছে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে আমাকেও খেলো করে নি, নিজেকেও অপমান করে নি! এই ত ঠিক, এতে ব্যথা পাবার ত কিছুই নেই, মণি!

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, সেই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিত না, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপ্সা—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইল না, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হ'লে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হ'লো না। যাই হোক, তার কাছে নেই।

তা হ'লে আত্মসংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন, সে শুধু নিষ্ফল আত্মপীড়ন। আর তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকান নয়, পৃথিবীকে ঠকান। তার মুখ থেকে শুনে মনে হ'লো কমল এই কথাটাই কেবল বলতে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুনলে ভারি বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিলেন, বিস্ময় লাগে! সর্ব্বশরীরে জালা ধরে না? বাবা, কখনো কোন কথাই কি তুমি জোর করে বলতে পারবে না? যে যা বলবে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ ত দিই না মা; কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকে না, অন্য পক্ষও ঠকে। যে-সব

কথা তাঁর মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলে নি। সে যা বললে তার মোট কথাটা বোধ হয় এই যে, সুদীর্ঘ দিন সংসারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে সত্য বলে পেয়েছি, সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুজে মাথা নাড়ালেই হবে কেন, মণি!

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটা দেখবার লোক ছিল না?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভাল করে জান যে শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোনো দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হ'লে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কহিলেন, তুমি বোধ করি কিছুই বুঝতে পারচো না, না?

অজিত ঘাড় নাড়িল, আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোমকুণ্ডের আগুন জেলে দিলেন, লোকে চেয়ে দেখবে কি ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ তুলতেই পারলে না। অথচ মজা এই যে আমাদের মামলা হ'লো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তাঁর চাকরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈবমতে—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জানলেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞেস করা হ'লো, মেয়েটি কি ভদ্রঘরের? শিবনাথ বললেন, সে তাঁদের বাড়ীর দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হ'লো, মেয়েটি কি শিক্ষিত? শিবনাথ জবাব দিলেন, শিক্ষার জন্য বিবাহ করেন নি, করেছেন রূপের জন্য। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাই নি, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তার 'পরেই সবচেয়ে বেশি। আর এই হ'লো সমাজের সুবিচার!

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজের অক্ষয়-বাবুরাও ত আছেন, তাঁহারাই ত প্রবল পক্ষ!

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হ'লে ডেকে আনতে বোধ হয় ?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেন না, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই আসে মা ?

অজিত বলিল, আশ্চর্য্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েচেন তিনি সবচেয়ে বেশি।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে, অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানি নে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয়। ভাবি, এইবার গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়ে না, ভয়েরও দাগ লাগে না। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবে না। দেবতার দলই আসুক, আর দৈত্য-দানাতেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্ত, শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুশী ; কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইল না, আশুবাবু অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেন না অবিনাশবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, সেখানে কি করেছি না করেছি নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। একেবারে নাড়ীনক্ষত্র টেনে বা'র করে আনবে। তখন ?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেত গিয়েছিলেন নাকি ?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে। বাবা ব্যারিষ্টার। বাবা ডক্টর।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি ?

আশুবাবু তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে মেয়ে নিয়ে এখানে সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বললেন সমস্ত চিত্ততলটা একেবারে ধুয়ে মুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে। ছাপছোপ কোথাও কিছু বাকি নেই।

সে যাই হোক, দয়া ক'রে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেন না।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারি ভয়?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচি নে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হ'লে একেবারে মারা যাব।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু বলিলেন, অন্যায় হোক মা, আত্মরক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল, মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয়বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে কর?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোলমেলে বস্তু মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে: কিন্তু সে ত হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেছে, মীমাংসা আর হ'লো না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনও স্পষ্ট ক'রে বল না। এ তোমার বড অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট ক'রে বলবার মত বিদ্যেবুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি, সে তোর কপাল। এখন খামোকা আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন বল্ ত?

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেছে, বাইরে বাইরে খানিক ঘুরে আসি গে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে? এই অন্ধকারে?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেরিয়ো না।

না, গাড়ীতেই যাবো।

গাড়ীর ঢাকনাটা তুলে দিয়ো অজিত, যেন হিম না লাগে।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা হ'লে অবিনাশবাবুকে এমনি পৌঁছে দিয়ে যেয়ো ; কিন্তু ফিরতে যেন দেরী না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখচি এখনো যায় নি। এ ঠাণ্ডায় চললো বেড়াতে।

আট

দিন-পনের পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই ; অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা সহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, তাহারই একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ী থামাইয়া দেখিল শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙাচোরা পুরাতনকালের একটা দ্বিতল বাড়ী, সুমুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান, তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিলে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন, আপনি এমনি একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলুম, কিন্তু শুনতে পেলেন না। পাবেন কি করে ? বাপরে বাপ! যে জোরে যান, দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে! আপনার ভয় করে না ?

অজিত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে ? শিবনাথবাবু কই ?

কমল কহিল, তিনি বাড়ী নেই ; কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েছেন কেন ? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভাল ছিল না। তাই তাঁরা কেউ বা'র হন নি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যেবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাকতে পারি নে।

কমল কহিল, আমিও না ; কিন্তু পারি নে বললেই ত হয় না—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নেবেন আমাকে সঙ্গে ক'রে ? একটুখানি ঘুরে আসবো।

অজিত মুস্কিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্য্যন্ত ছিল না, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই ?

কমল কহিল, শোন কথা। সঙ্গী-সাথী পাব কোথায় ? দেখুন না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। সহরের বাইরে বললেই হয়—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধ করি একটা চামড়ার কারখানা আছে—আমার প্রতিবেশী শুধু মুচিরা। কারখানায় যায় আসে, মদ খায়, সারা রাত হল্লা করে—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই ?

কমল বলিল, বোধ হয় না। আর থাকলেই বা কি—আমাকে তারা গাড়ীতে যেতে দেবে কেন ? তা হ'লে ত মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়, তখন আপনাদের ওখানে যেতে পারতুম। বলিতে বলিতে সে গাড়ীতে খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল ; কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়ি নি ; কিন্তু আজ আমাকে অনেক দূরে পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আনতে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইল না, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশী দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ী ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, না—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা হ'লে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুন না ?

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বসলে গল্প করব কি ক'রে ? অত দূরে পিছনে বসে মুখ বুজে যাওয়া যায় ? আপনি উঠুন, আর দেরী করবেন না।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জন, কদাচিৎ এক-আধ জনের দেখা পাওয়া যায়—এইমাত্র। গাড়ীর দ্রুতবেগ

ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল। কমল কহিল, আপনি জোরে চালাতেই ভালবাসেন, না?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করে না?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগছে। বোধ হয় স্বভাব, না?

অজিত কহিল, তা হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও, না?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন?

কমল কহিল, পড়লেই বা অজিতবাবু! দ্রুতবেগের ভারি একটা আনন্দ আছে। গাড়ীরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি; কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুশী, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না। ঠিক না অজিতবাবু?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিল না, বলিল, এর মানে?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্ষণেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই, এমনি।

কথাটা সে যে বুঝাইয়া বলিতে চাহে না, এইটুকু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিল, এরই মধ্যে? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেক দূরে এসে পড়েচি, ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হ'লোই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিলম্ব হ'লে ভাল হবে না।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা সহরে ত গাড়ীর অভাব নেই, তারা

অনায়াসে যেতে পারবেন। চলুন আরো একটু।—এমনি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোক-বিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ এক সময়ে উদ্বিগ্নচিত্তে গাড়ীর গতিরোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরে চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদই না মানুষ নষ্ট করে। আমাকে একলা নিয়ে যেতে আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম, এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘটত না।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখে নিশ্চয় ক'রে ত কিছুই বলা যায় না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে।

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জ্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে ঊর্দ্ধশ্বাসে কত দূরেই না বেড়িয়ে এলাম! আজ আমার কি ভালই যে লাগছে তা আর বলতে পারি নে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই।—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিয়াছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মত হয়ত সত্যই ইহাতে কিছুই নাই, তবুও প্রথমটা সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ওই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধ হয় কেহই কিছু জানে না—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানি মিথ্যা, এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে, তাহারা দেয় না, যেন সমস্তটাই তাঁহাদের কাছে একেবারে নিছক অর্থহীন।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতে কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভাল কথা, কি বলছিলেন ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে? পারে বইকি।

অজিত কহিল, তা হ'লে?

কমল বলিল, তা হ'লেও এ প্রমাণ হয় না, যে আনন্দ আজ পেলাম তা পাই নি!

এবার অজিত হাসিল। বলিল, সে প্রমাণ হয় না, কিন্তু এও প্রমাণ হয় যে আপনি তার্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূটতার্কিক, তাই আমি?

অজিত কহিল, না তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক, তাকে সত্যকার আনন্দভোগ বলা চলে না। এ ত আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না, আমি মানি নে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত-সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত অল্পই হোক, পরিমাণ তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক, তবু যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন না আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জা-বোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, এ জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকারের পাওয়া! এই কি ঠিক নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের দুই চক্ষু একান্ত আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিন্ত কিছু একটা শুনিতে চায়।

কৈ জবাব দিলেন না?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না?

না।

একটা চাপা নিঃশ্বাস পড়িল। তাহার পর কমল ধীরে ধীরে বলিল, তার মানে স্পষ্ট বোঝবার এখনো আপনার সময় আসে নি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত?

অজিত কহিল, করব।

গাড়ী আসিয়া সেই ভাঙা ফুলবাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাটীর দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও একটু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্যায়। কাউকে জানিয়ে গেলেন না, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেছেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনারই ভারে ঘুমিয়ে পড়েছেন!

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি করে? গাড়ীতে একটা হাতলণ্ঠন আছে সেটা জেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো?

কমল অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল, তা হ'লে ত বাঁচি অজিতবাবু। আসুন, আসুন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অনুনয়ের কণ্ঠে বহিল, আর যা হুকুম করুন পালন করব, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেন না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল, মানুষের সারা পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাটীটি দ্বিতল। উপরে ছোট ছোট গুটি-দুই ঘর। অতিশয় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচে মিট্ মিট্ করিয়া একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচ-ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। অনেক রাত হ'লো।

কমল জিদ করিয়া কহিল, সে হবে না, আসুন।

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাবচেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে ভারি লজ্জার কথা হবে; কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বেশী, এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নীচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারবো না।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্প মূল্যের আরাম-কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা-তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা—যেন সাধারণতঃ তাহাদের প্রয়োজন নাই এমন একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব। ঘর শূন্য—শিবনাথবাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল কিন্তু মনে মনে ভারি একটা স্বস্তিবোধ করিয়া কহিল, কই তিনি ত এখনো আসেন নি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধ হয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চলচে!

কি ক'রে জানলেন?

কাল-পরশু দুদিন যান নি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতি পূরণ ক'রে নিচ্চেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, এ দুদিন যান নি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সম্ভবতঃ আপনি ছেড়ে দেন নি বলেই তিনি যেতে পারেন নি। নইলে স্বেচ্ছায় গরহাজির হয়েছেন এত তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না।

কমল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজনা করতে কিনা। বাস্তবিক, মানুষকে জবরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্যায়, না!

অজিত কহিল, নিশ্চয়।

কমল কহিল, উনি ভাল লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে কেউ যদি ধরে রাখতো, থাকতেন?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখবার ত কেউ নেই?

কমল হাসিমুখে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ ত মুস্কিল। ধরে রাখবার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জানবার যো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেচি তা টেরও পান নি। থাক, ওসব কথায় তর্ক করেই বা হবে কি? কিন্তু কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্চে, যাই, আমি ও-ঘর থেকে চা তৈরী করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ করে বসে থাকবো? সে হবে না।

হবার দরকার কি।—এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন; কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার, অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ ক'রে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো—কিন্তু সে ত আর একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু, তবুও আপনাকে বসতে দিলুম। অথচ কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!

ইহার অর্থ যে কি ভাবিয়া পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুরূহ। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাকেই বা বসতে দেন নি কেন?

কমল কহিল, এই ত মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাঁদের নিজের হাতে কিন্তু কোথায় ব'সে যে কে সমস্ত হিসেব ওলটপালট ক'রে দেয়, কেউ তার সন্ধান পায় না। আপনার চায়ে কি বেশি চিনি দেব?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষ এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাই নে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি বুঝি তা হ'লে আসামে?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও আপনার চায়ে রুচি নেই?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্য।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর?

কমল বলিল, হ্যাঁ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি, কিন্তু কই আজকে রাঁধবার ত সময় পান নি?

কমল কহিল, না।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞেস করুন—তা হ'লে আপনি খাবেন কি? তার জবাবে আমি বলব, রাত্রে আমি খাই নে। সমস্ত দিনে কেবল একটিবার মাত্র খাই।

কেবল একটিবার মাত্র?

কমল কহিল, হাঁ; কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হ'লো, তবে শিবনাথবাবু বাড়ী এসে খাবেন কি? তাঁর খাওয়া ত দেখেছি—সে ত আর এক-আধ বারের ব্যাপার নয়? তবে? এর উত্তরে আমি বলব, তিনি ত আপনাদের বাড়ীতেই খেয়ে আসেন, তাঁর ভাবনা কি? আপনি

বলবেন, তা বটে, কিন্তু সে ত প্রত্যহ নয়। শুনে আমি ভাববো এ কথার জবাব্‌ই, পরকে দিয়ে লাভ কি? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হবে অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে।

অজিত সত্য সত্যই এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল। গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে? আপনি কি রাগ ক'রে বলছেন?

কমল কহিল, না, রাগ করে নয়। রাগ করবার বোধ হয় আজ আমার জোর নেই। আমি জানতুম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আগ্রা ছেড়ে আজও তিনি যান নি। চলুন, ও-ঘরে বসিগে।

এ-ঘরে আসিয়া কমল বলিল, এই আমাদের শোবার ঘর। তখনও এর বেশি একটা জিনিষও এখানেও ছিল না—আজও তাই আছে; কিন্তু সেদিন এদের চেহারা দেখে থাকলে আজ আমাকে বলতেও হ'তো না যে আমি রাগ করি নি; কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু? আর ত দেরী করা চলে না।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, আজ তা হ'লে আমি যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি।

হাঁ, আসবেন। বলিয়া সে পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল।

অজিত বার-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাবু কতদিন হ'লো আসেন নি?

হ'লো অনেক দিন। বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্ব্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

নয়

অজিত যখন বাড়ী ফিরল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকানপাট বন্ধ, কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না হয়ত দুইটা—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত; শোয়ার কথা দূরে থাক, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ মিথ্যা বলা যায়; কিন্তু মিথ্যা বলবার অভ্যাস তাহার ছিল না, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবনা হয় না।

গেট খোলা ছিল। দরওয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ী আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বলচি, কি একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথেঘাটে কখনো একলা বা'র হতে নেই। বুড়োর কথা খাটলো ত? শিক্ষে হ'লো ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোলবার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল ক'রো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে ছাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোও গে। কাল শুনবো সব কথা। যদু! যদু! সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজতে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় সহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বললেন, তুমি ত বললে অন্যায়: কিন্তু আমাদের যা হচ্ছিল তা

আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে—মণিই বা গ্যালো কোথায়? তাকে ত তখন থেকে দেখচি নে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েছেন।

শোবে কি হে? এখনো যে তার খাওয়া হয় নি।—বলিয়াই তাঁহার হঠাৎ একটি কথা মনে হইতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখলে?

অজিত কহিল, কই না?

তবেই হয়েছে। বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেছি তাই। গাড়ীটা নিয়ে সেও দেখচি খুঁজতে বেরিয়েছে। ভ্যাগো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলে নি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে! আজ রাতটা তা হ'লে জেগেই কাটলো।

আমি দেখচি গাড়ীটা আছে কিনা।—বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ী মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নীচের বারান্দার উত্তর প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জ্বলিতেছে কিনা জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্য হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা কহিতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল; কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। উভয়ের কেহ জানিতেও পারিল না—তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল কিনা।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ী-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যান নি।

বাঁচালে বাবা! এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'লো, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঘুমিয়ে

পড়েচে। আজ আর দেখচি মেয়েটার খাওয়া হ'লো না। যাও বাবা, তুমি ত্বটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় গে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবো না, আপনি শুতে যান।

যাই; কিন্তু কিছুই খাবে না? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না, কিছুই না! আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুতে যা'ন। এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যত্ন বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়িবারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে?

আমি অজিত।

বাঃ! কখন এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে থামিতে দিল না। বলিতে লাগিল, ত্মাখো ত তোমার অন্যায়। বাড়ীসুদ্ধ লোক ভেবে সারা—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল! তাইত বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিল না।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেন নি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিইগে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা খবর দিলে না কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঘুমিয়ে পড়ব কি রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্য্যন্ত।

তা হ'লে খেয়ে শোও গে। রাত আর নেই।

তুমি খাবে না?

না, বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ! বেশ ত কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিল না; কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিল না। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া, নিজের জিদ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, বাড়ীসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই—এত বড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিল না এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্ব্বাক্ নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল। জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিল না, সে রহিল, কি গেল একটু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিল না। গভীর নিশীথে এমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিম্বা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটেছিল, না?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল?

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরী হ'লো যে?

অজিত শুধু কহিল, এমনি।

মনোরমা নিজে চা খায় না। সে পিতাকে চা তৈরী করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভাল নয়। অজিতের সঙ্গে

আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক, তবুও এ বাড়ীতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্য্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই!

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাই নে এ কথা ত আমি বলি নি বাবা।

না না, বল নি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা মানি; কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুনলে?

আশুবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি শোনেন নি কিছুই, জানেন নি কিছুই, সমস্ত তাঁহার অনুমান মাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইল না। কারণ এমনি করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃচিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায় না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেন না, আমিও শুতে গেলাম; তুমি ত আগেই শুয়ে পড়েছিলে—কি জানি, কোথাও হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওর মনটা আজ তেমন ভাল নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারারাত পথে কাটাতে চায়, আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরের মধ্যে জেগে কাটাতে হবে? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য বাবা?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তা হ'লে তাঁর কর্ত্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাতব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়; কিন্তু সে অর্থ যদি অন্য কাউকে বোঝায় ত তাঁর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল মণি! তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলাম না। শুধু একটা রাত মাত্রই, তবু একজন তাই নিয়ে গোটা রাত্রিটা জানালায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তার কর্ত্তব্য কে নির্দ্দেশ করেছিলেন তখন জিজ্ঞেসা করা হয় নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হ'লে এ কথা জেনে নিতে ভুলবো না। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ দুইটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ

করিয়াছেন ; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু ব'সো, আমি রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশি দূর গড়াইবার সময় পাইল না, ইহাতে সে স্বস্তিবোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় সে প্রায় কথাই কহিল না এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ় তেমনি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি ?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানি নে ত বাবা।

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি ত জেগেই ছিলাম। খেতেও বললাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলে না। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় হয়েছে আমি ত ভেবেই পাই না। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত ক'রে মনে নেবে এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞেসা করলে না কেন ?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞাসা করবার কি আছে বাবা ?

জিজ্ঞাসা করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন—বিশেষতঃ মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ ত খুব স্পষ্ট। বোধ হ'ল সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা কর। এ রকম অন্যায় ধারণা ত তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে যদি তিনি অন্যায় ধারণা করে থাকেন সে

তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনকে পায়ে পড়ে নিতে হবে, বাবা?

তিনি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত পঁড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেন না। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলপাড় করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে এবং ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেন না। অজিতকেও তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়াই সুশিক্ষিত নয়, তাহার মধ্যে একটা চরিত্রের সত্যপরতায় তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয় না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্ত্তে রাগ করিয়া রহিল, এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা কঠিন।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ী গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু খবর লইয়া জানিলেন, গাড়ী আসিয়াছে অজিতের জন্য। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিতে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বা'র হবো।

কেন, মোটর কি হ'লো? আবার বিগড়েছে নাকি?

না, কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে ত।

যদি হয়ও তার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে।—এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বল। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেছে?

অজিত কহিল, কই আমি ত জানি নে! তবে আজ আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে, বাড়ী পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশী। ঘোড়ার গাড়ীতে ঠিক হয়ে উঠবে না।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল কাল সভাভঙ্গের পর আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরই মজলিস বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও

যে মনোরমার ছিল এই সঙ্গে এ কথাও তাঁহার স্মরণ হইল; কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্বচ্ছন্দতার কথাটা তাঁহার নিজেরই মনে নাই এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ সকল কতদূর বিরক্তিকর তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবে না অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না।—এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ ক'রে আছ বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে? মণি? আচ্ছা, সে-সব আর একদিন হবে, এখন যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসো গে; কিন্তু বেশী দেরী করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবে না তা বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুড়ে হয়ে গেল।—এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া উজ্জ্বল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ফোঁস করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া ক'রে বেড়াতে? ছিঃ!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুকে স্নিগ্ধহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে ত মা? না, একদম ভুলে বসে আছ?

কি বাবা?

আজ যে সকলের নেমন্তন্ন? তোমাদের গানের পালা শেষ হ'লে তাদের যে আজ খাওয়াবে—বলি, মনে আছে ত?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে বইকি? মোটর পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁদের আনতে।

মোটর পাঠিয়েছ আনতে? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবে না।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। মুখের 'পর কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে; কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আমাকে এ কথা বলতে হ'তো না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর 'পরে তুমি কেন রাগ করে আছ এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার ক'রে নিতেন, কিন্তু তিনি ত নেই, আমাকে কি তা বলা যায় না?

তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নি?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল? কখন হ'লো? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, অত রাত্রি পর্য্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হ'তো না, কিন্তু তিনি ঘুমোন নি। আপনি শুতে যাবার খানিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপরে?

তারপরের আর কোন কথা আপনাকে বলব না।—বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল-পরশু আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল, সে তিনি শুনিতে পাইলেন। মিনিট-কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, সেও তাঁহার কানে গেল; তিনি নড়িলেন না, সেখানেই মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সংবাদ দিল, বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিল না, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল, সকলেরই বার বার মনে হইতে লাগিল, বাড়ীর একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

দশ

এদিকে অজিতের গাড়ী আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারে সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, চোখোচোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়ীটাকে ইঙ্গিত দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে ত দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাব?

কেন ভয় করবে নাকি! না হয় আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব। আসুন। বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরে আনিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেছি। আপনি না এলে রাগ ক'রে আমি সমস্ত মুচিদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ ত কম নয়; কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবার-গুলোর ঢের বেশী সদ্গতি হ'তো।

এ কথার মানে? বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে, কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যবহার, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হ'লো সাধু লোকদের ভালমন্দর বিচার, পুণ্যাত্মাদের

ধর্মবুদ্ধির যুক্তি! পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে শিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না যে আসলে ঐটেই হ'লো ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এ কথা তারা জানবে কোথা থেকে?

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধির ভেতর আনন্দ নেই নাকি?

কমল কহিল, না নেই। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই ত বন্ধন। তা না হ'লে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি ব'সে রেঁধেছি—আপনি এসে খাবেন ব'লে, এত বড় অকর্ত্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্‌খানে? অজিতবাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উল্টো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকেই উপলব্ধি করেন, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক, আপনি খেতে বসুন। বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিতবাবু, আমি? আমার দরকার? —বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলা অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে কাল আমার খাওয়া হয় নি।

কমল কহিল, জানি নে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাত্রে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেন না। তাই হয়েছে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদসুদ্ধ আদায় হচ্চে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু আমি একেবারে

জন্তুর মত স্বার্থপর! সারাদিন আপনি খান নি, অথচ সেদিকে আমার হুঁস নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়েও বড়, তাইত তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিতবাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এসব মাছ-মাংসের কাণ্ড, আমি ত খাই নে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল-ডাল আলু-সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল, কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বলতে পারি নে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে ত আমার রূপ; কিন্তু সেও হার মেনেছে অক্ষয়বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারে নি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মানিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়ে না; কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য্য থাকে না—রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই আপনি আমল দিতে চান না। হাত বাড়িয়ে পথ আগলানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তা হবে; কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি! ধৈর্য্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছায় না। ইচ্ছে হয়, আমি যদি তাঁর মেয়ে হতাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিলতো কি ক'রে?

কমল বলিল, তা জানি নে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বললাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল

নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেন না। তিনি এমনি ধীর, এমনি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোটজাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্মরহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিত আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিল না; কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল; কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক, তারপরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্চি।

না, সে হবে না। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে এক পা-ও উঠবো না।

বেশ মানুষ ত! বলিয়া কমল হাসিয়া আহার্য্য-দ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানে না; কিন্তু আজ এত প্রকার পর্য্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও, এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায় এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধচক্ষু মাধুর্য্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল, এবং এই বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। কমলের খাওয়ার প্রতি চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে ক'রে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি ক'রে বেড়ায়, তারা কিন্তু আপনার পদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা জানি নে, কিন্তু আমি শপথ ক'রে বলতে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন ত একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন ?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেছেন ?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি খাই। এতে আমার কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল নাকি ?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন অসমীয়া ক্রীশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে প'ড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেডক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিল না, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এই রকম নানা দুঃখে কষ্টে প'ড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রসাধন আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেছি জাতে তাঁতি।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে; কিন্তু মা বলতেন তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতি নয়, বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা তিনি যেই হোন, এখন রাগ করাও বৃথা, আফশোষ করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান; কিন্তু বাঁচলেন না, কয়েক মাসের জ্বরেই মারা গেলেন। বছর তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল।

তাহার সবচেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এত বড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল, মায়ের রূপ ছিল, রুচি ছিল না। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র! তার বেশি নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আপনার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে পাণ্ডিত্যে, সততায়—এমন মানুষ খুব কম দেখেছি অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইয়াছিল এ হয়ত পরিহাস করিতেছে; কিন্তু এ কি রকম তামাসা? কহিল, এসব কি আপনি সত্যি বলচেন?

কমল একটু আশ্চর্য হইয়াই জবাব দিল, আমি ত কখনই মিথ্যে বলি নে, অজিতবাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের 'পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আপনি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজী জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে কমল শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন ও-ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠব।

বসবেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না, শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথবাবু যদি আর নাই আসেন। তাঁর 'পরে ত আপনার জোর নেই!

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে ত তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়ীভাড়াটা এ মাসের দেওয়াই আছে, আমি তা হ'লে কাল-পরশু চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আসবার সময় আপনার জন্যে কিছু টাকা এনেছিলাম। নেবেন?

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছুই নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্য তা নিঃশেষ হয়েছে। কিছু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয় না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নন।

না-ই হলাম; কিন্তু অবন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়; আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিন না।

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে ত বলেচি আমি কখনোই মিথ্যে বলি নে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ! অজিত বুঝিল ইহার অন্যথা হইবে না। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ বাড়ীভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে। সহসা ব্যথার ভারে মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির!

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানে না এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যার কাছে এ সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি ; কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি ?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা হ'লে আসুন। নমস্কার। বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট-দুই সেখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

এগার

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবাবুর বসিবার ঘরে শার্সিগুলা সারাদিন বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারায় দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতার পিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারার দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠো নি ত বাবা, তা হ'লে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্টবোধ না করো ত গায়ে র‍্যাপারটা দিয়ে গরীবের পা দুটো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একটা মোটা বালাপোষ লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাও গে, এখনো একটু বেলা আছে কিন্তু বুঝবে বাবা কাল—

অর্থাৎ কাল তোমার চাকরি যাবেই। কোন সাড়া আসিল না, কারণ প্রভুর এবম্বিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে

এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাইত বলি, এ কি যেদোর হাত? এমন ক'রে পা ঢেকে দিতে ত তার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

কমল বলিল, কিন্তু এদিকে যে হাত পুরে যাচ্ছে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখতে পাই নি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃসম্বোধন করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থই নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেন না, বলিলেন, ওখানে নয় মা, আমার খুব কাছে এসে ব'সো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এমন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারি ইচ্ছে হ'লো আপনাকে একবার দেখে আসি, তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেছো; কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী-সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই—নিতান্ত নিঃস্ব জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—কমল, তোমার যখন খুশি স্বচ্ছন্দে আসিয়ো। আর যাহার কাছেই হোক, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই-তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলা নীচে খসিয়া পড়িতে কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন করলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে তা না পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন,

তা ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই ত হবে। তার চেয়ে বসে দুটো গল্প করো, আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি ত আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই; কিন্তু আর সকলে রাগ করবেন যে? তাহার মুখের হাসি সত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যা নয় কমল; কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী। তার স্ত্রী হচ্চেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন-দুই হ'লো তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন, মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন, ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন ত মনোরমা, কিন্তু বাকি কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হ'তো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশি। অক্ষয়বাবুকেও হার মানিয়েছে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখি নি, কিন্তু হঠাৎ দু-তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

এবার কমল হাসিল, কহিল, অর্থাৎ কুশাঙ্কুরের উপর বজ্রাঘাত; কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরে তুচ্ছ একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্য? আমি ত কারও বাড়ীতে যাই নে।

আশুবাবু বলিলেন, তা যাও না সত্যি। সহরের কোথায় তোমার বাসা, তাও কেউ জানে না, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয়, কমল। তাই তোমাকে এরা ভুলতেও পারে না, মাপ করতেও পারে না। তোমার আলোচনা না করে তোমায় খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলো তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন. এটা কি জানো? অক্ষয়বাবুর রচনা। ইংরাজী না হ'লে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নামধাম নেই, কিন্তু আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা, তোমাকে আক্রমণ। কাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে নাকি নারীকল্যাণ সমিতির উদ্বোধন হবে—এ তারই মঙ্গল

অনুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন এ শুধু প্রবন্ধ নয়, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বা'র করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই—বিরোধ থাকতেও পারে না, কিন্তু এ ত সে নয়। ব্যক্তিবিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এর আসল আনন্দ; কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ ত এক নয় কমল, একে ত আমি ভাল বলতে পারি নে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি ত আর এ লেখা শুনতে যাবো না—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতা নেই। তাই বোধ হয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেছ ভরাডুবির মুষ্টি লাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিল না, তবু তাহার ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্ব্বলতাটুকু তাঁরা ধরেছেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁর চিনতে পারেন নি।

তুমি কি পেরেচো মা?

বোধ হয় ওঁদের চেয়ে বেশি পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়ো লোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয়-আশয়—

কিন্তু সে ত মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে, কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল?

কমল সহাস্যে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু না মনে কর ত তোমাকে একটা কথা বলি।

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সমবয়সী। তোমার মুখ থেকে

তোমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে ত আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় বলে, নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশু বদ্যির কেউ কানাকড়ি দাম দেবে না। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, নাই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নাই তার অত খুঁতখুঁতে হ'লে চলে না। তার খোঁড়া কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই দেয় কমল, তাকে বিনয় ক'রে ব'লো, এই আমার ঢের। ব'লো গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রু নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না। এই দুজনের কোথাও মিল নাই। শুধু অনাত্মীয়-পরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়—শিক্ষা, সংস্কার, রীতিনীতি, সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ? কোন সম্বন্ধই যেখানে নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে ত বলতে?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না? না কেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, অন্য কথা পড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি হয়ত বাড়ীতেই আছে। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসে না। হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব

কথা বলে না? বলে না। হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধ হয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেক দিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না।

কমল নীরব হইয়া রহিল, আশুবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরানো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার যোগাড় করেচে। এই ত চলচে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরানো অভ্যাস?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভালবেসেছে, দেশের কাজে হাজতে গেছে, বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে, কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় সেটা একটু বদলেছে। আগে মাছ-মাংস খেতো না, তারপরে খাচ্ছিলো, আবার দেখছি পরশু থেকে বন্ধ করেছে। যদু বলে, বাবু ঘণ্টাখানেক ধ'রে ঘরে ব'সে নাক টিপে যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন?

হাঁ। চাকরটাই বলছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন অজিতবাবু?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর হ'ল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল এবং যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে সে-ই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাঁহার স্বভাব, সেই

আশুবাবুর পর্য্যন্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা ঘরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির এখানে এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখি নি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। সে সোজা পথে সোজা মতলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া অক্ষয় কাগজগুলো কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ও-ধারের সোফায় বসিয়া সেই দিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে সুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল, আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েচি, আশুবাবু। ওর অধিকাংশ সত্য এবং মূল্যবান। দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় ত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্ত্তব্য। য়ুরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিষ পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে, মানি, কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বশে তাদের নষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আত্মপ্রসাদের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বারকয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে তর্ক নেই অবিনাশ-বাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ কথা বলে আসছেন এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করেন না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার যো নেই এবং এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারীকল্যাণ সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বলব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার ত আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি না যাই কিন্তু এ তোমাদেরই ভালমন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার ত এ প্রস্তাবে আপত্তি নেই?

অন্য সময় হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু একে তার মন খারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ, সদম্ভ প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু নিজেকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু? অনুকরণটা, না ভারতীয় বিশিষ্টতা।

আশুবাবু বলিলেন, ধরো যদি বলি দুটোই?

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিষটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে মেলে না; কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বইকি কমল, আছে। ওরকম সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে ত কিসের মধ্যে আছে বলো ত?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব, আশুবাবু! ভারতের বৈশিষ্ট্যে এবং য়ুরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার আদর। আসল কথা বর্ত্তমান কালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কিনা। এ ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তাঁর বেশী নয়?

কমল বলিল, না তার বেশী নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি

বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সেই ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেখানেই সত্যিকারের লজ্জা আশুবাবু।

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা হ'লে ত সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনার সাক্ষী আছে।

তাঁহার কুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর ব'লে হয়ত চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাকে ভগবান বললেন, তিনিও চিনতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিল, এ শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি।

হরেন্দ্র কহিল, রূঢ়!

দেখুন হরেন্দ্রবাবু—

দেখেচি। বিষ্ট্।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ত্যাখো কমল, অপরের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কত বড় ক্ষতি, তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প—কত অমূল্য সম্পদ্ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে। এর কিছুই ত তা হ'লে থাকবে না?

কমল কহিল, থাকবার জন্যই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয়, তা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনে আবার নতুন তার রূপ, নতুন সৌন্দর্য্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সে-ই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি, অক্ষয়বাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার 'পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে; কিন্তু একটা কথা ভুলো না কমল, বাইরে অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েছে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতেই বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের জায়গা জুড়ে বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যক কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা, কমল।

কমল কহিল, তা হোক। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্য্যদের একটি শাখা ইউরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই; কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেমনি যদি এদেশেও ঘটতো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব্ব-পিতামহদের জন্য শোক করতে বসতাম না, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত করতাম না। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিন্তু সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাও ত সত্য না হ'তে পারে। তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো, আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের দানের মধ্যে, আমাদের পুণ্যের মধ্যে আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয়-সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাব। হিন্দু কখনও মরে না।

অজিত হাতের কাগজ ফেলিয়া তাহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল এবং মুহূর্ত্তকালের জন্য কমলও নির্ব্বাক্‌ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে

এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে এবং এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জ্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ইচ্ছে হয় না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শ-ই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্ত্তনেও লজ্জা নেই—এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুশী করতে দাতাকর্ণ নিজেই পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোক কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্ম্মমতায় পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ ব'লে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ। এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহু যুগের ধন।

কমল বলিল, হোক বহু যুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড়, আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই কিন্তু আমি বিস্মিত হই নি। আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড়

ঘৃণা; কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরী করবার সময় নেই, পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল, তখন এই ভাবে পুরুষের দল নিজের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেচ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয়, মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ, কাকাবাবু। আপনি ত এদের মত মিথ্যে নয়; কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চললাম। বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা?

আর হয়ত আমি আসব না, কাকাবাবু। বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

বারো

আগ্রায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাহারই যত্নে এবং তাঁহারই গৃহে নারীকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্যোগটা একটু ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিষটা সুসম্পন্ন ত হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ মেয়েদের জন্যই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়া নিষেধ ছিল না। বস্তুতঃ এ প্রয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল; লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই পরামর্শ মত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোট শালী নীলিমা ঘরে

ঘরে গিয়া ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সহরের সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রমহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কনকনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিল না, মালিনী নিজে গিয়া ধরিয়া আনিল। অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই-চারিটা মামুলী বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য-বিষয় যেমন অরুচিকর, তেমনি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালে সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারীজাতির আদর্শবিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন! একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইঁহাদের তথাকথিত শিক্ষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ অক্ষয়ের গর্ব্ব ছিল এই যে তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পান না। সুতরাং লেখার মধ্যে সত্য যাই থাক, অপ্রিয় বচনের অভাব ছিল না এবং এই 'তথাকথিত' শব্দটার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছে। শেষের দিকে সে গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই সহরেই ঠিক এমনি একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে, যে ভদ্রসমাজে নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। যে স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ অনুষ্ঠান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্ব্বলতা। উপসংহারে অক্ষয় এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সেই শিক্ষিতা নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচবশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জ্জনা-ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই; কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি এই নব-প্রতিষ্ঠিত নারীকল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে এবং এ লইয়া নারীমণ্ডলে, পর্দ্দার ভিতরে ও বাহিরে কৌতূহলের অবধি নাই। সুতরাং রুচি ও নীতির

সম্যক্ বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্নমালার প্রখরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়বাবুর এই লেখার আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করায় রুচি বিগর্হিত এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হেয়। নারী-কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধ-লেখককে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা খুশী তাই বলিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিষ্টু এবং ব্রুট্ বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এই প্রকার বাক্‌বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং সেই উত্তেজনার মুখে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ পাঠের গোড়া হইতে সেই যে মাথা হেঁট করিয়াছিলেন, সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিলেন না। আরও একটি মানুষ তর্কযুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না, ইনি হরেন্দ্র অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনার নিত্য-অভ্যস্ত অবিনাশ।

ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের ভালমন্দ নিরূপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয় এবং এপ্রকার আলোচনায় নরনারীর কাহারও কল্যাণ হয় না, মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশবোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে নিজের আসন ছাড়িয়া এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পাশে আসিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিরর্থক আজ আপনার শান্তি নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত, আশুবাবু।

আশুবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বাড়ীতেও ত আমি একাই বসে থাকতাম, তবু সময়টা কাটল।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু থামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দেব; কিন্তু আর সব মেয়েরা?

তাঁরাও আজ এখানেই খাবেন।

অবিনাশ অজিতকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবুর গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রাজী হইতে হইল, সমস্ত পথটা আশুবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ করিয়া মেয়েদের মাঝখানে অক্ষয় তাঁকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিজের মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া বাসায় পৌঁছিল। নীচে বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিল, বোম্বাইওয়ালার মত তাহার পোষাক, কাছে আসিয়া আশুবাবুকে অভিবাদন করিল।

কি?

জবাবে সে একটুকরা কাগজ তাহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন, অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের? কি লিখেচে কমল?

লিখেচেন পত্রবাহকের মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসুমুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র অন্য কারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আশুবাবু সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তার আত্মীয় নই, বস্তুতঃ সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাব কিসের জন্য?

গাড়ীর উপর হইতে অক্ষয় কহিল, Just like her!

কথাটা সকলের কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জন্য জামিন হ'লে—

আশুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল—বলিলেন, জামিন হওয়ার গরজ আমার নয়: তাঁর স্বামী আছেন, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্মিত হইল, বলিল, তাঁর স্বামীর কথা ত শুনি নি।

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night, এসো অজিত, আর দেরী ক'রো না। বলিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

উপরের গাড়িবারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ড্রাইভারকে স্মরণ করিয়া দিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গাড়ী পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছেন, আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বস। মজা দেখলে একবার ?

এ কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুত তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তিপ্রিয়তা চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাহার এই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জ্জন নিশীথ গৃহকক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী জীবনের অসংবৃত ইতিহাস, একান্ত অবলীলায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই আজ নারীকল্যাণ সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শপন্থী অক্ষয় নারীদের আদর্শ নির্দ্দেশের ছলনায় যত কটূক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাক, অজিত দুঃখবোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি অক্ষয়ের ক্রোধান্ধ বর্ব্বরতায় যত তীক্ষ্ণ শূলই থাক, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল। কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভাল সে বলে না। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের সুতীব্র নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাব পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। সে বলে, ভদ্রসমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করায় অপরাধ স্পর্শে না ; কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল ! দুর্দ্দশাপন্ন ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়েকটি টাকা ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যেন সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্রের সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেই সকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি—তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজার সাহেবের গৃহে জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অরুচিকর, কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল ?

গোপন করিলেই বা ক্ষতি কি হইত? কিন্তু দুনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদিবা পড়িয়াছে গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য্য! দৈবক্রমে তারই মুখে সে প্রথম সংবাদ পাইল যে শিবনাথ কোথায়ও যায় নাই, এই সহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের 'পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এত বড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাটমহিষী মমতাজের স্মৃতিসৌধের তীরে বসিয়া যে কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব্ব প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখলে ত অজিত? আমি নিশ্চয় বলচি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল!

অজিত কহিল, নাও হ'তে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ খবর ত সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা হ'লে ত ঢের বেশী অন্যায়। স্বামীকে লুকানো ত ভাল কাজ নয়।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত তাঁর মতের বিরুদ্ধে, পরের কাছে টাকা ধার করতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কত বড় অন্যায় বল ত? এ কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অজিত কহিল, তিনি টাকা ত চান নি, শুধু জামিন হ'তে অনুরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয় পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্য। সত্যিই ত আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধ হয় কাউকেই ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না, কথাটা ঠিক ও-ভাবে আমি বলি নি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটাকে হঠাৎ ঝোঁকের উপর বিদায় করা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারি একটা গ্লানি চলিতেছিল; কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল, সোজা নিজে এসে তা নিয়ে গেলেই হ'তো। খামোকা একটা বাইরের লোককে সকলের সামনে পাঠান তার কি আবশ্যকতা ছিল? আর যাই বল, মেয়েটার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেয়ারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিশ্রী চেহারা—মনি-লেন্ডার কিনা! ফিরে গিয়ে হয়ত নানান খানা করে বানিয়ে বলবে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবে না আশুবাবু, সত্যি বললেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন,—এ অক্ষয় লোকটা একেবারে নুইসেন্স। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ কর না অজিত। যদুকে ডেকে ঐ দেরাজটা খুলে দেখ না কি আছে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো টাকা—আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধ হয় তাদের বাসাটা চেনে শিবনাথকে মাঝে মাঝে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এই বলিয়া তিনি নিজে চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েই গেছে, আজ রাত্রে থাক, কাল সকালে বিবেচনা করে দেখলেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোঝ না অজিত, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সে রাত্রে কখনও লোক পাঠাত না।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ী নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন ফিরবে তারও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই শুনতে পাবেন। তারপরে আর টাকা পাঠানো উচিত হবে না আশুবাবু। বোধ হয় আপনার হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেন না।

কিন্তু এ ত তোমার অনুমান মাত্র, অজিত।

হাঁ, অনুমান বই আর কি।

কিন্তু বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন ত এর চেয়েও বড় হতে পারে?

তা পারে, কিন্তু আত্মমর্য্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এও ত শুধু তোমার অনুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অনুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস।—এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন না, কেবল বেদনায় দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস অসম্ভব নয়। অসঙ্গতও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

তেরো

নারীকল্যাণ সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, খুঁয্যেমশাই, কমলকে আমি একবার দেখব। আমার ভারি ইচ্ছে করে তাকে নমন্তন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস ত কম নয় ছোটগিন্নী; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমন্তন্ন করা!

অবিনাশ বলিলেন, বাঘ-ভালুক এদেশে মেলে না, নইলে তোমার হুকুমে তাদেরও নেমন্তন্ন করে আসতে পারি; কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করি নে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ করিয়া বলিল, না, সে হবে না। তুমি না যাও আমি নিজে গিয়ে তাকে আহ্বান করে আসব।

কিন্তু আমি ত তাদের বাসাটা চিনি নে।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি তোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, তোমাদের মুখে যা শুনি তাতে শিবনাথবাবুরই দোষ—তাকে ত আমি নেমন্তন্ন করতে চাই নে। আমি চাই কমলকে দেখতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে। কমল যদি আসতে রাজী হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী—তিনিও বলেচেন আসবেন। বুঝলে?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন না। অথচ বাধা দিতেও ভরসা পাইলেন না। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তাই নয়, মনে মনে ভয়ও করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ করে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ, ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান মলে দেবে। বাসায় ত থাক শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে—তোমার ভয়টা কিসের?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে, কিন্তু করতে হবে কি?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখব, আলাপ করব, ঘরে এনে খাওয়াব। তুমি কি ওদের বাসা চেন? আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাকে নেমন্তন্ন করে আসতে হবে। কখন যেতে পারবে বল ত?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন; কিন্তু বাড়ীওয়ালা? সেজদা? ওঁর অভিপ্রায়টা কি? এই বলিয়া সে বারান্দার ওধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া পাইয়োনিয়ার পড়িতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন সমস্তই—কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ওর অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন—আমার কাজ নেই। আমি ওঁর শালী, শালীর বোন নই যে পতি পরম গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন করবেন। আমার যাকে ইচ্ছা খাওয়াব। ম্যাজিষ্ট্রেটের বৌ বলেছেন খবর পেলে তিনিও আসবেন। ওর ভাল না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবে না হরেন। কালকের ব্যাপারটা মনে আছে ত! আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিল না এবং পাছে সেই লজ্জাকর কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং নীলিমার কানে যায়, এই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুন না বৌদি, আমার বাসাতে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসুন। আপনি হবেন গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মীছাড়ার গৃহে একদিন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলেগুলোও দুটো ভালোমন্দ জিনিষ মুখে দিয়ে বাঁচবে।

নীলিমা অভিমানের সুরে বলিল, বেশ—তাই হোক ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাব।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ কেলেঙ্কারীর তা হ'লে আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়ৎই দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান—এই ঢের ভাল শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ী করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল যে, কষ্ট করিয়া আর যাইবার প্রয়োজন নাই। কাল রাত্রে খাইবার কথা তাহাকে বলা হইয়াছে—তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফেরবার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাক্স। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওটা? কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, যাচ্ছি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয় দিয়ে বললাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন। নিতান্তই মেয়েদের ব্যাপার—যেতে হবে যে। একটু-খানি চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা। বললাম, কথা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আসবেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে কি? একটুখানি হেসে বললেন, না। জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু একলা ত যেতে পারবেন না, কাল কখন এসে আপনাকে নিয়ে যাব? শুনে তেমনি হাসতে লাগলেন। বললেন, একলাই যেতে পারব—অবিনাশ-বাবুর বাসা চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভাল! ভারি নিরহঙ্কার!

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথায় মোটা বাক্সটা? তার ইতিহাস ত প্রকাশ করলে না ভায়া?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞেসা করি নি।

করলে ভাল করতে। বোধ হয় বিক্রি কিম্বা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন!

হরেন্দ্র কহিল, হ'তেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন।—এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারীকল্যাণ সমিতিতে অক্ষয়ের বক্তৃতা শুনেচেন ত? আমরা লোকটাকে ক্রূট্ বলি; কিন্তু ও-বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি বুদ্ধি থাকলে সমাজে অনায়াসেই সাধুসজ্জন বলে চলে যেতে পারত—কি বলেন সেজদা? ঠিক না?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—হাঁ রে, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু; এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও গে যাও।

চেষ্টা করব; কিন্তু চললাম বৌদি, কাল আবার যথাসময়ে হাজির হব।—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতেই কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে—সে কোনমতেই আসিবে না জানিয়া আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালিনীকে খবর পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া তিনি আসিলেন না।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যানবাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ সুমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামা-কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল?

কমল বলিল, কারণ খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন এবং তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে বল! কাজটা ভাল হয় নি কিন্তু—ছোটগিন্নী,

ইনিই কমল। আর একটা নাম শিবানী। এঁকে দেখবার জন্যই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। এসো, বাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসবে চল। যোগাড় বোধ হয় তোমার সমস্ত হয়ে গেছে? তা হ'লে অনর্থক দেরী করে লাভ হবে না—ঠিক সময়ে আবার ওঁর বাসায় ফিরে যাওয়া চাই ত!

এ সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয় না, প্রত্যাশাও থাকে না।

হরেন্দ্র আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময় জুটাতে পারি নি বৌদি, ত্রুটি হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন, তাঁকে যথোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হ'ল।—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েছে, কিন্তু এ সব আমি খাই নে। সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্যান্ন বলেন—আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নীলিমা অবাক্ হইল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এসব খাইনে বলেই অভাবটাও আমার কম। আপনি কিছু মনে করবেন না!

কিন্তু মনে না করলেও চলে না; নীলিমা ক্ষুন্ন হইয়া কহিল, না খেলে এত জিনিষ যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিল, কহিল, যা হবার তা হয়েছে, সে আর ফিরবে না। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্যও নিয়মভঙ্গ করতে পারেন না?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটিমাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না; কিন্তু তাহার দৃঢ়তা যে কত বড়—তাহা পৌঁছিল হরেন্দ্রর কানে। শুধু সে-ই বুঝিল ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্ত্রীর দিক হইতে অনুরোধের পুনরুক্তির সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক বৌদি, আর না। খাবার

আপনার নষ্ট হবে না, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেঁচেপুঁচে খেয়ে যাবে, কিন্তু ওঁকে আর নয়! বরঞ্চ যা খাবেন, তার যোগাড় করে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা দিচ্ছি; কিন্তু আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না ঠাকুরপো, তুমি থাম। এ ঘাস নয় যে তোমার একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় ফেল দেব—তবু তাদের খাওয়াব না।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ কিসের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্যই ত তোমার যত দুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জ্জন কম কর না! এতদিন বৌ এলে ত ছেলেপুলেয় ঘর ভরে যেত। এ হতভাগা কাণ্ড ত ঘটত না। নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্ত্তিক, দলটিও তৈরী হচ্চে তারি উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতেই খাওয়াব না।—এই তোমাকে আমি বলে দিলুম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

কমল কিছুই বুঝিতে পারিল না, আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিষটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটিকয়েক ছাত্র আছে আমার—তারা আমার কাছে থেকে ইস্কুলে কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ওঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? কৈ এ ত এতদিন শুনি নি?

হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মত কিছুই নয়; কিন্তু চরিত্রবান ভাল ছেলে তারা। তাদের আমি ভালবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখতে? দেখলে খুশী হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি—যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না, কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাশী বেড়াতে। তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তাদের দেখলে আপনি খুশীই হবেন।

অবিনাশ মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠল? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস্ হরেন।

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্যায় মুখুয্যেমশায়। ঠাকুরপো ত তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসে নি যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্চ? নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বলে না। বরঞ্চ যারা বলে—তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করেছিলেন,—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে সেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা কহিল, আমি বলছিলাম রাগে; কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়? ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তারপরে যেন পরকে বলতে যান।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা ত সবাই ইস্কুল কলেজে পড়েন?

হরেন্দ্র বলিল, হাঁ, প্রকাশ্যে তাই বটে।

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশ্যে কি সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চ্চা করা হয়, সেটাও খুলে বল?

শুনিয়া সবাই হাসিল। নীলিমা অনুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখুয্যেমশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ওঁর বিচার করে নেবেন না। মাঝে মাঝে মাথা ওঁর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্ব্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হ'তো।—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই স্নিগ্ধ পরিহাসটুকুর 'পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুনঠাকুর আসিয়া জানাইল, কমলের খাবার তৈরী হইয়া গিয়াছে। অতএব এখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা-দুই পরে আহারাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন—কমল তখন পূর্ব্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না করুক, কলেজের পড়া মুখস্থ করা ছাড়াও ত কিছু করে—সে কী?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হ'তে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই; কিন্তু পায়ের ধূলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বলব। আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানের আতিশয্যে অবিনাশের গা জলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বলতেই বা বাধা কি ঠাকুরপো? তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙ্গলে, কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মত করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিচ্চ, একথা জানাতে দোষ কি? তোমার কাছে ত আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলুম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও ত বলচি নে বৌদি, বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল। কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহানুভূতি নেই?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কিনা না জানলে ত বলা যায় না, হরেনবাবু; কিন্তু পুরাকালের ছাঁচে তৈরী করে তোলাটাই যে সত্যিকার মানুষের ছাঁচে তৈরী করে তোলা, এও ত যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সে-ই যে আমাদের ভারতের আদর্শ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শ যে চিরযুগের চরম আদর্শ—এই বা কে স্থির করে দিলেন, বলুন?

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হ'তে পারে কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহগণের আদর্শ। ভারত-বাসীর এই নিত্যকালের লক্ষ্য—এই তাদের একটা মাত্র চলবার পথ। হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানি নে, কিন্তু সে এই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানি নে কেন মানুষের এ ভুল হয়। নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারতবাসীকে চোখে দেখতেই পায় না। আরও ত ঢের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন?

অবিনাশ কুপিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক তারা। আমাদের কাছে

এ আবেদন নিষ্ফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শ-ই স্পষ্ট করে দেখতে পেলে যথেষ্ট মনে করব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশ-বাবু! নইলে এতবড় অন্ধ ভাবতে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এমনি করেই ভাবে। সেদিন অজিতবাবুর সুমুখেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী—আজও মনে হয়ত তাই আছেন—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতে উদ্যত ছিলেন, কিন্তু কমল সেদিকে দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেছি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে! এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা হয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা বলচ, নিজে তার অর্থ বোঝ না। এতে মানুষের সর্ব্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবে না অবিনাশবাবু, যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্ব্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিলেন, এসব নিছক শিবনাথের কথা।

কমল কহিল, তা ত জানি নে—তিনিও এ কথা বলেন!

এবার অবিনাশ আত্মবিস্মৃত হইলেন। বিদ্রূপে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জান। কথাগুলো মুখস্থ করেচ আর জান না কার?

তাঁহার এই কদর্য্য দৃঢ়তার জবাব কমল দিল না, দিল নীলিমা। কহিল, কথা যারই হোক মুখুয্যেমশায়, মাষ্টারগিরি কাজে কড়া কথায় ধমক

দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন করায় লজ্জা আছে; কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ী ডাকতে পাঠাও না ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে ত আর ভয় নেই।—এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, মুখুয্যেমশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠেচে—তাতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হবে না।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ ত, তোমরা বসে গল্প কর না, আমি শুতে চললাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আনতে গেলে কিন্তু না বলতে পারবেন না।

কমল সহাস্যে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেনবাবু? নাই বা গেলাম!

না, সে হবে না। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নই। নিতান্তই সাদাসিধে। গেরুয়াও পরি নে, জটা-বল্কলও ধারণ করি নি। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গেই মিশে আছি।

কিন্তু সে ত ভাল নয়! অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্ম-গোপনের চেষ্টা আর এক রকমের অন্যায় আচরণ। বোধ হয় অবিনাশবাবু একেই বলেছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরং জটা-বল্কল গেরুয়া ঢের ভাল। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার যো নেই—হটতেই হবে; কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভাল বলেন না? পারি আর না পারি, এই আদর্শ কত বড়!

কমল কহিল, তা বলতে পারব না হরেনবাবু। সমস্ত সংযমের মত গৌন-সংযমেও সত্য আছে; কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক ধরনের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্মনিগ্রহের উগ্রদম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে। বেশ, আমি যাব আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে—না গেলে আমি ছাড়ব না; কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই—ঘটা করে আমরা কিছু করি নে। সহসা নীলিমাকে কহিল, আমার আদর্শ উনি। ওঁর মতই আমরা সহজের পথিক।. বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ ওঁতে নেই—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি ওঁর দুঃসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, ওঁর কঠোর আত্মশাসন!

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করে না, কিন্তু বলুন ত—নারীত্বের এত বড় মহিমা, এত বড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহেই উনি গৃহিণী, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর ন্যায়। এ বাড়ীর সমস্ত দায়িত্ব ওঁর উপরে! অথচ কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে?

কমলের মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালটা কি আছে হরেনবাবু? অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হ'তে পারে, কিন্তু ভাল হয়ে উঠবে কিসের জোরে!

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং নীলিমা আশ্চর্য্য হইয়া, দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্য্যে লোকে একে যত গৌরবান্বিতই করে তুলুক, গৃহিণীপনার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই; এ গৌরব ছাড়াই ভাল।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ ত আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার ত ওঁর নিজের নয়—হ'লে এ উপদেশ দিতুম না! অথচ এমনি করেই কর্ম্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি এই বুঝি নারীজীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানের হরিশবাবুর কথা মনে পড়ে। ষোল বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মরে গেল—

তাকে বাড়ীতে এনে নিজের একপাল ছেলেমেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বললেন, লক্ষী, দিদি আমার, এখন এরাই তোর ছেলেমেয়ে। তোর ভাবনা কি বোন, এদের মানুষ করে, এদের মায়ের মত হয়ে, এ বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে আজ থেকে তুই সার্থক হ—এই আমার আশীর্ব্বাদ। হরিশবাবু ভাল লোক, বাগানময় তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে গেল—সবাই বললে, লক্ষীর কপাল ভাল। ভাল ত বটেই। শুধু মেয়েমানুষই জানে এত বড় দুর্ভোগ, এত বড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র কহিল, তারপরে?

কমল বলিল, পরের খবর জানি নে হরেনবাবু, লক্ষীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারি নি—আগেই চলে আসতে হয়েছিল: কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ী এসে দাঁড়াল। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব। নমস্কার! বলিয়া সে একমুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল।

চৌদ্দ

'আশ্রম' শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্যায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা খরচায় স্কুলে পড়াশুনা করতে পায়—ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অত বড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিল না। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্যভাবে; কিন্তু এসকল জিনিষের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্ব্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির বিরাম থাকে না। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয় না। হইতও তাই। এ বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাইবোন ছিল না। পিতা ওকালতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেন্দ্রর বিধবা মা। তিনিও পরলোকগমন করিলেন। ছেলের তখন লেখাপড়া সাঙ্গ হইল। অতএব আপনার বলিতে এমন কেহই আর রহিল না যে, তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে কিম্বা উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। অতএব পড়া যখন সমাপ্ত হইল, তখন নিতান্ত কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধুসঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাঙ্কের জমানো-সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতি গঠন করিল, বন্যাপ্লাবনে আচার্য্যদেবের দলে ভিড়িল, সেবক-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা-খোঁড়া নুলো-হাবা-বোবা ধরিয়া আনিয়া সেবা করিল—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভাল লোকেরা আসিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিল, টাকা দাও, পরোপকার করি। বাড়তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে হাত না দিলে আর চলে না—এমনি যখন অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হোক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকি আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এই খবর সেইদিন সে প্রথম পাইল। অবিনাশের কলেজে তখন মাষ্টারি একটা খালি ছিল; চেষ্টা করিয়া সেই কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এদেশে আসিবার ইহার তাহার ইতিহাস। পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন সহরগুলায় সাবেক কালের অনেক বড় বড় বাড়ী এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র যোগাড় করিয়া লইল। এই তাহার আশ্রম।

কিন্তু এখানে আসিয়া যে কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল তাহারই অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। মেয়েটি অচেনা লোক বলিয়া একটা দিনের জন্যও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন কি চাই ঠাকুরপো আমাকে জানাতে লজ্জা ক'রো না। আমি বাড়ীর গিন্নী নই—অথচ গিন্নীপনার ভার পড়েছে আমার ওপর। তোমার দাদা বলছিলেন, ভায়ার অযত্ন হ'লে মাইনে কাটা যাবে। গরীব মানুষের লোকসান করে দিয়ো না ভাই, দরকারগুলো যেন জানতে পারি।

সুরেন্দ্র কি জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জায় সে এমনি জড়সড় হইয়া উঠিল যে, এই মিষ্ট কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতে পারিল না, কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন-দুয়ের বেশি লাগিল না। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই— এমনি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেমনি সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নেই— তিনিও যে এ বাড়ীতে পর—এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজসজ্জায়, তাঁহার রহস্য-মধুর আলাপ-আলোচনায় ধরিবার যো নেই—তেমনি এইগুলাই যে তাহার সবটুকু নহে, এ কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছাই-য়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাম্ভীর্য্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দায়—এমনি হাল্কা তাঁহার হাসিখুশির মেলা, অথচ একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাহাকে অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না, বাটীর মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আবহাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রর সপ্তাহ-দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আটকাচ্ছিল?

হরেন্দ্র সলজ্জে কহিল, একদিন যেতেই হ'তো বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হ'তো, কিন্তু দেশসেবার নেশার ঘোর তোমার এখনো চোখ থেকে কাটে নি, ঠাকুরপো, আরও দিনকতক না হয় বৌদির হেফাজতেই থাকতে!

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাকব বৌদি। এই ত মিনিট-দশেকের পথ— আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব কোথায়?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নামে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাস নে আর কোথাও, এইখানেই থাক; কিন্তু সে কি হয়? ইজ্জত বড়—না দাদার কথা বড়! যাও, নতুন আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও

গে ছোটগিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হ'ল চড়কের সন্ন্যাসী—পিঠ ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর বামুন রাখিয়া অতিশয় শান্ত-শিষ্ট নিরীহ মাষ্টারের ন্যায় কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়ীতে অনেক ঘর। গোটা-দুই ঘর ছাড়া বাকি সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাসখানেক পরেই এই শূন্য ঘরগুলা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ কাজে লাগে না। অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। সে ছিল তাহার দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতির সেক্রেটারী। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর-দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ-ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধুবান্ধব-গণের সন্ধানে ফিরিতেছিল। হরেন্দ্রর চিঠি এবং ট্রেনের মাশুল পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন্দ্র কহিল, দেখি, যদি তোমার একটা চাকরি-বাকরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অন্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলায় কোনও একটি গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার সাধুসঙ্কল্প মুলতুবী রাখিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একাকী আসিল না, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সতীশ একথা যুক্তি ও শাস্ত্রবচনের জোরে নির্ব্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, ভারতবর্ষই ধর্ম্মভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এদেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয়, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, অসংখ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনও সম্ভব হয় ত এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীশের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিল না, সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য সে মনে মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল এবং ইতিপূর্ব্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই, এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ব্ববাদিসম্মত ভাল ভাল কথা জানিত; কয়েকদিন ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-

ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্ব্বপিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী। আর্য্যরক্তসম্ভূত কোন্ পাষাণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারে না এবং পারিবার মত দুর্ম্মতিপরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিল না।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল; কিন্তু ইহা তপস্যা ও সাধনার বস্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটা সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সেই শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা হরেন্দ্রর চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইল—এইরূপে অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরে লোক বিশেষ কিছু জানিতও না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। শুধু এইটুকুই সকলে ভাসা ভাসা রকমের শুনিতে পাইল যে হরেন্দ্রর বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলে লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিত না, নীলিমাও না।

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ-মাংস আসিবার যো নাই, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম্ম; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিল না, সাধনমার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল—অতএব এ কাজগুলাও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠে না; ছেলেদের পড়াশুনা গেল—ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাঁধা নিয়মের শৈথিল্য ঘটিল না—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল—বাহিরে কোথাও আহারের নিমন্ত্রণ জুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া বাহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোন মার্জ্জনা ছিল না। ছেলেদের খালি পা, রুক্ষ মাথা—পাছে কোথাও কোন ছিদ্রপথে বিলাসিতা অনধিকারপ্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ পাহারা দিতে লাগিল। মোটামুটি এইভাবে আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের ত কথাই নাই, হরেন্দ্রর মনের মধ্যেও শ্লাঘার অবধি রহিল না। বাহিরের

কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ত এ জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিত না, বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটি বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে রাজেনের আচরণ পূর্ব্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয় না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্ম্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, শরীর ভাল নাই। অথচ শরীর ভাল না থাকার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না; কিন্তু কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসে না, রাত্রে যখন বাড়ী ফিরে তখন এমনি তাহার চেহারা যে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয় না। অথচ এ সকল একান্তই আশ্রমের নিয়ম-বিরুদ্ধ; একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার যো নাই—এ কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করে না। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলারক্ষার ভার তাহারই উপরে। এই সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তাহা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না—ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন্দ্র নিজেও যে না বুঝিত তা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিল না। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই—সকালে যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতেছিল; হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি—রাজেন! কাল ছিলে কোথায়?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, একটা গাছতলায় পড়েছিলাম।

গাছতলায়? গাছতলায় কেন?

অনেক রাত হয়ে গেল—আর ডাকাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গালাম না।

বেশ! অত রাত্রিই বা হ'লো কেন?

এমনি ঘুরতে ঘুরতে। বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল—গ্রাহ্য করলে না, আর আমি জানব কি করে?

তাইত হে, এতটা ভাল নয়।

সতীশ মুখ ভারী করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি ত একটা কথা জানেন, পুলিশে ওকে বছর-দুই জেলে রেখেছিল?

হরেন্দ্র বলিল, জানি, কিন্তু সে ত মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর ত কোনও সত্যিকার আর দোষ ছিল না।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সুদৃষ্টি ওকে আজও ছাড়ে নি।

হরেন্দ্র কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন্দ্র চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে রাজেন ভগবান পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না?

হরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কই না?

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করে না। আশ্রমের কাজকর্ম্ম বিধি-নিষেধের প্রতিও তার তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা নেই। আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকরিবাকরি করে দিন।

হরেন্দ্র কহিল, চাকরি ত গাছের ফল নয় সতীশ, যে ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেব। তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা হ'লে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট ও আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্ত্তব্য। আপনি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে এতদিন আমার প্রবৃত্তি যায় নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

হরেন্দ্র মনে মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নির্ম্মল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ। এদিক দিয়ে অতি বড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারে না। রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ কথা ভাববারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করি নি, সে অস্বাভাবিক রকমের নির্ম্মল, কিন্তু—

হরেন্দ্র প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিন্তুটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। ও তখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং বাসায় বি. এস-সি পড়ত। সবাই জানত ওই ফার্ষ্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে হঠাৎ কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি ডাক্তারি পড়ত নাকি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন কলেজে থার্ড ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাষ্টারই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসিমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তারপরে বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো, তখন পিসিমা তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। ক্লাসে প্রত্যেক বিষয়েই ফার্ষ্ট হচ্ছিল, অথচ বছর-তিনেক পড়ে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে! ওই এক ছুতো—ভারি শক্ত, ও আমি পেরে উঠবো না। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বললে, ছেলে পড়িয়ে বি. এস-সি পাশ করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাষ্টারি করে কাটাব! আমি বললাম, বেশ তাই কর। তারপরে দিন-পনের নাওয়া খাওয়ার সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই—এমনই পড়া পড়লে যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! সবাই বললে, এ না হ'লে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে!

হরেন্দ্র এ-সব কিছুই জানিত না—রুদ্ধনিঃশ্বাসে কহিল, তারপরে?

সতীশ কহিল, তারপরে যা আরম্ভ করলে সেও এমনি অদ্ভুত। বই আর

ছুঁলে না। কোথায় রইল তার খাতা পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট বুক—কোথায় যায়, কোথায় থাকে, পাত্তাই পাওয়া যায় না। যখন ফিরে আসে তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্য্যন্ত ছিল না।

তারপরে?

তারপরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়ীময় যেন দক্ষযজ্ঞ সুরু করলে! এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, সেটা খোলে, এঁকে ধমকায়, তাকে আটকায়—সে বস্তু চোখে না দেখলে অনুধাবন করবার যো নেই। বাসার সবাই কেরাণী, ভয়ে সকলের সর্দিগর্ম্মী হয়ে গেল—সবাই ভাবলে আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ সবাইকে ধরে ফাঁসি দেবে।

তারপরে?

তারপরে বিকেল নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাকে ধরে নিয়ে তারা বিদেয় হ'ল। আমাকে দিলে দিন-চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান্ ষ্টেপ! ওন্‌লি ওয়ান্ ষ্টেপ? -তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান্ ষ্টেপ। গো। গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বললে, সতীশ, তুমি ভাগ্যবান। অফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দুমাসের মাইনে হাতে দিয়ে বললেন, গো। শুনলাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ-তল্লাসিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তা হ'লে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাকে জিজ্ঞেসা করবেন না। আমার বন্ধু!

হরেন্দ্র খুসী হইল না, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মত।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে তারা আমাকে বিনা দোষে লাঞ্ছনা করেছে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েছে।

হরেন্দ্র বলিল, বিনা দোষে লাঞ্ছনা করাটাও ত আইন নয়। যারা তা পারে, তারা এ-ই বা পারবে না কেন?—এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারী অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের

মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে, পাছে তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া যায়। হরেন স্থির করিল ব্যাপারটা সত্যই হোক, বা মিথ্যাই হোক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোনমতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে, তখন কোথাও চাকরি করিয়া দিয়া হোক বা যে কোন অজুহাতেই হোক, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিন-কয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে দুদিন ছুটি ছিল। সতীশ কাশী যাইবার অনুমতি চাইতে আসিল। আগ্রা আশ্রমের অনুরূপ আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রর মনের মধ্যে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল, হরেনদা, ওর সঙ্গে আমিও দিন-কতক বেড়িয়ে আসি গে।

হরেন্দ্র বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্ছি। যাবার গাড়ী-ভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারি নি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বলবার প্রয়োজন নেই হরেনদা, সে আমি জানি।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়ীতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন, এই বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিন-দশেক পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিল। হরেন্দ্রকে নিভৃতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্লমুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েছে হরেনদা। কাশীতে আশ্রম স্থাপনের জন্যে এ ক'দিন রাজেন অমানুষিক পরিশ্রম করেছে।

হরেন্দ্র কহিল, পরিশ্রম করলে ত সে অমানুষিক পরিশ্রমই করে সতীশ।

হাঁ, তাই সে করেছে ; কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের নিজের আশ্রমটুকুর জন্য করত !

হরেন্দ্র আশান্বিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিষটি ধরতে পারে নি। আমি নিশ্চয় বলচি, তুমি দেখতে পাবে এখন থেকে ওর কর্মের আর অবধি থাকবে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন্দ্র বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেছি জানো, আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখলে চলবে না। দেশের এবং দশের সহানুভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এর বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার আবশ্যক।

সতীশ সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজ বাধা পাবে না?

হরেন্দ্র বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখতে আসবেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিশুদ্ধতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আসবেন?

হরেন্দ্র বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশদা, বৌ-ঠাকরুণ। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই—[illegible]জয়পুরে গেছেন কার্য্যোপলক্ষে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেছ—তিনিও আসবেন ; এবং শরীর সুস্থ থাকলে হয়ত আশুবাবুকেও ধরে আনতে পারব। জান ত, কেউ এঁরা যে-সে লোক নন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আসিলেন না শুধু আশুবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন্দ্র অবিনাশকে লক্ষ্য

করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে, আপনি যাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্নাশালায়। আজ আমাদের পর্ব্বদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলে উনান জ্বালিতেছিল এবং সেই বয়সের একটি ছেলে বঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলেটিকে স্নেহের কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে, বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্ল মুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর দম? ডাল কিম্বা ঝোল কিম্বা আর কিছু—

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের একটার বেশি হবার নিয়ম নেই।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, হবার যো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এইভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী-চাকরও নেই বুঝি?

হরেন্দ্র কহিল, না। তাদের আনলে আলুর দমকে বিদায় দিতে হবে, ছেলেরা সেটা পছন্দ করবে না।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিল না, ছেলে দুটির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই-চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই এ কথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সইতে পারবেন না। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত—শুধু আপনিই বুঝবেন এর সার্থকতা। তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সসম্ভ্রমে আপনাকে আমন্ত্রণ করেছিলুম।

হরেন্দ্রর গভীর ও গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের কথা আলাদা, কিন্তু এই সব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চ্চার নাম কি মানুষগড়া হরেনবাবু! এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন—মিথ্যে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে দেবেন না। তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল; অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি, হরেন?

কমল লজ্জা পাইল, কহিল, আমাকে সত্যি কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে কারো মধ্যে আমি নয়, কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবে না। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে। দেখি, ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজী বা'র হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধহাস্যের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত। সাবেক কালের কারুকার্য্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিদ্যমান। বসিবার জন্য একখানা বেঞ্চ ও গোটা-চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ তাহাতে বসে না। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে সাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে; মাঝখানে তাঁহারই বাড়ীর লতাপাতা-কাটা বারো ডালের শেজ এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ রঙের ফানুসে ঢাকা দেওয়াল-গিরি এক কোণে জ্বলিতেছে; নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্য হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুসী হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন; আঃ! বাঁচা গেল!

হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, এই ত মুস্কিলে ফেললি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েছেন, ওর সুমুখে কোন কিছুকে ভাল বলতে সাহস হয় না—হয়ত সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের জোরে এখুনি সপ্রমাণ করে দেবেন যে এর ছাদের নক্সা থেকে মেঝের গালচে পর্য্যন্ত সবই মন্দ! এই বলিয়া তিনি তাহার মুখের প্রতি

চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার কোন সম্বল না থাক কমল, অন্ততঃ বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেচি এ তুমিও মানবে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা অস্বীকার করি নে; কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য মাত্রই সত্য নয়, কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিবনাথ শিখিয়েছে, কেবল একটি দেখচি সে শেখাতে বাকি রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ত্রুটি হয়েছে মুখুয্যেমশাই, তাঁকে জরিমানা ক'রে আমরা তার শোধ দেব; কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়। তাই প্রার্থনা করি তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু-একটা প্রিয় বাক্য বা'র কর— আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্যই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ণ ফলাটুকু লুকানো ছিল তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি একপ্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়কুটা ধূলাবালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখমুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প একটুখানি নড়া দাঁতের মত চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারি নে হরেন, তোমার বৌদি নিতান্ত মিথ্যে বলেন নি—আমাকে চিনতে ত তাঁর বাকি নেই—ঠিকই জানেন আমার পুঁজিপাটা সেই সেকেলে সোজা ধরণের, তাতে বস্তু থাকলেও রসকস নেই।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝবে না; কিন্তু ছোটগিন্নী হঠাৎ যেরকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন, তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ওঁর আপনি পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্য্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্দ্ধায় আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি।

কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম, এ কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।

নীলিমা বলিল, তা হ'লে আমার সম্বন্ধেও দয়া করে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো যে, কাউকে ছোটগিন্নী বলে ডাকতে থাকলেই সে সত্যিকারের গৃহিণী হয়ে যায় না। তাকে শাসন করার মাত্রাবোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখুয্যেমশায়ের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার-ঘরে এইটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক—ভবিষ্যতে কাজ লাগতে পারে।

হরেন্দ্র হাতজোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকি রইল এখন থাক, বাড়ী ফিরে গিয়ে সমাধা করে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। যে ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলাম না, তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘটলো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, অজিতবাবু, শুনলাম কাল নাকি আপনি বাড়ী যাবেন?

কিন্তু আপনি শুনলেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আনতে গিয়েছিলাম, তিনিই বললেন, কাল বোধ হয় আপনি বাড়ী চলে যাচ্ছেন।

অজিত কহিল, বোধ হয়; কিন্তু সে কাল নয়, পরশু এবং বাড়ী কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত বিকেল নাগাদ ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হব—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে কোন দিকের গাড়ী পাবো, তাতেই এবারের যাত্রা সুরু করে দেব।

হরেন্দ্র সহাস্যে কহিল, অনেকটা বিরাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আসবার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দ্দেশ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক; কিন্তু তল্পি বইবার লোকের দরকার হয় ত একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেন না।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয় ত আমিও একজনকে

দিতে পারি রাঁধতে যার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন, হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।

অবিনাশের কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল না; বলিলেন, হরেন, আর দেরী কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক্ না। কি বল?

হরেন্দ্র সবিনয়ে কহিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেন না? দুটো উপদেশ তাদের দিয়ে যাবেন না সেজদা!

অবিনাশ বলিলেন, উপদেশ দিতে ত আমি আসি নি, এসেছিলাম শুধু ওদের সঙ্গী হিসাবে। তার বোধ হয় আর দরকার নেই।

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত লইল। দশ-বারো বছরের বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্য্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা, কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই—জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এ সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটি সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে পারে, আজ এদের সেই আশীর্ব্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন করব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি কিছু শুনবো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও দ্বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত বক্তৃতা দিতে পারি নে, হরেনবাবু।

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ। দেশের কাজে যা তাদের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে শুধু তাই।

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন, আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই ত দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা ত সকলের এক নয়। আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে, আমার উপদেশ ত আপনাদের কাজে লাগবে না।

সতীশ মুস্কিলে পড়িল। এ কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন্দ্র কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হ'লো দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ সত্য স্বীকার করবে না?

কমল বলিল, না বলতে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বলতুম, এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলবার এবং ভোলাবার এত বড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভববন্ধন থেকে? কোন্‌টাকে দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ সেবার আদর্শ?

হরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এসব নয়, এসব নয়। এ আমাদের কাম্য নয়।

কমল বলিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসারে ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা; কিন্তু তার কি শিক্ষা ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতা নেই, পরনে জীর্ণবস্ত্র, মাথায় রুক্ষ কেশ, একবেলা অর্দ্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যেই বড় হয়ে উঠচে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েছে তারা সহজেই দিয়েছে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট তৈরি করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্ম্মের সাধনা, ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্থটা আগে পরিষ্কার হোক।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয়

আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বলছেন। তা যদি হয় সতীশবাবু, আমি নিজে ত ধর্মের সাধনাও করি নে, ত্যাগের দীক্ষাও নিই নি, তবুও আমাকে ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলুম ; কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব ত ?

সতীশ কথা কহিল না, কেমন একপ্রকার যেন বিব্রত হইয়া উঠিল এবং তাহারই চঞ্চল দৃষ্টির অনুসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্পলক চক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল, এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, রঙ অতিশয় ফর্সা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক, বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, সুমুখের দিকটায় এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয় ক্ষুদ্র—অন্ধকার গর্ত্ত হইতে ইঁদুরের চোখের মত জলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট সুমুখে ঝুঁকিয়া যেন অন্তরের সুকঠোর সঙ্কল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়, মনে হয় এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলা ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, ছোট ভাইয়ের মত রাজেন। এত বড় কর্ম্মী, এত বড় স্বদেশভক্ত, এত বড় ভয়শূন্য সাধুচিত্ত পুরুষ আমি আর দেখি নি। বৌদি, এঁর প্রশ্নই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য্য মানুষ! অজিতবাবু, এঁকেই আপনার তল্পি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, অক্ষয়বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, অক্ষয়বাবু ?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁ হে, হাঁ—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল, অ্যাঁ! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলেন। সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হ'লো হরি ঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাই না। তাই আসা, তা বেশ।

এ সকল কথায় কেহ জবাব দিল না; কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই, এ বিশ্বাসও কেহ করিল না। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেও না।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়ীটা ত চিনি নে—ভালই হ'লো যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসংবাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, না, গোপন করবার আর কি আছে। পথের মধ্যে আজ সেই সেলাইয়ের কল বিক্রী-আলা পাশা বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ী থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া-টতুয়া সেলাই করে খরচা চালাচ্ছিলেন—শিবনাথ ত দিব্যি গা ঢাকা দিয়েছেন, কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই ত! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে—আশুবাবু আজ পুরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল, কাল সকালে লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চলছিল না, আমাদের ত সে কথা জানালেই হ'তো।

তাহার বলার বর্ব্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্ম্মাহত হইল। কমলের ল্যাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্য্যন্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বলবেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয়বাবু, আপনি যান এ বাড়ী থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করি নি—ইচ্ছে করি নি আপনি আসেন, তবু এসেছেন। মানুষের ক্রট্যালিটির কি কোথাও কোন সীমা থাকবে না?

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছল ছল করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ী সঙ্গে আছে, দয়া ক'রে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধ হয় শীঘ্র দেখা হবে না, আমি এখান থেকে চলে যাচ্চি।

কোথায়, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পনের

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিল, গাড়ী থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ ত নয়?

অজিত উত্তর দিল, না, এ পথ নয়!

নয়? তাহ'লে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরব।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ-ভোলার অনুরোধ ত আমি করি নি অজিতবাবু, যে সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে! ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার—আমার কর্ত্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস করে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণার যদি ভুল করে থাকি, কমল?

যদির ওপর ত বিচার চলে না, অজিতবাবু! ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তারপরে এর বিচার করব।

অজিত অস্ফুটস্বরে বলিল, তাহ'লে বিচারই করুন, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার? সেদিন ত ঠিক এমনি অন্ধকারই ছিল!

হাঁ, এমনি অন্ধকারই ছিল। বলিয়া সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণীহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু!

হুঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়ীতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে? সেদিন পর্য্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমাব বড় অংশ, তার সঙ্গে আপোষ করব আমি কি করে? পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, সূর্য্যি যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে; কিন্তু…থাক…কিন্তু, আমি আজ কি ভাবছি তুমি বুঝতে পার না?

কমল বলিল, মেয়েমানুষ হ'য়ে এর পরেও বুঝতে পারব না আমি কি এতই নির্ব্বোধ? পথ যখনি ভুলেচেন আমি তখনই বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্ছে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সামলাতে পারবো না!

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ শান্ত কণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই অজিতবাবু, এমনিই হয়; কিন্তু আপনি ত শুধু কেবল পুরুষমানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষমানুষ। এর পর ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি করে? ততখানি ছোট কাজ ত আপনি পেরে উঠবেন না!

অজিত গাঢ়কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ আশঙ্কা তুমি কেন করচ, কমল?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্য করি নে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্য। পারলে ভয় ছিল না, পারবেন না বলেই ভাবনা। শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এত বড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়া হয়; আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলো অজিতের কাণে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না। চক্ষের পলকে তাহার শিরায় রক্ত পাগল হইয়া গেল—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পার না কমল ?

মুহূর্ত্তের তরে কমলের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি।

তবে কিসের জন্য ফিরতে চাও কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ী চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছু নেই ?

না ; কিন্তু আপনার ?

অজিতকে ভাবিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই—তার ত দরকার।

কমল কহিল, গাড়ীখানা বেচে ফেললেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ী বেচবো ? কিন্তু এ ত আমার নয়—আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি ? আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ীর নাম কখনও মুখে আনবেন না ! কোন চিন্তা নেই—চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি আমাকে উপহাস করচ ?

না, সত্যি বলচি।

সত্যিই বলচ এবং সত্যিই ভাবচ পরের জিনিষ আমি চুরি করতে পারি ? এ কাজ তুমি নিজে পার ?

কমল বলিল, আমার পারা-না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতুম। পরের জিনিষ আত্মসাৎ করার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিষ আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিষ বলে তোমার ধারণা ?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলি নি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই এবং সেজন্য লজ্জা বোধ করি নে। বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাকলেই লজ্জা বোধ করতাম। আর আমার বিশ্বাস সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এই কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশী নয়? শিক্ষিত ভদ্র মন বলে কি কখনো কিছু দেখো নি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন করব যদি সময় আসে। আজ নয়।—বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হ'লে বিদ্রূপ করে বলত যে কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ত ভদ্র মনের সঙ্কোচে বাধে নি? আমি কিন্তু তা বলতে পারব না, কারণ কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।

কোনদিন শোধ করি হ'তেও পার না?

এ ত ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু, আজ কি করে এর জবাব দেব?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবে না। মনে হয়, এই জন্যই শিবনাথের এত বড় নির্ম্মমতাও তোমাকে বাজে নি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচ। বলিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ী। পাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমন ভাবে গাড়ীগুলি রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক ত বুঝেছিলেন পথ ভুললেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল। এ ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিতবাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন। অমন করে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয়, কমল?

না, তা হয় না; কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার ত কেবল আপনাকে নিয়েই নয়—তা'হলে ত সব গোলই চুকে যেত! এখানে আর দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল বলে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা প্রকাশ আর কি আছে বলুন ত?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয়? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার আলোচনা হয় নি কমল? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল?

কমল এ প্রশ্নের বোধ হয় ঠিকমত উত্তর দিল না, কহিল, বিশ্বাস করা না করার গরজ আপনার; কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাই নি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও; কিন্তু ভুলের জন্য নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাও নি?

না।

তাহ'লে এইটুকু মাত্র বলতে পারি, তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পর অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এমনি ভুল যদি আবার কালও করে বসি তখনো কি তোমার দেখা পাব?

কিন্তু যদির উত্তর ত যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু। অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ এ মোহ আমার কাল পর্য্যন্ত টিকবে না এই তোমার বিশ্বাস?

অন্ততঃ অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশী করে জানি।

অজিত কহিল, জানলে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে আজ তোমাকে আমি মিথ্যে ভোলাতে চেয়েছিলাম। এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিল না।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা ত হয় নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। এ দুটো এক বস্তু নয়। আজ মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চান নি তা জানি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত ত তুমিই হ'তে কমল। আমার রাত্রের মোহ দিনের আলোতে কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও ত সঙ্গে যেতে অসম্মত হও নি? এ কি শুধুই উপহাস?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই করে দেখলেন না কেন? পথ খোলা ছিল, একবারও নিষেধ করিনি।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না ক'রে থাক তবে এই কথাই বলব যে তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভালবাসা যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি ত জানতে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি করে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে! কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্য্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্য্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে শান্তকণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়, সত্যও নয়। কোন্ আদিমকালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্য্যকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য্য ধ্রুব কি না জানি নে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নি ও দুটোই নশ্বর, হয়ত ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি হোক মোহ ক্ষণিকের কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের সত্য নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতী ফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলুম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এত বড় সত্য?

কথাগুলা যে অজিত বুঝিতে পারিল না তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি। যা পেয়েছি তার বেশী কেন পাই নি, এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এমনি নির্ব্বিকার করে তুলেচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে?

অপরের কথা? যাই হোক, তবু ত নিশ্চিন্ত হতে পারব অন্ততঃ আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল কহিল, নিশ্চিন্ত হলেই কি খুশী হবেন? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি, গাড়ী থামান, আমি নেমে যাই।

গাড়ী থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিতেই চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে?

আমি রাজেন। আজ হরেনদার আশ্রমে দেখেছেন।

ওঃ—রাজেন? এত রাত্রে এখানে কেন?

আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছি। আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ী থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে।—বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু?

লোকটি কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারদিকে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্চে। শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়ীতে নিয়ে এসেছে। আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

রাত এখন কত?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব।

অজিত একটা কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ী চালাইয়া হরেন্দ্রর বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সংবাদ দেবেন—বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সাদা কথায় জানাইয়া গেল এ তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। আজই সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রের মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যতকিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই মনে পড়িল। একদিকে তাহার এক্‌জামিন পাশ করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তাহা ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য! বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সেই অবধি নীরব হইয়া ছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে শোনার পর কোন কিছুতে মন দিবার শক্তি আর তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসংবদ্ধ প্রশ্নোত্তরমালার আঘাত অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা, অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশী ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীনা মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এ জগতে মিথ্যা বলার ইহার প্রয়োজন নাই। এ যেন পৃথিবী-শুদ্ধ সকলকে শুধু বিব্রত ও জব্দ করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছে, সে জানে না। এই মেয়েটিকে তাহারা প্রশ্ন করিতেছে মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কমলকে সে ঘৃণা করে। ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে সে যে আত্মবিস্মৃত উন্মাদের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্যও জ্ঞান হারাইয়াছে, ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয়, এই বলিয়া সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা

জানালায় দাঁড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ীর শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হাঁ।

যদু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচ বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন; কহিলেন, এই ঋতু-পরিবর্ত্তনের কালটা এমনিই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম-স্যারাম হঠাৎ যা সুরু হয়েচে, লোক মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভাল নয়, যেন জ্বরভাব করে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের ত অভাব নেই।

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখেশুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে; কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আসতে দেরী হতে লাগল—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখতে আছে? ঝগড়াঝাঁটি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তিন-চার দিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে যে জ্বরে পড়েছে একটা খবর পর্য্যন্তও ত নাও নি? ছি, এ কাজ ভাল হয় নি, এখন একলা তোমাকেই ভুগতে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল এই সরল-চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেন না। সে চুপ করিয়া রহিল, আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ী নেই, তখনই বুঝেছি অজিত তোমায় ছাড়ে নি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে; কিন্তু ভাব ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হ'লে তোমরা কি বিপদেই পড়তে!

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল। কোন কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতেই চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপধপ করিতেছে। স্নেহে ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল; কিন্তু কমল তাঁহার সকল কথায় কাণ দেয় নাই. হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই, জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, হাসপাতালে? তবেই ত তোমার রাগ এখনও পড়ে নি!

রাগের জন্যে বলচি নে আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক, তাই শুধু বলচি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে এটা স্বীকার করি, এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিল না। মণি জানতেন চিকিৎসা করবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁর আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারে না, ওষুধ-পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত ভালই হয়েছে যে খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁছেছে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল—সেবাই সব। যত্নই সবচেয়ে বড় ওষুধ। নইলে ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষ মাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়ায় বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগে ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিষ, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে। আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না করিবে বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহে পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে রোগীর বুকের 'পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার 'পরে পরস্পর সংবদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন অন্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মাত্র! মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পর যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ষোল

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্ব্বাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ বাড়ীতে আর ত আপনার একমুহূর্ত্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাব।

কমল কহিল, সেই ভাল, আমিও তখনই যাব। আপাততঃ এই চেয়ারটায় বসে বাকি রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরী করবেন না।

সকালে বেহারা অজিতকে আশুবাবুর শয়নকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল—ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভাল ছিল না, আজ মনে হচ্ছে যেন—আচ্ছা বস অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারি নে. বেশ, গুড্-বাই। আর কখনো যদি

দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আশীর্ব্বাদ করচি যেন আমাদের ক্ষমা করে তুমি জীবনে সুখী হ'তে পার।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। নির্ব্বাক্ বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক-ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এত বড় পরিবর্ত্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখা-চোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারারাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত কি যে ভেবেচি সে আমি কাকে জানাব ?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কাণ দিই নি, ভেবেছিলাম এ তাঁর বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝি নি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারি নি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে আগ্রায় যদি আমরা না আসতাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার এক ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর!

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু!

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু একটা তুমি উপায় করে দাও। আমার বাড়ীতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি

কি করতে বলেন বলুন ; কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চান না কিন্তু তিনি যে পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন, পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন, আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয় তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু জানেন ত চিকিৎসা করাবার শক্তি নেই আমার ; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশী পারি নে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল, কেন জানি নে, কিন্তু এমনি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিষ তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্য ভয় ক'রো না, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলেয় আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বলবার দরকার নেই, কমল, সে আমি জানি! একদিন সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি বেঁচে থাকতে এত বড় অন্যায় অত্যাচার তোমার উপরে ঘটতে দেব না।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না।

কি ভাবচ কমল ?

ভাবছিলুম আপনাকে বলবার প্রয়োজন আছে কিনা, কিন্তু মনে হচ্চে প্রয়োজন আছে, নইলে পরিষ্কার কিছুই হবে না, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে। আপনার টাকা আছে. হৃদয় আছে, পরের জন্য খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ ভুল যদি আপনার থাকে, সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ করব না।

আশুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই ?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেননি, যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো,

আমাকেই অনুগ্রহ করা; কিন্তু তা নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা, করুন আমার আপত্তি নাই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এমনি রাগ হয় বটে কমল, এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে চাচ্চি, তোমাকে অনুগ্রহ করচি নে। এ হলে হবে ত?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবে না। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারব না, আমার উপায় নেই। ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে না চান, হরেন্দ্রবাবুর আশ্রমে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনারা যা খরচ করবার তা সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি।—বলিয়া সে যথার্থ-ই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কাথয় আচরণে আশুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্য যা করতে যাচ্চি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখচ। একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং এ কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাকবে না সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে নানা মতেই বাঁচাতে পারি কিন্তু কেবল সেইটুকুই আমি চাই নি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেমনি করেই আবার ফিরে পাও, সেই কামনা করেই এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতা-বশেই করি নি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ; কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িল না। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে যাচ্ছিলাম, আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা-বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে; কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাই নে; সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে পারব না।

তাহার মধ্যে উষ্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্ত সাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, এ কি

কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ শিক্ষা তোমাকে যেই কেন না দিয়ে থাক, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাক, তুমি বাংলাদেশের মেয়ে। এ পথ তোমার আমার নয়, এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জান কমল, এক দেশের ধর্ম্ম আর এক দেশের অধর্ম্ম। আর স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁর দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন; কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা সে লেশমাত্র বিচলিত হইল না।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল; কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন-কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বার বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেছ কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্ব্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখে এসেচি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্কবাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি হ'ত! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে ত—উঃ শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা! এই বলিয়া তিনি স্বর্গত মনীষিগণের উদ্দেশে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধচক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাহার সংজ্ঞা নাই—এমনি অবস্থা!

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এই জন্যই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

শুধু কেবল এই জন্যই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এই জন্যই বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলেছিলেন—তাই।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যোদয় হয় তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাকতে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম্ম, দেশের পুরাণ ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি যা বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে এ ত শুধু তাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ফল। জাতি হিসাবে আমরা ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম, কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাব না, এ বোধশক্তি আমাদের দিলে কে বল ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো আমি কল্পনাও করিনি। আমার ভারি দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং পরক্ষণেই তিনি সতীশ ও রাজেনকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্ছেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়ীটা অমনি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়াস্ নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন।—এই বলিয়া তিনি কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেছে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছ থেকে দেখা যায় না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি শিক্ষিত-মনের পরিবর্ত্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডালপালা ছড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এই জন্যই নয়? বিশ্বাস না হয়, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। এই ব্রহ্মচর্য্য, সেই সংযম সাধনা, সেই পুরানো রীতিনীতির প্রবর্ত্তন—এ সবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যম নয়? তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই,

আশা করবার আর আমাদের বাকি থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নত শিরে নিতে পারলেই হ'লো আমাদের চরম সার্থকতা; এই আমাদের কল্যাণের পথ কমল, এ ছাড়া আর পথ নেই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা নাই—এই সাহেবী চালচলনের মানুষটি আজ বলে কি এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিল না। শুধু বলিবার শক্তির জন্যই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষণকাল পূর্ব্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখান নি। অনেক প্রাচীন রীতিনীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয়ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালই যে হবে প্রমাণ কি আশুবাবু? কই, সে ত বলেন নি?

বলি নি কি রকম?

না, বলেন নি। যা বলেছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবক মাত্রই ঠিক এমনি করে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধার মাত্রই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্যে কেউ শক্তি ক্ষয় করে না।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতন মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাল মনে ক'রে ক'রে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলতে চেয়েছিলুম আশুবাবু, কিন্তু আপনি কান দেন নি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক বা পারলৌকিক ধর্ম্মকর্ম্মই হোক, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্রীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশী করা যায় না। তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক্ হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি কি বল কমল? দেশের ধর্ম্ম, দেশের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ ক'রে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকি থাকবে কি? জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাব কোন্ পরিচয়ে?

কমল কহিল, দাবী আপনি ঘরে এসে পৌছবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে ত বুঝতে পারলাম না, কমল।

বোঝবার কথাও নয়, আশুবাবু। এমনিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানবচিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিনতে পারা যাবে না। মনে হবে যে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে; কিন্তু এ-ই মানুষের সত্য পরিচয়, এমনি ভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি, আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্কবিতর্কের ঝোড়ো-হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছে। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথায় তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না। শুধু ইহার মনে হইতে লাগিল এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝামুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গিয়াছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে করে এনেছিলেন, চলুন না পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেনের কাঁধের উপরে একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু, তুমি চল না ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করি নি। ঐ সর্ত্তে ইচ্ছে হয় পাঠিয়ে দেবেন, আমি যথাসাধ্য ক'রে দেখব। বাঁচেন ভালই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্য্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধেক পথে রাজেন বিদায় হইল। বলিয়া গেল ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতাবশতঃই বোধ করি আপত্তি করিল না, কিংবা হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ জাতীয় দাসীটি তাহার কাজকর্ম্ম করিয়া দিত সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদীর দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট-নাতনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গিয়াছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয় না। চারিদিকে এত যে আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল, সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল—ছাদের পুরানো চুন-বালি খসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই; চড়াই পাখীর বাসা তৈরীর অতিরিক্ত মালমসলা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদর বদলানো প্রয়োজন; বালিশের ওর অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার; চেয়ার-টেবিল

স্থানভ্রষ্ট, দরজার পাপোষটায় কাদা জমাট বাঁধিয়াছে, আয়নাটার অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে, দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলম-গুলা খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলোর চিহ্নমাত্র নাই—এমনি-ধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল, অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিল না। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলামাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবে বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই সে কেমন করিয়া যেন নাগাল পাইতেছিল না—রাত্রির পর প্রভাত এবং প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গৃহের প্রতি মমতা নেই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এত খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ ইহার কি প্রয়োজন হইল, এমনি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্যচক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এমনি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই-ই শেষ হইয়াছে; কিন্তু বেলা ত রোজই শেষ হয়, শুধু এমনি করিয়াই হইতে পায় না। সন্ধ্যার পর সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উল্টাইতে বসিল; কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিল না—কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরের আলো নিবিয়াছে এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অরুণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না। অতএব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া করিয়া উঠিল।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আসুন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, কোথায় বেরুচ্ছিলেন নাকি?

হাঁ। যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অসুখের খবর পেয়েচি। তাকে দেখতে যাচ্ছিলুম।

বেশ খবর। ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্মেই বোধ করি সুরু হ'লো। বস্তিগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেছে। মথুরা-বৃন্দাবনের মত সুরু হলে পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ বুড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানি নে। শুনেছি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ করে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এদিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় ক'রে উঠতে পারি নি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেন নি, শুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে ত কাল দেখেই এসেছেন— ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকাল থেকে জ্বর, বৌদির মুখটিও দেখলাম শুকনো শুকনো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ সকল খবরে সে যেন ভাল করিয়া মন দিতেই পারিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এ ছাড়া শিবনাথবাবু। ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার—বলা কিছু যায় না। অথচ হাসপাতালে যেতেও চাইলে না। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হ'লো। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জন-কয়েক পাঞ্জাবী আছে— ঠিকাদারী করে। শুনলাম তারা লোক ভাল।

কমল নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেন-বাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন?

পারি, কিন্তু তাকে পাব কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐ দিকের কোন একটা মুচিদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে ত খবর দেব।

তাকে রিমুভ করল কে? আপনি?

না, রাজেন। তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্চে। তবে তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েছে তখন সহজে ত্রুটি হতে দেবে না—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা—ওকে রোগে ধরে না। পুলিশে না ধরলে ও একাই একশ'। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ওকে কাবু করে দুনিয়ায় এমন কিছুই দেখলাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি?

আশা ত করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তাহ'লে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেন না কেন?

ঐটি শক্ত। বললে এমনি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবে না।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? ওকে ত জানেন না, না জানলে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায় না। আশ্রম না থাকে সেও সইবে, কিন্তু ও ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিটখানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদলাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনা করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেকে রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম, ব্যাপার কি? অসুখ বাড়ল নাকি? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স-বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রমবাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে—আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন এই তাঁর পণ, এর আর নড়চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হ'লো ভেতরে কি একটা গোলমাল আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বললেন, সঙ্কল্প অতিশয় সাধু কিন্তু ভারতে আশ্রমের ত অভাব নেই, সে আগ্রা ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে এ বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিনকতক টিকতে পারতাম। আমাকে দেখছি তল্পি বাঁধতে হ'লো।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকে এখানে আসচি। ভাবচি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বলব কি।

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে। হয়ত প্রকাশ্যে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে যে সর্ব্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই; কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিল না, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্ম্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ি থেকে বিদেয় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ ইচ্ছা ছিল না, শিবনাথ তার গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলে না। অজিতবাবু বোধ হয় এ পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া ক'রে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু শুনলেন কার কাছে? রাজেন বললে?

সে? সে পাত্রই ও নয়। জানলেও বলবে না। এ আমার অনুমান। তাই ভাবচি, মিটমাট ত হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপচাপ থাকাই ভাল। যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ক্রটি হবে না।

কমল কহিল, সেই ভাল।

কিন্তু এখন উঠি। সেজদার জন্যেই ভাবনা, ভারি অল্পে কাতর হন। সময় পাই ত কাল একবার আসব।

আসবেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেনকে পাঠাতে ভুলবেন না। বলবেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে বলা যায় না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি, কিন্তু তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।

দেব, নিশ্চয় দেব, বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণ-বেলায় রাজেন আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন, আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে।

তা দেব ; কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও গেল ?

বেশ ত হালকা হয়ে গেল। না, চাও ত বল, জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই ; কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকব ?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয় না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারী করে তুলতে আমার লজ্জা করে। 'আপনি' বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে ?

আমার বন্ধু হ'তে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী। তা যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে ?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বলতে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা ক'রে নিজেকে খাটো ক'রো না।

কিন্তু এ অনুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিল না, সে স্মিতমুখে সহজভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্য নয়, বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝি নে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি অস্বীকার করব না ; কিন্তু কি কাজে লাগবে তাই ভাবছি।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধি-শালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা ; তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচ ?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন ?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এসব ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ ; কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বলচ ?

সত্যিই বলচি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল, স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিষ বুঝিল। 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই—'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে ; তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজও নারীমূর্তির ছায়া পড়ে নাই—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, জান ?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিল না। সবাই সন্দেহ ক'রে নানা কথা কইলে, বললে, এ বিবাহ পাকা হ'লো না। আমার কিন্তু ভয় হ'লো না ; বললাম, হোক গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েছে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক'পাক পড়ল আমার দেখবার দরকার নেই। বরঞ্চ ভাবলুম, এ ভালই হ'লো যে, স্বামী বলে যাঁকে নিলুম তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধি নি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক্ না। মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া ক'রে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল ; কিন্তু এসব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝবে না !

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানি নি যে তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল। জানলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতে পারতুম।

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে ?

কমল সহসা আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক্ গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বাহিরের সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তা হোক, আমাকে ওঁর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি করবেন গিয়ে ?

নিজের চোখে একবার দেখতে চাই! যদি প্রয়োজন হয় থাকব। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই।—বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ, চলুন। আমি একটা গাড়ী ডেকে আনি গে।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ ক'রে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম; কিন্তু এখানে আমার থাকা চলবে না, শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করছে ?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে—সেজন্য নয়।

কমল হরেন্দ্রর কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এঁরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বলচেন ? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যাঁরা এমন আতঙ্কিত, ঘটা করে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত; কিন্তু তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন ? এই আগ্রা সহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবে না।

রাজেন কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং; কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুলব না; কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায় না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাকলে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেত।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সেজন্য নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারি নে। আর যাই হোক, আমাকে যাও বলা, হরেনদার মুখে আসবে না।

তবে যাবে কেন?

যাব নিজেরই জন্য। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবে না।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেচে, থাক্ না সেখানে মতের অমিল, হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন, কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে, এ কেন? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল ত সে কিসের শিক্ষা? মত এবং কর্ম্ম দুই-ই বাইরের জিনিষ রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ এদেরই বড় ক'রে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে, তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে, ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসলাম তখন হাসি নি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলনটাকেই একমাত্র সত্য স্থির ক'রে বাহিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল!

তার মানে?

রাজেন বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করি নে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাও হয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। রাজেন বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারে সর্ব্বনাশ করি নে—বন্ধুর হ'লেও না—তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বল?

রাজেন কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য, ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই। শিবানি—

কমল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক্, অন্তরের বিচার অন্তর্য্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুইজনের মনের মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে, সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের শক্তিটাই রাজার শক্তি, হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।—গাড়োয়ান, রোকো, রোকো,—শিবানি, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্পালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সতের

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের এ কি চেহারা! এখানে যে মানুষ বাস করিয়া আছে সহজে প্রত্যয় হয় না। লোকের সাড়া পাইয়া সতের-আঠার বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল, রাজেন তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথ বাবুর চাকর। পথ্য তৈরী করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্য্যন্ত এরই ডিউটি। সূর্য্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমোতে সুরু করেছিল, এখন উঠে আসচে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে ত একেই দিন, বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাৎ বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

ফাগুয়া।

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটি বাঁ-হাতের দুটো আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া?

হঁ—দুধ ভি পিলায়া।

বহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবী বাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দোপহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন তুমি কি করেছিলে বাবা, ঘুমচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফাগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ুটাড়ু কিছু আছে?

ফাগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল, রাজেন কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিটবেন নাকি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাসার সময়? মায়া-মমতা কি তোমার শরীরে নেই।

আগে ছিল। ফ্লাড্ আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচি।

ফাগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসি গে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটিকে নিয়ে যা পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব। ভয় পাবেন না, আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরব। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জ্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলে পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সংবাদ লইতে কেহ আসিল না। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝেয় কম্বল পাতিয়া ফাগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইক্লের ঘণ্টা শুনা গেল এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল, পরে হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনার 'পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন কহিল, ইতিমধ্যে দেখচি বিছানাটা পর্য্যন্ত বদলে ফেলেছেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জানলে শক্ত নয়।

কিন্তু জানলেন কি ক'রে? জানবার ত কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই? ছেলেবেলায় চা-বাগানে আমি অনেক রুগীর সেবা করেচি।

তাইত বলি! এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আসবার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বসচি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা ত তোমাকে বলি নি, হঠাৎ এ খেয়াল হ'লো কেন?

রাজেন বলিল, খেয়াল হঠাৎই হ'লো সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল,

তখন কি জানি কেন মনে হ'লো আপনারও হয়ত ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। আসবার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরী করবেন না, বসে যান। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজোটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ীর কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া এক টুকরা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্ছি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারও এমনি কথার মধ্যে বিশেষ রসকষ ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারব না ভাই। তুমি হয়ত জান না যে আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এইসব দামী ভাল ভাল খাবারও খাই নে। আমার জন্য ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেমনি বাসায় ফিরে গিয়েই খাব।

তা হ'লে আর রাত না ক'রে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে দিয়ে আসি গে।

তুমি এখানেই আবার আসবে?

আসবো।

কতক্ষণ থাকবে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্য্যন্ত। ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না করে নড়ব না। একটু ক্লান্ত, তা হোক। এতটা অযত্ন হবে ভাবি নি। উঠুন, এদিকে গাড়ী পাওয়া যাবে না, হাঁটতে হবে। ফেরবার পথে মুচিদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার। দু-ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে?

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নেই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারম্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করে—কর্ম্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জলবায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ অন্যের বিস্ময়ের অবধি

থাকে না, ভাবে, কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজে ত ডাক্তার ?

ডাক্তার ? না! ওদের ডাক্তারী ইস্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবিসী করেছিলাম।

তা হ'লে ওদের দেখচে কে ?

যম!

তবে তুমি কর কি ?

আমি করি তাঁর তদ্বির। তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত আমি।—এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া, তেমনি সুবিবেচনা। বিশ্বভুবনে সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা-সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস করচ রাজেন ?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে, বলেন আমাকে সিনিক্, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্রতা, সংযম ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতএব মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি; কিন্তু তা করি নে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যান না, গেলে আমার ধারণা আমারই মত পরম রাজভক্ত হয়ে উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মৃত্যু-রাজার গুণগান করতেন এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গালি দিয়ে আর বেড়াতেন না।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয় তোমাকে সিনিক্ বলাটা কি দোষের!

দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচিদের পাড়ায় ? গড়া গড়া পড়ে আছে—আজকের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে-কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হ'লো। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায় ? তখনি কূল

দেখতে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি, ভয় নেই, ওরে ভয় নেই—সমস্যা যতই গুরুতর হোক, সমাধান করবার ভার যাঁর হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেবভূমির সমস্ত ভার নিয়েছেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশী সৌভাগ্যবান ; কিন্তু কোথা থেকে কি সব কথা-এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

কিন্তু তোমাকে ত আবার এই পথ হেঁটেই ফিরতে হবে ?

তা হবে।

তোমার মুচিদের পাড়া কত দূর ?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা হ'লে তোমার পা-গাড়ী ক'রে ঘুরে এসো গে—আমি বসচি।

রাজেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা ! আপনার যে দুদিন খাওয়া হয় নি !

কে দিলে তোমাকে এ খবর ?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই ; কিন্তু খবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আসবার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুত, পাত্রটির চেহারা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সে গত রাত্রির ব্যাপার ! অর্থাৎ দিন-দুই চলেছে নিছক উপবাস, অতএব হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ ? কমল একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

তা জানি নে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করছি, সংবাদ পেলে আপনাকে জানাবো।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা ক'রো না। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেছেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন ; কিন্তু আমি তোমাকে চিনি ! সুতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার ! অথচ তার জন্য সময় চাই, সে পরিচয়, কথা-কাটাকাটি ক'রে হবে না। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা

খাই, অতি দরিদ্রের যে আহার—সেই একমুঠো ভাত-ডাল; কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতে পারি; কিন্তু দিন-দুই খাই নি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি করব না। তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলব না, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারব না রাজেন! তাই বলে রাগ ক'রো না যেন।

না।

কি ভাবচ বল ত?

ভাবচি, পরিচয়পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হ'লো না। আমি দেখচি সহজে ভুলতে পারব না।

সহজে ভুলতেই বা আমি তোমাকে দেব কেন?—বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরী করো না, যাও। যত শীঘ্র পার ফিরে এস। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখব—দু-চার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, আমরা বাসায় চলে যাব, কেমন?

রাজেন মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে; কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরী হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কমল বলিল, না; এই লোকটি যে আমার স্বামী এ খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যেই দিয়ে থাক, সে তামাসা করেছে। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞাসা করলেই খবর পাবে।

রাজেন কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক যেন এজন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? শুনিয়া কমল চমকিত হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন ভাব থাকে, তাহার অধিক নয়। এত বড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এই লোকটি কে শিবানী? তোমাকে সঙ্গে ক'রে ইনিই এনেছেন?

হাঁ। আমাকেও এনেছেন এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েছেন, তিনি।

নাম?

রাজেন।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়ীতে থাক?

সেই চেষ্টাই তো করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হুঁ। ওকে এখানে এনেচ কেন?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিল না। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই এ কথা তুমি কার মুখে শুনলে? আমি বলেচি, এই কি লোকেরা বলে, তাই?

কমল ইহার জবাব দিল না কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে কর নি, সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি, তুমি কি করতে? চলে আসবার সময় এ কথাটা বলে এলে না কেন? তোমাকে আটকাতে পারি, কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি, এই কি তুমি ভাবছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয় সে ত ভাল ক'রেই জানতে, তবে কেন কর নি তা?

শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে, ব্যবসায় খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি ত' ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক থাক, ও আমি জানতে চাই নি; কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি সত্যিই অসুখ ক'রেছিল?

সত্যি না ত কি?

সত্যি যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়ীতে গেলে কিসের জন্য? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের একশেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ সইতে পারলুম, নইলে পারতুম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জান তুমি, আমার সব সইল কিন্তু তোমাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেওয়াটা আমার সইল না। তাই এসেছিলুম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসি নি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, শিবানী!

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকো না, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়, তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটি সবচেয়ে ভালবাসতে!—বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও তাহার কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ ক'রে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেমনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

কি ভাবচ বল ত শিবানী?

কি ভাবচি জান? ভাবচি, মানুষ কত বড় পাষণ্ড হ'লে তবে একথা মনে করিয়ে দিতে পারে!

শিবনাথের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী! একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জানতে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাকবে না। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেছি—

কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়া করার কারণ ত আমি একবারও জিজ্ঞেসা করি নি? আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলুম, এ কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আস নি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যও আমি ধরে রাখতুম না।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয় নি শিবানী!

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হ'তে লাগল—পাথর কিনতে, চালান দিতে, ষ্টেশনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্য আর দুঃখ হয় না, হয় আর একজনের জন্য; কিন্তু আজ তোমার জন্যও দুঃখ হচ্ছে শিবনাথবাবু।

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, দেখ, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন ক'রে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা হবার তা ত হয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা ক'রো, হয়ত সুখী হতেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলো না। তোমার ভাল হোক, তুমি ভাল থাক, এ আমি আজও সত্যি সত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এত বড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।

বাহিরে পা-গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন চাপা গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি! রুগী কেমন? ওষুধ-টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়াই নি।

রাজেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কহিল, চুপ। ঘুম ভেঙ্গে যাবে সেটা ভাল না।

না; কিন্তু তোমার মুচিরা করলে কি?

তারা লোক ভাল, কথা রেখেছে। আমার যাবার আগেই যমরাজের মহিষ এসে আত্মা দুটো নিয়ে গেছে, সকালে ধড় দুটো তাদের মিউনিসি-প্যালিটির মহিষের হাবালা ক'রে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা-আষ্টেক শুষচে, কাল একবার দেখিয়ে আনব। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ করবেন; কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কই? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচলাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটো-ছুটিতে ঘেমে গেছি—একটা পাখাটাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তাহার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল, আমি বাতাস করচি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সব দিকেই সুখবর। বলিয়া সে চোখ বুজিল।

আঠার

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে সুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না, রোগে শুশ্রূষা করিবে কি মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। সহর ও পল্লী সর্ব্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিল না—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রাচীন-নগরীর মূর্ত্তি যেন দিন-কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল! ইস্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদীতীর শূন্যপ্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শববাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোন দিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষজনই নয়, গাছপালা, বাড়ীঘর-দোরের চেহারা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন সহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়—যেন আপনিই হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছলছল করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যে মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ

ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই—কখনও কথা হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ-কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচিদের পাড়ায় লোক আর বেশি নাই। যত না মারিয়াছে তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলে-বয়েসে চা-বাগানে সে পীড়িত কুলীদের সেবা করিয়াছিল, সেই ছিল তাহার ভরসা; কিন্তু দিন দুই-তিনেই বুঝিল সে সম্বল এখানে চলে না। মুচিদের সে কি অবস্থা! ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই এবং আবর্জ্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্ব্বে কমল জানিত না। অথচ এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব, এ কল্পনাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোন কিছুকেই সে ভয় করে না, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া বুঝিল ইহারও সীমা আছে। দিন-কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বার বার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখি নি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সামলে দিয়ে গেলেন; কিন্তু আর আবশ্যক নেই—আপনি দিনকতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এদের যা ক'রে গেলেন, সে ঋণ এরা জীবনে শুধতে পারবে না।

আর তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমিও পালাব। নইলে কি মরব বলতে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল; কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে, সে এ কয়দিন একেবারেই বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতে হইত, কিন্তু আজ আর সেই

ভয়ানক জায়গায় ফিরিতে হইবে না মনে করিয়া কমল একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে তাহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। আসিবার সময়ে আজ সে রাজেনের খাইবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল; কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল, তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতেই হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া, তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন্দ্র নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ-ছ' দিন রোজ আসচি, আপনাকে ধরতে পারি না। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচিদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, সেখানে? সেখানে ত ভয়ানক লোক মরচে শুনতে পাই। এ মতলব আপনাকে দিলে কে? যেই দিয়ে থাক, কাজটা ভাল করে নি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে ত প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ আমরা ত ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিন-কয়েকের জন্য—নইলে বাসাটা রেখে যেতেন না —আচ্ছা, রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি সহরে আছে, না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেছে যে কোন সন্ধান পাবার যো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বলতে সচরাচর লোকে যা বোঝে, তা নেই। তবু প্রয়োজন বটে। কারণ আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি ত একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকে না। আমার বিশ্বাস, আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি; কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ী থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরিয়ে গিয়ে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া, শুধু অন্যায় কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ী নয়, আমাদের আশ্রম। সেখানে স্থান দিতে তাকে পারি নি, কিন্তু তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয় না। বেশ, আমি চললাম। তাকে পূর্ব্বেও অনেকবার খুঁজে বা'র করেছি, এবারও বা'র করতে পারব, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল, তাঁকে যে ঢেকে রাখব হরেন-বাবু, রাখতে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচবে আপনি মনে করেন?

হরেন্দ্র নিজেও হাসিল, কিন্তু সে হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেক আছেন। তাঁরা কি বলবেন জানেন? বলবেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহু প্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা ক'রে নেবেন।—এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্চে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসি নি, কারণ, সংসারে যত লোক আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে, আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই ত আপনার মিল নেই!

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না, নেই; কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য্য কথাটাই আমি নিজেকে নিজে বারম্বার জিজ্ঞাসা করি।

কোন উত্তর পান না?

না; কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাব। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি—ভাল কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সংবাদ ত আগেই দিয়েছেন।

হরেন্দ্র বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায় সুমুখে এসে দাঁড়াল যে, তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়।

এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেছি, আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মামলা রুজু করেছে। এর বিচারক কোথায় মিলবে, কবে মিলবে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানি নে, কিন্তু এমন ক'রে সে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই সে অনুভব করলে না, তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি ক'রে ?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ নাকি? দু'কান-কাটার গল্প শোনেন নি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেন নি, কিন্তু আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলা ধাক্কায় দূর ক'রে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই, কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু ?

হরেন্দ্র এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক, এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করেন নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিলেন, সে আলাদা জিনিষ।

কমল কহিল, কি ক'রে জানলেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাবত। অথচ আমি জানি তা সত্যি নয়; কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার 'পরেই নির্ভর করে না— জগতের কাছে তার প্রমাণ কই ?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবই শুনেছেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত, সে বিষয়ে আপনি নির্ব্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখে সকলকে উপেক্ষা ক'রে ঘটে চলেচে, এই হয়েছে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশী পাই নি যে, অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন আপনি অনেক জেনেছেন, তেমনি এটাও জেনে রাখুন যে অক্ষয়বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়! সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্ব্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ

করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত-কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয় না এ ত আমি বলি নি হরেনবাবু, আমি বলেচি, এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়।—এই বলিয়া একটু-খানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তার বহুস্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক ও শ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াই নে, আমার এই সাহসটুকুই আপনাদের সমাদর লাভ করেচে। এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে এর জন্যই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আসছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিষটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত ক'রে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ কথা ত বলি নি। আমি বলছিলুম, এ বস্তু সংসারে দুর্লভ এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়; কিন্তু এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখতে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পারলাম না। আপনার অনেক কথাই অনেক সময় হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন, তাদেরও ডিঙিয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কার জবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিষ সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতুম না। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলুম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে। —বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং সমস্ত মুখের 'পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে, কমলের সে মূর্ত্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না যে অনুদ্দিষ্ট

আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কমল এই সকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ এবং এইজন্যই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্মদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন—ভাল কথা। শুনেছেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হ্যাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা সর্ত্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে দিতে পারি! না, না, চুক্তিপত্রে লেখাপড়া ক'রে নয়, এমনিই!

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট্।

কমল কহিল, সে ত আপনার বন্ধু অক্ষয়বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তার বিরুদ্ধে আমার নিজের খুব বেশী নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার ত' আর আপিল কোর্টে মেলে না!

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেন না?

কমল কহিল, একে ত আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিল না, আর থাকলেই বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায়, তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশী বাজে।—এই বলিয়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন সত্যিকার বিবাহ হয় নি বলেই এমন কথা মুখে আনতে পারচি, হ'লে পারতুম না। হ'লেও পারতুম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতুম না। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ-দেহে সংলগ্ন হয়ে থাকত এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটত। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এমনিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখতে চাইত, জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্য্যন্ত উপড়ে ফেলতে হ'তো। তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকতে পারে এমন কেউ নেই। এ সম্ভাবনা ভাবাও যায় না!

কমল বলিল, যায় এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায় নি। একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুল-চুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনিই অধিক, আর সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ ক'রে থাকে, তাকে ভাল বলে মানি কি ক'রে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দ্দশায় হরেন্দ্রের মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল; বিরুদ্ধ আলোচনায় সহজে সে যোগ দিত না এবং বিপক্ষদল যখন নানা-বিধ সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেমনি নির্লজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্কযুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথাও একটা নিগূঢ় রহস্য আছে, একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া ক'রে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই, আপনারা নিতেও পরেন না, ফেলতেও চান না। আধুনিক-কালের কতকগুলো বিলিতী চোখা-চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূতগ্রস্ত ক'রে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা নয় হে অক্ষয়, পূর্ব্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান-দুইতিন ইংরাজী তর্জ্জমার বই পড়লে জানা যায়। বুলির জলুস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জলুস? কমলের রূপের? অবিনাশবাবু, হরেন অবিবাহিত ছোকরা—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়াছে এই আশ্চর্য্য। এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো, অবিনাশবাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই

একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ-সব ভোলাতে পারে না—সে আসল নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয়বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাব, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করব না।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করি নে, হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাই নে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারীগিরি করে বেড়াই নে। আশ্রমের পায়ের ধূলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা কর গে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্য ভাবতে হবে না। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেন এবং নির্ম্মল চাপা হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রের আশ্রমের প্রতি কাহারও আস্থা ছিল না, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলে না, তার অন্য বিধি আছে; কিন্তু সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র, মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায় না।—এই বলিয়া সে অপর দুজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে? এত বড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিত যেন ভারি একটা পরিহাসের ব্যাপার!

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানই ত অক্ষয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ডজ্ঞান ওর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা ত দেখতে পাওয়া যায় না সেজদা, নইলে, হাসি-তামাসা কম লোকের মুখেই শোভা পেত। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়ে

ছিলেন, সংসারে দেনা-পাওনার লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাকে লোকচক্ষে ছোট করতে চান নি; কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন। শিবনাথ তার ভালবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইল না। এই ত আপনাদের ঘৃণার মূলধন? একে ভাঙ্গিয়ে যতকাল চালান যায়, চালান, আমি বিদায় নিলুম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল যে কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে যে শৈববিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায় সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই; কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র, অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নরনারী নির্ব্বিশেষ সকলের 'পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল—এইজন্যই দেশের ও দশের কল্যাণে সকল প্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া, এ সকলের মূলেই ছিল ঐ একটিমাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল; কিন্তু সে যে আজ তাহার মুখের 'পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে, এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা সে ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম্ম, নীতি, আচার ইহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় ইহার ব্যতিক্রমগুলোকেও সে অস্বীকার করিত না, কিন্তু এমন স্পর্দ্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিল না এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, এ কথা স্মরণ করিয়া বিতৃষ্ণায় তাহার মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা হ'লে যাই—

কমল হরেন্দ্রের মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, শুধু সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যে জন্যে এসেছিলেন তার ত কিছু করলেন না!

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে

যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বলবেন?

হরেন্দ্র বলিল, যদিও হয় আমি কখনও যোগ দিই নে। সে পুলিশের জিম্মায় না থাকলেই আমার কাছে যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে?

কিন্তু আপনি ত সে-সব কিছু মানেন না।

অনেকটা তাই বটে! অর্থাৎ মানতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার; কিন্তু বন্ধুকে শুধু জানলে হয় না হরেন্দ্রবাবু, আর একজনকে জানা দরকার।

বাহুল্য মনে করি। বহুদিনের বহু কাজেকর্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেছি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক, আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়, হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্যদিনের উত্তরে সঙ্গে মেলে না। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ ক'রে রাখতে নেই, ঠকতে হয়।

কথাগুলো যে শুধু তত্ত্ব হিসাবে কমল বলে নাই, কি একটা ইঙ্গিত করিয়াছে, হরেন্দ্র তাহা অনুমান করিল; কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইল না। রাজেনের প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া সে হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেছি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যিই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক আমি তার একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্বেই মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেলেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবে না, এই জোরে সে তার মৃতবন্ধুর পত্নীকে

বঞ্চিত করেছে, নিজের রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্ব্বনাশ করেছে! আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানে না যে দুনিয়ায় এই-ই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে।

কমল সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল, শাস্তিটা তার কি স্থির করেছেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন?—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। প্রস্তাবটা হরেন্দ্রের কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিল না। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল মত নির্ব্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে, সেও ত হতে পারে না। আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও ত মানে নেই?

কমল কহিল, তা হ'লে হবে কি এনে? আমাকেও পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন না, ঘাড়ে ধরে খেসারৎ আদায় ক'রে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ, টাকা আমি নেবো না, দ্বিতীয়তঃ, সে বস্তু তাঁর নাই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে, আমি ত জানি!

তবে কি এত বড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবে না? আর কিছু না হোক বাজারে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায়, এ খবরটা তাঁকে ত জানান দরকার?

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না না, সে করবেন না। ওতে আমার এত বড় অপমান যে সে আমি সইতে পারব না! কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জ্বলে মরেছিলুম যে এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল! স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতুম? তখন এই লুকোচুরির অসম্মানটাই যেন পর্ব্বত-প্রমাণ হয়ে দেখা দিত। তারপর হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এল। সেখানে কত মরণই চোখে দেখলুম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর এক পথ দিয়ে নেমে এসেছে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিল না সেই ত আমার সম্মান! লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্য্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ ক'রে যেতে হয়েছে। আর আমার নালিশ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভাল করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিল না, অবাক চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, সংসারে সব জিনিষ সকলের বোঝবার নয়, হরেন্দ্রবাবু! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু আমার কথা আর নয়। দুনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচজন বাস করে, তাদেরও সুখদুঃখ আছে।—এই বলিয়া সে নির্ম্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন-বাষ্প এক মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছেন খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন।

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন?

হাঁ, সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকটা ভাল। তাঁর এক জাঠ্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্যলাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দু'-এক মাস দেরী হবে।

আর নীলিমা? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে? একলা ঐ খালি বাসায়?

হরেন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্যে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার সুযোগ হয়েছে।

এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রের দ্বিধা কাটিয়া গেল এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশে নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা শালী নিয়ে ত জাঠ্‌তুতো ভায়ের বাড়ী ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও ত আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম, ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে, আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রহিল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরছে চারিদিকে, দাদার

বাড়ী থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ!

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ী ত আছে শুনেছি?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়ীও আছে শুনেছি, কিন্তু সে সকলের কোন উল্লেখই হ'লো না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানি নে, কিন্তু পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপনার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনি মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সৎ চরিত্রের লোক। সেজদার দারুণ দুর্দ্দিনে ছেড়ে যেতে পারে নি, এই থাকার জন্যই হয়ত ওদিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এইসব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসছেন, না?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে; ওরা দুজনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন। বৌদির ত আগ্রহের সীমা নেই—এক-দিন যাবেন ওখানে?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুন না হরেন্দ্রবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন? চলুন। আমি একটা গাড়ী নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই।—এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়ীতে দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন। হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে?

মানে নেই—এমনি। চলুন যাই।

উনিশ

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেই দিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিনকতক হইতে আর জ্বর ছিল না, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। ইহারা ঘরে প্রবেশ করিতে আশুবাবু কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুসী হইলেন সে তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আসিবে না। তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস, আমার কাছে এসে বস।—এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন; বলিলেন, কেমন আছ বল ত কমল?

কমল হাসিয়া জবাব দিল, ভালই ত আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদ। নইলে যে দুর্দ্দিন পড়েছে তাতে কেউ যে ভাল আছে তা ভাবতেই পারা যায় না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয়, বাসায় তালাবদ্ধ, তার সন্ধান পাই নে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হয়ত বা তুমি দিন-কয়েকের তরে কোথাও চলে গেছ।

হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না—এই আগ্রাতেই মুচিদের পাড়ায় সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেরে ধরে এনেছি।

আশুবাবু ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, মুচিদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখছে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিল না। তার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করেছিলাম। যেথায় দৈবের এত বড় নিগ্রহ সুরু হইয়াছে, সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবে না এ আমি জানিব না ত জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু'-তিন দিনের বেশী দেখি নি, কিছুই জানি নে, তবু মনে হয় কি যে এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরী। তাকে নিয়ে এলে না কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞাসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে ত সব বোঝা যায় না।

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরী আছে।

কেন ?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয় নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন না এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে তোমার বা কি ক'রে ছুটি হ'লো ? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে ? নিষেধ করতে পারি নে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা, কমল ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্য নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই ? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে দিয়েই এসেছি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন। এক-একজনের দেহযন্ত্রেও প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন যে, সে না হয় কখন শেষ, না যায় কখন বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হ'তো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি ক'রে ? ক'দিনই বা বাঁচবে ! সেখান থেকে একলা যখন চলে এলুম, কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচে না, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন করে, যেন নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেচি, প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটীরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে, তখন তার ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকবে কে ? আজই হরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথ-বাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলুম—

আশুবাবু এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল ? শুনেছি তাঁকে সেবা করার জন্যই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে।

কমল কহিল, লজ্জা সেজন্য নয়, আশুবাবু। যখন দেখতে পেলুম তাঁর কোন অসুখই নেই—সমস্তই ভান—কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পায় নি, আপনি বাড়ী

থেকে বার করে দিয়েছেন—তখন কি যে আমার হ'লো সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। যে সঙ্গে ছিল তাকেও এ কথা জানাতে পারি নি—শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম। পথের মধ্যে বার বার ক'রে কেবল এই একটা কথাই মনে হ'তে লাগল, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ায় না আছে ধর্ম্ম, না আছে সম্মান।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্য নয়?

কিন্তু জবাব দেবার পূর্ব্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতিনমস্কার করিল এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-যে দুর্ব্বলতা, কমল! এ জিনিষ ত তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। আমি বরাবর ভাবতাম, যা অন্যায়, যা মিথ্যাচার, তাকে তুমি মাপ করো না।

হরেন্দ্র কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানি নে, কিন্তু মুচিদের পাড়ায় মরণ দেখে ওঁর ধারণা বদলেচে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক, এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সে-ই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশী একটা কথাও কহিত না। কহিল, এ-প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। যা নেই, তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়; যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশী পারলেন না বলে রাগারাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনার কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানা-টানি করবেন না।—এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দ্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল! দেখুন ত, খেতে পারবেন, না, আবার গরম করে আনতে বলব?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাকলে চলবে না—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙ্গতে আমি দেবো না।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়।

আমি ভুলি নে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়সের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বইকি! দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনও আপনার অনেক—অনেক বাকি। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করি গে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন? যাই?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না, তথাপি সম্মতি দিতে হইল: কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেও না, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি গে।—বলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটিকয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল, ধরা পড়িল রমণী দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছিল। এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্য্যের কিছু নাই, সাধারণের কাছে এ-কথা বলা চলে, কিন্তু সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎলাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিল না। নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন

ও রূপের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে, ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে। সেদিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় সত্য পূজিত হইতেছে কোনদিকের কোন প্রলোভনই তাহাতে দাগ ফেলিতে পারে নাই, ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশু-বাবুর বয়স বেশী ছিল না—তখনও যৌবন অতিক্রান্ত হয় নাই; কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মীলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উদ্যম-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই, কিন্তু দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ ঘরে আসিয়া অন্যমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কিনা। যদি পড়িয়াই থাকে দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি, অত্যাজ্য ধর্ম্মের ন্যায় একাগ্র সতর্কতায় তিনি আজীবন যাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আসক্তির এই নবজাগ্রত চেতনায় সে ধর্ম্ম লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ হইয়াছে কিনা।

চাকর চা-রুটি-ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোটখাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে—এমনি অনেক কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্‌শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না যে, যে বৌদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কিনা। এই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভার্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সুপরিচিত সমস্ত কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জ্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় যে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, সেই এই কিনা।

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটিতে দু'-এক বার

চুমুক দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুণ্নস্বরে সেই অনুযোগ করতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ?

ভুলে গেলাম ? তার মানে ?

তার মানে এই যে আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি ত কিছু খাই নে।

এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই—এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ এ একগুঁয়েমির পরিবর্তন নেই। কিন্তু অত দর্প করি নে হরেনবাবু, তবে সাধারণতঃ এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে তা মানি।

পথে বাহির লইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত ?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই, আপনার বাড়ীর মধ্যে ঢুকবো না, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ অতি-ঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েছে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভাল হইল না, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে, হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু 'না' বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল এবং এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই সে তাহার বাসার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া ত কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়ীতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে খাবেন কি ? আশ্রমে পাচক রাখবার ত ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ আপনি আর অজিতবাবু?

হাঁ; কিন্তু হাসছেন যে? নিতান্ত মন্দ রাঁধি নে আমরা।

তা জানি, এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিতবাবু নেই, সুতরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন ত আমার ভারি ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যই মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ত্রুটি করি নি যে, যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে, আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি—শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাই নে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাবো না তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা দেখে এসেচি তাকেও প্রচুর বলা চলে না। সুতরাং এখানে খাবার কষ্ট যদিবা হয়, অন্যের মত অসহ্য হবে না এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুসী হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা দেখে এসেছেন তাই বটে। সত্যই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অসচ্ছল নয়—কষ্ট পাওয়ার ত কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক, প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধে এমনি ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। অথচ বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু বুঝিয়ে দিতে পারেন?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি, ভিতরের লোককে দিতে পারবো। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণপোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে, তাতে এর বেশী চলে না। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেন নি

কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজমন্ত্রটুকু দান ক'রে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়—সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু এ সত্যও যে স্মরণ না করিয়া পারিল না যে, এত বড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহে না—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এত বড় দুর্গতির মূল, তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই এবং বোধ করি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচি নে কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারি নে যে, আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্য্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ দুঃখের অভিনয় বলে। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নাই। বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারি একটা বেসুরা বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জবাব দিল, কিন্তু এটা তো মানেন যে, প্রাচুর্য্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে?

কমল ষ্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্য ওদিকে খানিকটা সত্য থাকা চাই, হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম-অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েছেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝি নে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্যভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ বস্তু দেখতে পাবেন—দৃষ্টান্তের জন্য ভারত পর্য্যটন করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তর্ক থাক্, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুস্কিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছরক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর আদর্শ ও-চোখে তামাসা বলেই ঠেকবে। দিন, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিল না।

হরেন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, ধরুন কেউ যদি যথার্থ-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে, তখন ত অভিনয় বলে তাকে তামাসা করা চলবে না? তখন ত—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাসা নয়, তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেন্দ্রবাবু, কিছুকাল পূর্ব্বে আমিও কতকটা আপনার মত করেই ভেবেছি, উপবাসের নেশার মত আমাকে তা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেছে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেছে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক, ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই! ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্ব্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ—অভাব যে মানুষকে কত হীন, কত ছোট করে আনে, সে আমি দেখে এসেছি মহামারীর মধ্যে—মুচিদের পাড়ায় গিয়ে। আর একজন দেখেছেন তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তার কাছ থেকে ত কিছু পাওয়া যাবে না, আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। আমি প্রায়ই ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় ক'রে। সেই যে কথায় আছে—মণি ফেলে আঁচলে কাচখণ্ড গেরো দেওয়া—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেন না! আশ্চর্য!

হরেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রের বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল; নারীত্বের শান্ত মাধুর্য্য ও শুচিতার আদর্শে ইহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না। মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে প্রভেদ ইহাদের মধ্যে যত বেশীই থাক, সেবা ও মমতায় উহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না; কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্ব্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ়

অন্তর্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রের ক্ষুধা ছিল না, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারি ভাল লাগিয়াছে বলিয়া পত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল; কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এমনি করেই জব্দ করেচি, কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হ'তেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেন না।

কমল হাসিয়া কহিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষমানুষেরই এমনি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদির খাওয়া হ'তো না—উপবাস ক'রে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেন না।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মোটা-বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক—এতেই লাভ বেশী। আপনাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভিমানে উপোস ক'রে মরতে আমরা নারাজ।

কমল এ কথার জবাব দিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই ক'রে দেখব।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটা অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন এ কথার জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন? মনে হয় যেন রাজরাণী হওয়াই যাকে সাজে, কাঙালপনা তাকে মানায় না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার উঠুন। ও-ঘরে গিয়ে সারারাত গল্প শুনবো, এ-ঘরের কাজটা ততক্ষণ সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বো না, তা যত রাত্রিই হোক। বলুন—

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল বৌদিদির সমস্ত কথা ত আমি জানি নে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশদার বাসায়। বস্তুতঃ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানি নে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকু জানি। কেবল একটা কথা বোধ করি সংসারের সকলের চেয়ে বেশী জানি, সে তার অকলঙ্ক শুভ্রতা। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি—তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে স্মৃতি মোছে নি, মোছবার নয়—জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরুষমহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে, তাঁর নিষ্ঠাও অনন্ত-সাধারণ—আমি অস্বীকার করি নে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো, এখন আর বাসায় যাওয়া চলে না—এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানে শোব। আর ত ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল। কমল হাসিয়া বলিল, আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনার ভয়ের কারণ আছে নাকি?

হরেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতেও পারিল না। স্ত্রীলোক হইয়া এ কথা সে উচ্চারণ করিল কি করিয়া!

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকে ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েছে হরেনবাবু, আপনি বাসায় যান। তাতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলে নি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ী। নির্জ্জন গৃহে অনাত্মীয় নরনারীর একটি মাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন—পুরুষের কাছে যে মেয়েমানুষ সে শুধু মেয়েমানুষ, এর বেশী খবর আপনার কাছে আজো পৌঁছায় নি। ব্রহ্মচারী

হলেও না। যান, আর দেরী করবেন না, আশ্রমে যান।—বলিয়া সে নিজেই বাহিরে অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

কুড়ি

প্রায় মাসাধিককাল গত হইয়াছে। আগ্রায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্তিটি শান্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে দু-একটা নূতন আক্রমণের কথা শুনা যায় বটে, তবে মারাত্মক নয়! কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি, নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যে রকম খাটছেন তাতে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবে, হ'লো? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে, ঢের দেরী। জরুরী থাকে ত না হয় বলুন, কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরি জিনিষ যে একবার ব্যবহার করেছে সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই দেখুন না লালাদের বাড়ী থেকে আবার একখান গরদ, আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন?

নিই সাধে? বললাম, ছ'মাসের আগে হবে না—তাতেই রাজী। বললে, ছ'মাসের পর ত হবে, তাতেই চলবে। এই দেখুন না মজুরির টাকা পর্য্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক্ করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশী আসতে থাকলে দেখছি আমাকে লোক রাখতে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরানো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রীর তৈরী—আমাকে দিয়ে এরকম হবে না। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার চেয়ে বড় কারিগর এখানে কেউ আছে নাকি ?

এখানে না থাকে কলকাতায় আছে। সেইখানেই পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

না, না, সে হবে না। আপনি যা পারেন তাই করে দেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড়লোক, সৌখিন মানুষ, যা-তা তৈরী ক'রে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন ? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট ক'রে লাভ নেই, আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কি ক'রে জানলেন এটা অজিতবাবুর ?

কমল কহিল, আমি হাত গুণতে পারি। গরদের কাপড়, অগ্রিম মূল্য অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলে চলে—হিন্দুস্থানী লালাজীরা অত নির্ব্বোধ নয় হরেনবাবু। তাঁকে জানাবেন—তাঁর জামা তৈরী করার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের সস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। এ পারি নে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারি ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জানতে পারেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করেচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করি নি। তাকে বলেছিলাম অল্পমূল্যের সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজী হ'লো না। বললে, এ ত আমার নিত্য-ব্যবহারের মেরজাই নয়, এ কমলের হাতে তৈরী জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষে পর্ব্বদিনে পরবার। এ আমার তোলা থাকবে। এ জগতে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।

কমল বলিল, কিছুকাল পূর্ব্বে ঠিক তার উল্টো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধ করি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি ? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত ?

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রর সমস্তই মনে ছিল ; একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয় ; কিন্তু এ ধারণা ত একদিন অনেকেরই ছিল। বোধ হয় ছিল না শুধু আশুবাবুর ; কিন্তু তাঁকেও ত একদিন বিচলিত হতে দেখেছি। আমার

নিজের কথাটাই ধরুন না—আজ ত আর প্রমাণ দিতে হবে না, কিন্তু সেদিনের কষ্টিপাথরে ঘষে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায়?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন?

হরেন্দ্র বুঝিল, এই সকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, এখনো পাই নি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাই নি। পুলিশের জিম্মায় গিয়ে পড়েচে কিনা এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলুম।

হরেন্দ্র কহিল, নিয়েচি। আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু স্বস্তি বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন, মুচিদের পাড়ায় চেষ্টা ক'রে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায় না? হরেনবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারি নে, আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুল চক্ষে চাহিল যে, হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্ব্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কৌতুকের সীমা নাই—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারে না এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলি, থাক আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ কি, দাঁড়িয়ে আছেন যে! একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসতেও পারেন নি?

বসতে ত আপনি বলেন নি।

বেশ যা হোক! খুশি নি বলে বসবেন না!

না। না বললে বসা উচিত নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও ত বলি নি—দাঁড়িয়েই বা আছেন কেন?

এ যদি বলেন ত আমার না-দাঁড়ানই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার করছি।

শুনিয়া কমল হাসিল। বলিল, তা হ'লে আমিও দোষ স্বীকার করচি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, দেখুন হরেন্দ্রবাবু, আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি, আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বসতে বলতে ভুলেচি, যে আদরটুকু অতিথিকে করা উচিত ছিল করি নি—হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ত্রুটি আপনার চোখে পড়েচে। না না, রাগ করেছেন বলি নি, তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ সংস্কার মানুষের গিয়েও যেতে চায় না—কোথায় একটুখানি থেকেই যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য্য বুঝিল না, একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ এইটিই লোকে সবচেয়ে বেশী ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সব আমাকে বলচেন, না আপনাকে আপনি বলচেন? যদি আমার জন্য হয় ত আর একটু খোলসা করে বলুন। এ হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকচে না।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয় না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হোঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখনি কেবল চৈতন্য জাগে—আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে, হাঁ। অন্ততঃ আগ্রার রাস্তায় একটু হুঁস ক'রে চলা ভাল—ও দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায় ঘটে; কিন্তু হেঁয়ালি ত হেঁয়ালি রয়ে গেল, মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হ'লো না।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেনবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম্ম বোঝা যায় না। এই দেখুন, আমাকে ত কেউ বলে দেয় নি, কিন্তু অর্থ বুঝতেও বাধে নি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগ্য। হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্ছি খুলতে—তত যাচ্ছে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয়

বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কূলকিনারা পাচ্চি নে। এ সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ ক'রে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ ক'রে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারব। নইলে এ ভাবে ঘুমন্ত-মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির 'পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসিমুখে বলিল, কার বুদ্ধির প'রে? আমার না নিজের?

দুজনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকেই মনে পড়ছে। আশুবাবু, মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ—এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল, ও চলবে না—আপনি আবার গম্ভীর হয়ে উঠচেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টানাটানি আমার সইবে না। বরঞ্চ যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা, আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্চিলেন—তাই বলুন, আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালবাসি—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি, আর যাই করি, আপনাকে ঠকাবো না। সংসারে আরও পাঁচজনের মত ভালবাসার গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুনতেই ভালবাসেন? তার বেশীতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা—অক্ষয়ের দল শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া বলিল, না তারা খাবে না। আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেছে, যেখানেই যাই সৎপথে আমাকে সে রাখবেই। বরঞ্চ আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারবো না—আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি ক'রে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়।

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পান না?

না।

পাবার কথাও নয় এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয় না।

কেন বিশ্বাস হয় না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেছি; কিন্তু আরও ভাল ক্যানডিডেট্ আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করবার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর দিয়ে দেখবেন। এইটুকু নিবেদন।

কিন্তু কেস ত অনুমানে ভর করে বিচার করা যায় না হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির হয়।

কমল জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সেলায়ের কাজগুলো একে একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুকরিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েচে হরেনবাবু, একটুখানি চা তৈরী করে আনি, আপনি বসুন।

হরেন কহিল, বসেই ত আছি, কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই, কারণ পেলেই খাই, না পেলে খাই নে। ওর জন্য কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যান নি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেছেন?

কমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, না। আমার মনেও হয় নি।

তা হ'লে চলুন না আজ আশুবাবুর বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যই খুব খুসী হবেন। সেই অসুখের মধ্যেই একবার গিয়েছিলেন, এখন তিনি ভাল আছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারি নি। অন্যায় হয়ে গেছে।

তা হ'লে আজই চলুন না?

চলুন; কিন্তু সন্ধ্যেটা হোক। আপনি বসুন, চট করে একবাটি চা নিয়ে আসি।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উভয়ে পথে বাহির হইলে হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাকতে গেলেই ভাল হ'তো।

কমল কহিল, হ'তো না। চেনা লোক কেউ হয়ত দেখে ফেলতো।

দেখলেই বা। ওসব আমি আর এখন গ্রাহ্য করি নে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল পরিহাস, কহিল, কিন্তু এই চেনা লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হ'তে আজকাল সঙ্কোচ-বোধ করেন, কি তারা ভাবে?

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অন্য কিছু ভাবতে পারে? বলুন?

এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানি নে, সমস্তই দুর্ব্বোধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভাল। রাজেনকে যে ভুলতে পারি নে—এ সবচেয়ে বেশী টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হ'লো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিই নি, আদর করে ডেকে এনেছিলুম। আমার ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলে না। হাওয়া আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো—পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখবার সময় পাই নি—হয়ত বুঝতে দেরী হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সান্ত্বনা!

সান্ত্বনা? কেন?

তা জানি নে।

কেহই আর কথা কহিল না, উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বোধ করি একটু ঘুরপথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। খবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারেন নাই বলিয়া বেয়ারাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ভাল আছেন ?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হাঁ ভালই আছেন।

তাঁর ঘরেই আছেন ?

না, উপরের সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করছেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা ?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি।

পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুইজনেই একটু আশ্চর্য্য হইল। এসেন্স ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই, আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা ছড়াইয়া চুরুট টানিতেছেন এবং অদূরে সোফার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আবহাওয়ার মত কড়া ভাব—বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাঙলা বলায় রুচি নাই। হয়ত অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজী বলিয়া যাইতেছেন।

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই সমস্ত মুখ তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেন না। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেছেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারব।

একটু থামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয়ে উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আমি ?

ওহো—তাও ত বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসার অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকি পরিচয় যথাসময়ে হবে—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে

খানিকক্ষণ চুপ করে বসি। এইজন্যে প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছট্‌ফট্‌ করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা ভারী হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে এসছো ত?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি? এ বাড়ীতে খাওয়াতে পারবো না ত।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

একুশ

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন, বর্ণনা আমার মিললো ত? বুড়োবয়সের extravagance বলে উপহাস করা হয় নি, মানলে ত?

মহিলাটি নির্ব্বাক্‌ হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার-কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়ের বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য্য লাগে, ভেতরটা দেখতে পেলে তেমনি অবাক্‌ হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র, ঠিক নয়?

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল; কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কিনা তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাসা ক'রে থাকেন, তিনি যে বেঠিক নন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রাজ্ঞানটা আপনার এ সংসারে অচল।

ইস্‌, তাই বইকি? বলিয়াই আশুবাবু গম্ভীর সস্নেহের সুরে কহিলেন, এ বাড়ীতে খাওয়াতে তোমাকে কিছুতেই পারবো না জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বল ত?

রোজ যা খাই, তাই।

তবু কি শুনিই না? বেলা ভাবছিলেন, এও আমি বাড়িয়ে বলেচি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলোচনাই হয়ে গেছে ?

তা হয়েছে—অস্বীকার করবো না।

রৌপ্য পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল এবং সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। এ গৃহে অজিত একদিন বাড়ীর ছেলের মতই ছিল, আগ্রায় থাকিয়াও আর আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না-আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের 'পরে ভারী একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিলেন, তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

খানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

আশুবাবু কহিলেন, বস অজিত। ভাল আছ ?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে ? ভাল মনে হচ্ছে ত ?

আশুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলেই ভরসা পাচ্চি।

পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর এইখানেই থামিল। কমল না থাকিলে হয়ত আরও দুই-একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখাচোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিল না। মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকেই এখন আসচেন ?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। বলিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারি নি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আসতে হয়েচে।

আমার সন্ধানে ? প্রয়োজন ?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে দুপুর থেকে বোধ করি বার-চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বসতে বলেছিলাম। রাজী হলেন না। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত ধাতে সয় না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি কে ? দেখতে কেমন ? বললেন না কেন সে এখানে নেই।

অজিত কহিল, সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছি। বোধ হয় বিশ্বাস করলেন না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্নমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কমলকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার ভার আশুবাবুর 'পরে দিয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া গেলে আশুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটিকে আমি দু-তিনবারের বেশী দেখি নি—বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলে না, কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কি যেন একটা মহামূল্য জিনিষ সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ হরেন্দ্রের মুখে শুনি সে ভারি wild—পুলিশে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে—ভয় হয় কোথাও কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে, হয়ত খবরও একটা পাবো না—এই দেখ না হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কেউ খুঁজে পাচ্চে না।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বিপদে পড়েচে, কি করেন?

আশুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায়—এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেন্দ্রর কাছ থেকে শুনেছি। পরার্থে আপনাকে সত্যি ক'রে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি—শুনতে শুনতে যেন তার ছবি দেখতে পেতাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তার কোন বিপদ না ঘটে।

প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে সকলে বোধ হয় এ প্রার্থনায় যোগ দিল।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাকে আজ ত দেখতে পেলুম না? বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক দিনরাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েছেন। শরীরটা বোধ হয় একটু বেশি রকমই খারাপ হয়েছে, নইলে এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই—কতটুকুই বা পরিচয়, অথচ আজ ভাবি সংসারে আপন-পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন। দুনিয়ায় আপন-পর কেউ নেই কমল, স্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায়—তার কোন হিসাব কেউ জানে না।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু অপরিচিত রমণী বেলা ব্যতীত অপর দুজনেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্য্যন্ত সংসারে অনেক জিনিষই যেন আর একরকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জন্যই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভাল-মন্দর বাদানুবাদ—মানুষের অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা ক'রে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আনন্দ ত নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমল বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাহার বাক্যের তাৎপর্য্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়—যেন কুয়াসার মধ্যে আগন্তুকের মুখ দেখা; কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধ হয় কমলের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

আসবো। আজ যাই।

এসো। গাড়ীটা নীচেই আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিই নি। অজিত, তুমিও কেন সঙ্গে যাও না, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে?

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হ'লো না, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমার সৌভাগ্য; কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদলায়।

গাড়ীর মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসিল। রাস্তার মোড় ফিরিলে কমল কহিল, সেদিনের রাতটাও এমনি অন্ধকার ছিল—মনে পড়ে?

পড়ে।

সেদিনের পাগলামি?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজী হয়েছিলুম সে মনে আছে?

অজিত হাসিয়া কহিল, না; কিন্তু আপনি যে বিদ্রূপ করেছিলেন সে মনে আছে।

কমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিদ্রূপ করেছিলুম? কই না!

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল কহিল, তা হ'লে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক, আজ ত আর কয়টি নে—চলুন না, আজই দুজনে চলে যাই?

দ্যুৎ। আপনি ভারি দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের? আমার মত এমন শান্ত সুবোধ কে আছে বলুন ত? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল চল যাই, তক্ষুণি রাজী হয়ে বললুম, চলুন।

কিন্তু সে ত শুধু পরিহাস!

কমল বলিল, বেশ, তা না হয় পরিহাসই হ'লো, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেছি বলুন ত? ডাকতেন তুমি বলে, আরম্ভ করেছেন আপনি বলতে। কত দুঃখ-কষ্টে দিন চলে—আপনাদেরই জামাকাপড় সেলাই করে কোনমতে হয়ত দুটি খেতে পাই, অথচ আপনার টাকার অবধি নেই—একটা দিনও কি খবর নিয়েছেন? মনোরমা এ দুঃখে পড়লে কি আপনি সইতেন? দিনরাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কমল সহসা হাত টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার, রোকো রোকো—এ যে পাগলা গারদের সামনে এসে পড়েচি। গাড়ী ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারা যায় না।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সান্ত্বনা এই যে হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার যো নেই। সে অধিকারে ও বঞ্চিত।—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। শুনিয়া কমল হাসিল, কহিল, তা বটে; কিন্তু বিচার জিনিষটাই ত সংসারের সব নয়, এখানে অবিচারের স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চলচে, নইলে কোন্‌কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতেই কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ী যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরী হবে।

সে কি কথা! অত রাত্রে এ অঞ্চলে আমি গাড়ী পাব কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেব।

গাড়ী চলিয়া গেল। অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবে না জানি, অন্ধকারে তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেন না। কারণ আপনাকে না খাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতুম না। আসুন।

বাসায় দাসী আজ আলো জ্বালিয়া অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া অজিতকে রান্নাঘরে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, ষ্টোভ জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে?

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাৎ বলতে পারেন? বলুন ত দেখি?

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্‌খানে কি ছিল এবং নাই—মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, ওদিকে সারা রাত খুঁজলেও পাবেন না। আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোন্‌দিকে বলুন ত?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে আমি খুব বেশী ক'রে চেয়ে দেখি নি। অন্য সবাই পেরেছে, শুধু আমি কি জানি কেন পেরে উঠি নি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ ওইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্ভ্রম-বোধ ছিল না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলুম যেমন ক'রে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবোই। আশুবাবুর বাড়ীতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আনবোই। খাওয়ানো একটা ছোট উপলক্ষ্য—তাই ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেন না—আজ রাত্রে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না—এই বাড়ীতেই বন্ধ ক'রে রাখবো।

কিন্তু তাতে লাভ কি ?

কমল কহিল, লাভের কথা পরে বলবো, কিন্তু আমাকে 'আপনি' বললে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন 'তুমি' বলে ডাকতেন, সেদিনও বলতে আমি সাধি নি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদলে দেবার মত কোনও অপরাধ করি নি। অভিমান ক'রে সাড়া যদি না দিই, আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্য; কিন্তু সে যখন অমন করে চলে গেল, তখন সবাই ভাবলে আর একদণ্ডও আপনি এখানে থাকবেন না। কেবল আমি জানতুম, আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে আপনাকে ভালবাসি এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

না, করি নে।

নিশ্চয় করেন। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতূহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ ? একটা শুনি।

কমল বলিল, শোনাবো বলেই ত যেতে দিই নি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী-গরীবদের কাপড় সেলাই ক'রে নিজের খাওয়া-পরা চালাই—এ আমার সয়; কিন্তু দায়ে পড়েছি বলে আপনারও জামা সেলাই করার দাম নেবো—এও কি সয় ?

কিন্তু তুমি ত কারও দান নাও না !

না, দান আমি কারও নিই নে, এমন কি আপনারও না; কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর ক'রে বললেন না, কমল, এ কাজ তোমাকে আমি করতে দেবো না। আমি

তার কি জবাব দিতুম? আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যায়, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবো?

কথাটার ব্যথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল। অজিত বলিল, এমন হতেই পারে না কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটা দিনও এমন ক'রে ভেবে দেখি নি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, যে কমলকে আমরা সবাই জানি সেই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশী নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর আসিল না; বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই, এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দুজনেই বেশী করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহারে বসিয়া অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, অথচ মজা এই যে, যার যত টাকাকড়িই থাকুক—তোমার উপার্জ্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিত্রাণ নেই, অথচ নিজে তুমি কারও নেবে না, কারও খাবে না। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান কেন? তা ছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন?

অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বরাবরই হয়েচে। আর তোমার খাই শুধু তোমার জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি, কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, উঞ্ছবৃত্তি আর ক'রো না, তুমি তখনি হয়ত এমনি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বা'র হবে না।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা বলেছিলেন কোনদিন?

মনে হয় যেন বলেছিলাম।

আর আমি শুনি নি সে কথা?

না।

তা হ'লে শোনবার মত ক'রে বলেন নি। হয়ত মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হয়েই ছিল—মুখ দিয়ে তা প্রকাশ পায় নি।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি।

তা হ'লে আমিও যদি বলি, না।

অজিত হাতের ব্যাগ নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই ত। তোমাকে একটা দিনও আমরা বুঝতে পারলাম না। যেদিন তাদের সুমুখে প্রথমে দেখি, সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝি নি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজেই বললে আমার ভার নিন—আবার তখনি বললে, না।

কমল হাসিয়া কহিল, এমনি ধারা একটা 'না' আপনি বলুন ত দেখি? বলুন ত যা খেয়েছেন আর কোনদিন খাবেন না—কেমন আপনার কথা থাকে!

অজিত কহিল, থাকবে কি ক'রে? না খাইয়ে তুমি ত ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিল না। শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার সময় আজও আপনার আসে নি। যেদিন আসবে সেদিন আমার মুখ দিয়েও 'না' বেরুবে না। রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি খেয়ে নিন।

নিই। সেদিন কখনো আসবে কিনা বলে দিতে পার?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারি নে। জবাব আপনাকে নিজেই একদিন খুঁজে নিতে হবে।

সে শক্তি আমার নেই। একদিন অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাই নি। জবাব তোমার কাছে পাবো এই আশা ক'রে আজ থেকে আমি হাত পেতে থাকব। এই বলিয়া অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

খানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেন্দ্রর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন?

অজিত কহিল, কোথাও ত থাকা চাই। তুমি নিজেই জানো আগ্রা ছেড়ে আমার যাবার যো ছিল না।

জানি তা হ'লে?

হাঁ, জানো বইকি।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা আমার কাছে চলে এলেন না কেন?

যদি আসতাম, সত্যিই কি স্থান দিতে?

সত্যি ত আর আসেন নি? সে যাক, কিন্তু হরেন্দ্রর আশ্রমে ত কষ্টের সীমা নেই—নেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত কষ্ট আপনার সইল কি ক'রে?

জানি নে কি ক'রে সইল, কিন্তু আজ আর আমার ওকথা মনেও হয় না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত এই আমার ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ করেও ছিলাম না। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি—তিন-চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েচি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বা'র হব।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে? হরেন্দ্র বোধ হয়?

অজিত কহিল, যদিও দিয়ে থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েছেন। দেশের সর্ব্বনাশ যারা চোখে দেখেছে—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্ম্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্ব্বল্যের একান্ত ভীরুতা—

কমল বাধা দিয়া বলিল, হরেন্দ্র এসব দেখেচেন অস্বীকার করি নে, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন কিছু দেখবার ত আজও সুযোগ পান নি।

কিন্তু এ সবই ত সত্যিই?

সত্যি নয় তা বলি নে, কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় কি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা?

নয় কেন? ভারতবর্ষ বলতে ত শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয়? এর প্রাচীন সভ্যতা, এর ধর্ম্মের বিশিষ্টতা, এর নীতির পবিত্রতা, এর ন্যায়-নিষ্ঠার মহিমা—এই ত ভারত, তাই ত এর নাম দেবভূমি—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাচাবার তপস্যা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে? ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের জীবনে সার্থক হবার—ধন্য হবার—

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার খাওয়া হয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে চলুন—আর না।

তুমি খাবে না?

আমি কি দুবেলা খাই যে আজ খাব? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে ত ফিরে যেতে হবে।

না, হবে না, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো; কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রমবাসীদের, আপনার জন্য নয়।

কিন্তু লোকে বলবে কি?

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য্য থাকে না, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষে করতে পারবে না। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশী আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকেছিলেন– কিন্তু পারি নি, আজ আর না পারলে আমার চলবে না—চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা—আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ ঘরে আসিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যাবস্ত্র দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং নিজের জন্য মেঝের উপর যেমন-তেমন গোছের আর একটা বিছানা পাতিয়া রাখিয়া বলিল, আসছি। মিনিট-দশেকের বেশী দেরী হবে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে না যেন।

না।

তা হ'লে ঠেলে তুলে দেব।

তার দরকার হবে না কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে, বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া—দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, নীচে সিঁড়ির কপাট বন্ধ করা—গৃহস্থালির এমনি সব ছোটখাটো কাজ তখনো বাকি, সে-সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সযত্ন রচিত শুভ্র সুন্দর শয্যাটির 'পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু যে ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভাল লাগার তৃপ্তি। হয়ত একটু কৌতূহল মিশানো, কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নেই—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সন্তান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত; কিন্তু হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভর্ত্তি হওয়া অবধি দৈন্য ও আত্মনিগ্রহের সুদুর্গম পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্ম্মোপলব্ধির একাগ্র সাধনা, এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সূতা দিয়া তৈরী বালিশের

ওড়ের চারিধারে ছোট ছোট গুটি-কয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে সাদা রেশম দিয়া বোনা কোন একটা অজানা লতার একটুখানি ছবি। এইটুকু শিল্পকর্ম—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই ত আছে। অবসরকালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া সেইটি নাড়াচাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ ত!

কমল একটু আশ্চর্য্য হইল—কি বেশ? ঐ লতাটুকু?

হাঁ, আর ঐ হলদে রঙের ফুলগুলি। তুমি নিজে করেচো, না?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন। নিজে নয় ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েছি? আপনার চাই ঐ রকম?

না না না—আমার চাইনে। আমি কি করব?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, কমল রাত জেগে তৈরি ক'রে দিয়েচে।

ধ্যাৎ!

ধ্যাৎ কেন? নিজের জন্য এসব জিনিস কেউ তৈরি করে না, করে আর একজনের জন্য। কষ্ট ক'রে ঐ ফুলগুলি যে সেলাই করেছিলুম সে কি নিজে শোবো বলে? একদিন একজন আসবেই—শুধু তারই জন্য এসব তোলা ছিল। সকালে যখন চলে যাবেন, সমস্ত আপনার সঙ্গে দেব।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা?

কেন?

তুমি আমাকেই মনে ক'রে এসব তৈরি করেছিলে এও বিশ্বাস করবো?

কেন করবেন না?

করবো না সত্যি নয় বলে।

কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন বলুন?

নিশ্চয় করবো। তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই—কোথাও বাধে না। সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হ'লে আমার লজ্জার অবধি থাকে

না, সে আলাদা; কিন্তু যা পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন কিছুর জন্যই মিথ্যে বলতে পারো না, এ আমি জানি।

তা হ'লে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করি নি, সত্যি কথাই বলচি, বিশ্বাস করবেন?

নিশ্চয় করবো।

কমল কহিল, তা যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথাই বলবো। তখনো রাজেন আসে নি। অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয় নেয় নি। আমারো ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘৃণায় দূর ক'রে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইলো না—সেই গভীর দুঃখের দিনের ঐ শিল্প-কাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ ক'রে যে করেছিলাম আমি কোনদিন হয়ত জানতে পারতুম না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম; কিন্তু আজ বিছানা পাততে এসে হঠাৎ মনে হ'লো, না না, ওতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েছে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে শুতে দিতে পারি নে।

কেন পারো না?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেল।—এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হ'লো, ঐগুলি বাক্সে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাততে গিয়ে আজ প্রথম টের পেলুম সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলুম সে আপনি।

অজিত কথা কহিল না। শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের 'পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমিষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপ ক'রে কি ভাবচেন বলুন ত?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারচি নে।

তার কারণ?

কারণ? তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতর যেমন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়—না এলো আনন্দ, না এলো আশা!

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমল,

একটা গল্প বলি শোনো। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ জিউর পূজোর ঘরে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে সুমুখে বসে খেয়েছিলেন—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবুও বাড়ীর কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি। সবাই বুঝলে এ তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু এই অবিশ্বাসের দুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যায় নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাসা করো নি জানি; কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েচে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায়, নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমরাও তেমনি। এতদিন পৃথিবীর কত জায়গায় ত ঘুরেচি, শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা। বাবার দেওয়া। এ ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে, আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালবাসতে পার।

কমল কহিল, টাকার জন্য ভাবনা নেই, আশ্রমবাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েচে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃস্ব এ খবর কি ছাই আগে পেয়েচি? তা হ'লে কি কখনো ভালবাসতে যেতুম? তা ছাড়া, আপনার স্বভাবের ভাল-মন্দটুকু বুঝে দেখবার সময় পেলুম কই? মনের মধ্যে ছিল শুধু একটা সন্দেহ, তার ঠিকানা পেলুম না, কেবল এই ত মিনিট-দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার সুমুখে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বলচো মাত্র মিনিট-দশেক? কিন্তু সত্যি হ'লে এ তো পাগলামি!

কমল বলিল, পাগলামিই ত। তাইত আপনাকে বলেছিলুম, আমাকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ ক'রে ঘর-সংসার করুন এ ভিক্ষে ত চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, কহিল, ভিক্ষে বলচ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালবাসার অধিকার; কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদবুদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও ত পারে এর পরমায়ু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে

হবে কেন। আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, আমি তাদের কেউ নয়।

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক; কিন্তু গাছের ফুল শুকাবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলুম যে, কোন আনন্দের স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানবজীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাইত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা ক'রে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। শিবনাথ তাহাকে বিবাহ করে নাই, ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটা দিনের জন্যও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথম দিনের জন্য অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল, এই ফাঁকির মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এত বড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব্ব করা আমার সাজে না, কিন্তু তোমার কাছে আর কিছুই গোপন করবো না। এঁরা বলেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালবাসার আর কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না, মনে হ'লে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্ব্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্য্যন্ত জয় করতে পারবো না। অদৃষ্টে তাই যদি কখনও ঘটে, আশ্রম ত্যাগ ক'রে আমি চলে যাবো; কিন্তু তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে। ও ডাকে সাড়া দিতে আমি পারবো না।

একে মিথ্যে বলচেন কেন?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যই কখনো আমাকে ভালবাসে নি তার

আচরণে বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালবাসা ত আমি নিজের চোখেই দেখেচি। সেদিন তার যেন আর সীমা ছিল না, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল কহিল, আজ যদি তা গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারীজীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল নারীজীবনের সত্যাসত্য নির্দ্দেশের ভার নারীর 'পরেই থাকে। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই—মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলে না। অবিচারে কেবল এক পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অজিতবাবু, দু'পক্ষের সর্ব্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন, দুনিয়ার কম পুরুষের ভাগ্যেই জোটে; কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক তত বড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেচি বলে পুরুষের বিচারে এই হ'লো নারীজীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই সুবিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কি? যা এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশি সম্মান মানুষে দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবে না জানি। আমার উঠোনের ধারে যে ফুল ফোটে তারা জীবন একবেলার বেশী নয়। তার চেয়ে ওই মশলা-পেষা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায়?

কমল, এ যুক্তি নয়, এ শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু? কেবল স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার, তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে

পারেন নি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখাত লিখে যে বন্ধন নেবে না, তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝে না, তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলার নয়, ও নিত্যকালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে রগড়ে মশলা পিষে দেবে—ভাত গেলবার তরকারীর উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে। ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিদ্রূপ কিসের কমল?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেল না, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, মানুষ বোঝে না যে হৃদয় বস্তুটা লোহার তৈরী নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম্ম, এই তার সত্য। অথচ এ কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি সংসারে আর আছে কি? তাইত কেউ ভেবেই পেলে না শিবনাথকে কি ক'রে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করিতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তেতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ ক'রে তোলে। এই হ'লো মিথ্যে, আর বাইরের শুক্‌না লতা মরে গিয়েও গাছের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হ'লো সত্য?

অজিত একমনে শুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত, তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত তুমি কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারো না, এবং এখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হ'লো কমল, নিষ্ফল কলহ বন্ধ করো—এ আদর্শ তোমার জন্য নয়।

কোন্ আদর্শ—আপনার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই; কিন্তু এ গূঢ়তত্ত্ব বিদেশীদের জন্য নয়। এ তুমি বুঝবে না।

আপনার সাগরেদি করলেও পারবো না?

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল। যেন সে মানুষ আর নয়। কহিল, আচ্ছা, বলুন ত কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি? বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েচে যেন আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেনকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে—তোমার কিছুই বোধ হয় মনে হ'লো না, না?

কি আবার মনে হবে?

এসব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই কর না?

কি গ্রাহ্য করি নে, আপনাদের লতামত? না।

নিজের সম্বন্ধেও বোধ করি কখনো ভয় কর না?

কমল বলিল, কখনো করি নে তা বলতে পারি নে, কিন্তু ব্রহ্মচারীকে ভয় কিসের?

হুঁ, বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হ'লে তার রক্ষে নেই—তাকে গিলে খাবার মুখ হা ক'রে আছে। লুকানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়, এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাঁদের ইহজীবনের সর্বাসর্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মতো তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে; গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে—পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, তাদের জাত তুমি নও। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আসচে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিকে অবজ্ঞা করার সাহস যে তুমি কোথায় পাও, তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা জ্ঞানবানের মত শোনাচ্ছে?

অজিত কহিল, আচ্ছা, কমল, সত্যি বলো, আমার মতামতও কি অন্য সকলের মত তোমার কাছে এমন তুচ্ছ?

কিন্তু এ কথা জেনে আপনার হবে কি?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন অহঙ্কার করি নি। বাস্তবিক ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্ব্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছু জোর ক'রে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার নিজের চেয়েও ঢের বেশী জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানোও তেমনি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই ত। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি ক'রে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, কিছুই হবে না, সেদিন হারানোও ঠিক এমনি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিদ্যেই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেছি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব্ব করে কিসের?

কমল কহিল, অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন, হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নরনারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। তারপর ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথাও উচ্চারণ করিল না।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূবের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অজিতবাবু, ঘুমোবার বোধ করি আর সময় নেই।

না, এইবার উঠি।—বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

বাইশ

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র, এর বেশী দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে একদিনও করেন না। পৈতৃক বিপুল ধনসম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহভার ও আনুষঙ্গিক বাতব্যাধিটাও তেমনি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব স্ব নিয়মেই চলে—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই, সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন। একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্যদেবতাকে অজস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া দিল, সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই। ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার করিয়া বলিতে থাকিত যে, এমনিই হয়। এমনি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এমনি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই,—ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকেই নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ, না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ব্ববিধ দুঃখই তাহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধ প্রচ্ছন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে

পড়িতে লাগিল আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্য্যের অভাব বহু স্থলেই, যেন চাপা পড়িতে চাহে না, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তায় যায় ঘেঁষিয়া আসে, মন্তব্য-প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকরবাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়াবাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন ত তিনি সারিয়া আসিতেছেন; কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, তাঁহার নিভৃত চিত্ততলে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে, আগ্রা-বাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তারপরে হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকেল-বেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব, রায়বাহাদুর, সদর-আলা, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী—নানা কারণে স্থানত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা—হরেন্দ্র, অজিত এবং বাঙালীপাড়ার যাঁহারা আনন্দের দিনে বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ। আসে না শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ী গিয়াছে, বোধ হয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সংবাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসে না কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজলিসি লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিসে আর যোগ দিতে পারেন না, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন—তাঁহার স্বাস্থ্য-হীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে সকল কর্ত্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া বেলাকে এখন তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও ত্রুটি ঘটে না, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ ক'রে, হয়ত বা সভাশেষে পরিতৃপ্ত-চিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে, অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়ে নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়!

সম্ভব কি করিয়াই যে হয়—এই ইতিহাসটুকুই গোপন থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইত না, অভ্যাসও ছিল না, ভালও বাসিত না; কিন্তু অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ এই গ্রহের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ়, তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধ করি কেহ অনুভবও করে না।

হিম-ঋতুর প্রথমার্দ্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতেই টিপটিপ বৃষ্টি নামিয়াছিল--বিকেলের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল; বাহিরে কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। ঘরের শার্সিগুলা অসময়েই বন্ধ হইয়াছে, আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেমনি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি একখানা বই পড়িতেছেন; বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্যই বলিয়া বসিল, এ পোড়াদেশের সবই উল্টো। কিছু-কাল আগে এ অঞ্চলে একবার এসেছিলুম—জন কিংবা জুলাই হয়ত হবে—এই জলের জন্য যে দেশে জুড়ে এত বড় হাহাকার ওঠে, না এলে এ কখনো আমি ভাবতেও পারতুম না। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এর কারণ কি সকলে টের পায়? পায় না।

বেলা সরল-চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্ম-লাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন, এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে?

জবাবটা এমনি অভাবিতরূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন, সে তেমনি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন এ কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহপ্রিয় রমণী নয়, এবং মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে

পড়ে নাই—অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি বা তেমনিই আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রুক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হাস্য-কৌতুকে চপল, চঞ্চল—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণিকের জন্য মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে, সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ ক'রে কোন লাভ নাই। শুধু অনধিকার চর্চ্চা বলেই নয়, হাহাকার ক'রে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক, সে আমি পারি নে এবং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্মসম্মানবোধ বজায় থাক, তার বড় আমি কিছু চাই নে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিল না।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না, না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারে না—কখনো পারে না তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভালো। এতদিন একসঙ্গে আছি, এ ত আমি ভাবতেই পারতুম না।

নীলিমা হাঁ-না একটা উত্তরও দিল না, যেন ঘরে কেহ নাই এমনিভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মমত কি ছিল কেহ জানে না; সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেন না। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। বেলা নামটি সখ করিয়া তাঁহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দশ একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইল না। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন, দিনকতক দেখাশুনা ও মন জানা-জানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইনমতে রেজিষ্ট্রি করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশভ্রমণ, আলাদা বায়ু পরিবর্তন, এমনি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশ যেটুকু, তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বরপক্ষ হাতে হাতে ধরা পড়িলেন এবং কন্যাপক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিতে চাহিলেন। বন্ধুমহলে আপোষের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নরনারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিল না। স্বামী বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাহাই হোক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিল না, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্যমত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিল না। শেষে বহু দুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনে মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্যযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা-স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিমলা, মুসৌরি, নইনি প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি ত ছিলই না, বরঞ্চ অতিশয় মর্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূর সম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তাসূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল; নিতান্ত পরের মত আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়িতে ঢুকে নাই। এ তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল একেবারে অনুরূপ। এ গৃহে কাহার স্থানে যে

কোথায় এ বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না; কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্তৃত্বও ছিল তেমনি অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথম কথা কহিল, বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যেই যে ও-কথা নীলিমা বলেচেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্য বেলা?

বেলা কহিল, আপনি ত সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবে না; কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও করবো না। নিজের মর্য্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাই নি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সবচেয়ে বেশী; আজ তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সবচেয়ে কঠিন; কিন্তু অন্যায় করি নি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাই নি, আজও তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাটি।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বলেছিলেন যে, বিবেক-বুদ্ধিটাই সংসারের মস্ত বড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয় না।

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হাঁ। বলেন, ওটা শুধু নির্ব্বোধের হাতের অস্ত্র। সামনে পিছনে দুইদিকেই কাটে—ওর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও কথা তুমি মুখে এনো না নীলিমা।

বেলা কহিল, এত বড় দুঃসাহসের কথাও ত কখনো শুনি নি!

আশুবাবু মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে; তার সব কথা সব সময়ে বোঝাও যায় না, মানাও চলে না।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই বাবার নিষেধও মানতে পারি নি--স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুম না।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারি নি।

বেলা কহিল, thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দুসমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই, কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারি নি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিষটা শোভনও নয়, সুখেরও নয়; সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জ্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবো না।

নীলিমা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন?

সত্যি বইকি।

নীলিমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই স্তব্ধতার সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই নীলিমা, বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হ'তো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি ত কমলের একজন বড় ভক্ত; বল ত সে নিজে এ ক্ষেত্রে কি করতো? কি জবাব দিতো? তাইত সেদিন যখন ওদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল তোমার মত ক'রে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেচি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, বেচারা ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয়, নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই ত টানাটানি। এইমাত্র বলছিলেন, তার সকল কথা বোঝাও যায় না, মানাও চলে না; চলে না কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, যে জন্যই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ সময়ে আলোচনা করা ভাল নয়।

নীলিমা এ কথা কানে তুলিল না, বলিল, সেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন এবং আজ অসঙ্কোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থায় কমল কি করতো, তা সেই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি ক'রে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী-মজুরের জামা সেলাই ক'রে আহার সংগ্রহ করতে হ'তো—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না। কমল আর যাই করুক, যে স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেচে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ করে বাঁচতে চাইতো না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা ক'রে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাসা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যে তাহার কাজ, সে যে সহসা এমন নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারে, দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিসে আমি বসি নে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে, সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি বলতুম না। কমল একটা দিনের জন্যও শিবনাথের নিন্দা করে নি, একটি লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায় নি—কেন জানেন?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায় শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন?

নীলিমা কহিল, কেন তা বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার—এ একটা অত্যন্ত স্থূল কথা; কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে মেয়েমানুষ আমি, মেয়েদের দাবীর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করি নে, আমি জানি এ সত্যি, কিন্তু, এ কথাও জানি সত্যবিলাসী একদল অবুঝ নরনারীর মুখে মুখে, আন্দোলনে আন্দোলনে এ সত্য এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে, আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চ্চা করবেন না।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে সেলাইয়ের জিনিসপত্রগুলো তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেছে জানি নে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই অর্দ্ধেক ভিজিয়াছে। বলিল, বৌদি কই?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে এ ভরসা তাঁহার ছিল না; সাগ্রহে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এসো অজিত, বসো হরেন্দ্র।

বসি। বৌদি কোথায়?

ইস্। দুজনেই যে ভারী ভিজে গেছো দেখছি।

আজ্ঞে হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন?

ডেকে পাঠাচ্ছি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেই ভিতরের দিকের পর্দ্দা সরাইয়া নীলিমা আপনি প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

হরেন্দ্র কহিল, এ কি? আপনি হাত গুণতে জানেন নাকি?

নীলিমা বলিল, গোণাগাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলুম। একটি ভাঙা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলছিল, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশসুদ্ধ লোকের চোখে পড়েছে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাতার মধ্যে দুজনে? তাইতে দুজনকেই ভিজতে হয়েছে।—এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকারতত্ত্বে বিশ্বাসী, অন্যায় করেন

না, তাই চুল চিরে ছাতি ভাগ ক'রে পথে হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো।—এই বলিয়া সে জামাকাপড় হরেন্দ্রর হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চলবে না।

বেলা এতক্ষণ শুষ্ক বিষণ্ণমুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল এবং নীলিমাও জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি যে হরেন, আর খুঁড়ো না। দেখচো না মেয়েদের কি রকম ব্যথা লাগলো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্ত্তন করেছি। খোঁড়া-খুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নরজাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারে না। অতএব চিরস্থায়মান হিমাচলের ন্যায় ও-দেহ অক্ষয় হোক, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন এবং জল-বৃষ্টির ছুঁতানাতায় ইতরজনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ ত আবহমানকাল চলে আসচে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দ্দিষ্টধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোসামোদ না করলে ইতরজনের ভাগ্যে মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনি নি ভাই, তাই শুনতে একটু লোভ হয়।

তবে আরম্ভ করবো নাকি?

আচ্ছা এখন থাক। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড গে, আমি গামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হ'লে? তারপরে?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তারপর চেষ্টা করে দেখি ইতরজনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট ক'রে চেষ্টা করতে হবে না বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেইখানেই অন্নের ভাঁড়ার উথলে যাবে! চলো অজিত, আর ভাবনা নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি গে।—বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

তেইশ

অজিত কহিল, জল থামবার ত কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব আবার দুজনে সেই ভাঙা ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকারতত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছানো। অবশ্য তার পরের ভাবনাটা নেই, এখানে তা চুকিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং আর একবার ভিজে কাপড ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, তা হ'লে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভরেই খেয়ে নিলে না কেন?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না না, থাক, তাতে আর কি হয়েছে, আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগা মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও। আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, বৈরাগ্যগিরিতে পেকে গেছেন, সুতরাং খাবার দিক থেকে ওঁর ত্রুটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্য। এমন সংসর্গেও যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠতে পারছেন না, সে ওঁকে আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে তাই। ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপ থাক, উনি ধরাই পড়ুন একদিন—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা ক'রে পূজো দেব।

তা হ'লে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বকচেন হরেনবাবু, ভারী বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারী রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব নাকি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়, আর একটুখানি বেড়েছে, এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তার অত্যন্ত অনুরাগ। ব্রহ্মচর্য্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনামাত্রই অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে উঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মূঢ়-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুক বোধ করতেও অপারগ হন না। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমায় তুলনা করেছিলেন, আশুবাবু?—এই বলিয়া সে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার রুক্ষ স্বর ইহাদের কানে গেল কিনা ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল—অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্ব্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে! আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে আশুবাবু? সে আপনাদের কে, তবুও এত বড় অন্যায় সহ্য হ'লো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যেন

আগুন ধরে গেল; কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে 'না'র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপরে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই—দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই করে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল চমকে উঠে শুধু বললে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল, তার প্রতি নির্ম্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ ক'রে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হুতাশ নয়—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে গেল।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা!

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে রাগ হয় ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক-অনুশাসন—সব কিছুকেই উপহাস ক'রে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পরধর্ম্মের ভাব বয়ে যাচ্চে; তবুও ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারি নে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্চে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিষটি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। তাই ওর যেমন কথা তেমনি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে, তবু সে মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন ক'রে থাকলে ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকতো না। শূয়োরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হ'তো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এমনি মায়া-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখি নি। সেবায় যেন লক্ষ্মী। হয়ত পুরুষের চেয়ে অনেক দিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এমনি সামান্য ক'রে রাখে যে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন রাজরাণীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ জন্মে তার সংস্কার ঘোচে নি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হ'তো।

হরেন্দ্রও হাসিল, কহিল, কি করবো বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা ভাবি তাই বলে ফেলি; কিন্তু জিজ্ঞেসা করুন দিকি অজিতবাবুকে, এক্ষুণি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক, কিন্তু বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ, কি করেন হরেনবাবু! আপনার আশ্রম থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, একদিন, সে আমি জানি; কিন্তু ইতিমধ্যের দিন ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা হ'লে বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমটা ছাই তুলেই দাও না ভাই। তুমি বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচতে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই। অন্ততঃ অক্ষয়টা বেঁচে থাকতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ী রওনা ক'রে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখচি তোমরা তা হ'লে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিটকিরি হজম করা অসাধ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে ত মরলো না। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কই নে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে।

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জ্বালা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা নয় ত কি!

বেলা কহিল, সত্যই ত তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে একটি চমৎকার গল্প পড়েছি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েন নি?

কই, মনে ত হয় না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয় বলেছেন যে তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। ঐ ত সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েছে, এই বলিয়া সে বইখানা পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত—"একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম।"

বেলা কহিল, তার মানে? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেলেন নাকি?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারীদেহের ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের যে ছবি দিয়েছেন তা স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক।

অজিত কহিল, থাক; কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হ'লেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন—বেশ ত অজিত, বাদসাদ দিয়ে পড়ো না শুনি। জলও থামে নি, রাতও তেমন হয় নি।

অজিত কহিল, বাদসাদ দিয়েই পড়া চলে। গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুন না শুনি। অন্ততঃ সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভূমিকা

আছে, তা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যার আত্মকাহিনী, তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বড়ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিনা গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদিবা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে, সে যৌবনের প্রারম্ভে—সে বহুদিন পূর্ব্বে।

সেদিন তাঁকে ভালবেসেছিল অনেকে—একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা করে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেল বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলে না। দূর থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করে নি, জবাব পায়ও নি। তারপরে পনের বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠলো। ইতিমধ্যে যে পনের বছর কেটে গেছে—যাকে পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল, তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েছে এ ধারণাই যেন তার ছিল না। কুশল প্রশ্ন অনেক হ'লো, অভিযোগ অনুযোগও কম হ'লো না; কিন্তু সেদিন দেখা হ'লে যার চোখের কোণ দিয়ে আগুন ঠিকরে বার হ'তো, উন্মত্ত-কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ দ্বার ভেঙ্গে বাইরে আসতে চাইতো, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, এ যায় না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া অজিত বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন, না না, ইংরিজী নয়, ইংরিজী নয়। তোমার মুখ থেকে বাংলায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগল, তুমি এমনি করেই বাকিটুকু বলে যাও।

আমি পারবো কেন?

পারবে, পারবে। যেমন ক'রে বলে গেলে, তেমনি করেই বল।

অজিত কহিল, হরেনবাবুর মত আমার ভাষার জ্ঞান নেই; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা।—এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ী ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ একান্ত মনে চিরদিন এই প্রার্থনাই ক'রে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন, এই নিষ্ফল

প্রণয়ের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ-আশ্বাসে আর যেন না সে যন্ত্রণা পায়। দেখা গেল, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হ'লো না, তবু নিঃসন্দেহে বুঝা গেল সে ক্যানাডায় ফিরে যাক বা না যাক সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবে না, তাকেও দুঃখ দেবে না। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একেবারে উল্টো দিক থেকে। দুয়ের মধ্যে যে এত বড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবে নি। মানবের লোলুপ দৃষ্টি চিরদিন তাঁকে বিব্রত করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে; আজ ঠিক সেই দিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শরীর-ধর্ম্মবশে অবসিতপ্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তি আজ গতিরোধ ক'রে থাকে—অভিযোগের কি আছে? অথচ ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়—এসব অন্য কথা। বড় কথা; কিন্তু যা বড় নয়—যা রূপজ, যা অশুভ, অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—সেই কুৎসিতের জন্যও যে নারীর অভিজাত চিত্ততলে এত বড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্ম্মম অপমানে আহত করতে পারে, আজকের পূর্ব্বে সে তার কি জানতো?

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ ত বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন?

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

আশুবাবু বলিলেন, হ্যাঁ। তারপরে অজিত?

অজিত বলিতে লাগিল, মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে কেবল ঐ মানুষটিই ত নয়, বহু লোক বহুদিন ধরে তাকে ভালবেসেছে, প্রার্থনা করেছে, সেদিন তাঁর একটুখানি হাসিমুখের একটিমাত্র কথার জন্য তাদের আকুলতার শেষ ছিল না। প্রতিদিনের প্রতিপদক্ষেপেই যে তারা কোন্ মাটি ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো তার হিসেব মিলত না। তারাই বা আজ গেল কোথায়? কোথাও ত যায় নি, এখনো ত মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগড়ে? তার হাসির রূপ বদলে? এই ত সেদিন দশ-পনের বছর, কতদিনই বা, এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায় নি কিছুই অজিত, হয়ত শুধু গেছে তার যৌবন—তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক কথা। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জানলেন কি ক'রে?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তারপরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ী ফিরে শোবার ঘরের মস্ত বড় আরশীর সুমুখে আলো জেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোষাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম তার চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদলে গেল। এমন ক'রে ধাক্কা না খেলে হয়ত এখনো চোখে পড়তো না যে নারীর যা সবচেয়ে বড় সম্পদ—আপনি যাকে বলছিলেন তার মা হবার শক্তি—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চেতন দেহের ওপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় সে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু এত বড় ঐশ্বর্য্য যে এমন স্বল্পায়ু, এ বার্ত্তা পৌঁছল তার কাছে আজ শেষ বেলায়।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমনিই হয় অজিত, এমনিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তারপরে?

অজিত বলিল, তারপরে সেই আরশীর সুমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনান্ত দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। একদিন কি ছিল এবং আজ কি হ'তে বসেছে; কিন্তু সে বিবরণ আমি বলতেও পারবো না, পড়তেও পারবো না।

নীলিমা পূর্ব্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, না না না, অজিতবাবু ও থাক। ঐ জায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেছেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এর বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না, একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা বয়েস তাকে ত বিকৃতির বয়স বলা চলে না, নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ ওত কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসেব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এই কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুললে ত চলবে না।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটিই তিনি নিজে দিয়েছেন। বলেছেন—আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা ক'রে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটিমাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু ত উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো! ঐশ্বর্য্যের ভগ্নস্তূপ হয়ত আজও কোন দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেমনি মিথ্যে। যে রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয় নি' বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।"

আর কেহ কিছু কহিল না, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারী সুন্দর লাগলো, অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল; সে এই মন্তব্যে খুশী হইল না, কহিল, এ আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুলফুল হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছায় না। রমণীর দেহ কি এমনি তুচ্ছ জিনিষ যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজন নেই?

নীলিমা কহিল, নেই, এ কথা ত লেখিকা বলেন নি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেটে না, এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বলছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাকলে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্‌দিকে চেপেছে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাকলেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেন না মনে করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে বহুদূর চলে গেছে—তাইত সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এত দুরূহ। একে চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায় না বলেই ত তার মর্য্যাদা, আশুবাবু।

তাও বটে। গল্পের বাকীটা শুনি অজিত।

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবে না আশুবাবু, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না, হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ, আপনার এই অনির্দ্দিষ্ট ঢিলেঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে আমার সইবে না। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, রূপের বিচারে হারলে ত তোমার লজ্জা নেই হরেন।

না, সে শুনবো না।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভাল হরেন। পুনরায় একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আমার বহুকাল পূর্ব্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়েছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালবেসে ছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী; ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী, আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা করতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘটলো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, কনের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁর নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কথা কারও মনে উদয় হয় নি। এমনি তাঁর দেহের গঠন, এমনি মুখের সুকুমার শ্রী, এমনি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয় নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশী হ'তে পারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য্য! আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বইকি; কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্য্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না। এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমারই সমবয়সী—তখন বোধ করি আটাশ-উনত্রিশের বেশী ছিল না।

তারপরে?

আশুবাবু বলিলেন, তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক নিমিষেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেল। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধাসাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু পরিমাণও নড়ানো গেল না। এই বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারলো না।

ক্ষণকালই সকলে নীরব হইয়া রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হ'লে বোধ করি অসম্ভব হ'তো না?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও-রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয় না? তেমন পুরুষ কি সে দেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ

করি 'দুর্ভাগ্য' বিশেষণটা বিশেষ ক'রে সেই পুরুষদেরই স্মরণ ক'রে লিখেছেন; কিন্তু রাত্রি তো অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। অত ভালবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে না, এত বড় সত্য বস্তুটা কোথা দিয়ে এক নিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেছেন—একদিন যেদিন নারী ছিলুম! নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারেই কবে ঘটে, এর পূর্ব্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শান্তভাবে কহিল, আজ থাক। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ-কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অন্যদিন বলবো।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্ত থাক।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পরছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়ে—তাই বোধ হয় সকল দেশেরই মানুষে এদের—এই অবিবাহিত প্রৌঢ়া নারীদের—এড়িয়ে চলতে চায়, নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আশুবাবু, বলা উচিত —তোমাদের মত পতি-পুত্রহীনা দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এত বড় সঙ্কট যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায়, টেরও পান না।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যবতীদের ঈর্ষা করি নে আশুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌছয় নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে যারা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছে, তাদের পথের নির্দ্দেশ কোন্ দিকে, আমাকে বলে দিতে পারেন?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র করতে পারি নীলিমা, তার বেশী শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ ক'রে দিতে। সংসারে দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এসব আমিও জানি, কিন্তু এর মাঝে নারীর নিরবরুদ্ধ, কল্যাণময়, সত্যকার আনন্দ আছে কিনা, আজও আমি নিঃসংশয়ে জানি নে, নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল?

আশুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারি নে হরেন। তখন দিন দুই তিন হ'লো মনোরমা চলে গেছে, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ ক'রে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর ক'রে ডেকে কাছে বসালুম। আমার ব্যথার জায়গাটা সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলে না। কথায় কথায় এই ধরণের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়লো, তখন আর তার হুঁস রইলো না। তোমরা জানোই ত তাকে, প্রাচীন যা কিছু তার 'পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেলাই যেন তার Passion. মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলুম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি। ও-প্রবৃত্তি ত তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ও ত স্বভাব নয় —অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কাণাকড়ি বিশ্বাস করি নে, আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, তবু বললাম, হিন্দু-সভ্যতার মর্ম্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতুম যে, ত্যাগ ও বিসর্জ্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা এবং এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনে সর্ব্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি ক'রে গেছেন।

কমল হেসে বললে, করতে দেখেছেন? একটা নাম করুন ত? সে এ রকম প্রশ্ন করবে ভাবি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত সে মেনে নেবে। কেমনধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ। আপনি আমার নামটা ক'রে দিলেন না কেন? মনে পড়ে নি বুঝি?

কি কঠোর পরিহাস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেন না, কহিলেন, না, মনেই পড়ে নি সত্যি। চোখের সামনের জিনিষ যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায় —তেমনি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হ'তো কিন্তু সে যখন মনে এলো না, তখন কমল বললে, আমাকে যে শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনাদের নিজের সম্বন্ধেও কি তাই ষোল আনায় খাটে না? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ-বুলিই ত তারা সদর্পে আবৃত্তি ক'রে,—ভাবে এই বুঝি সত্যি। আপনারও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বললে, সহমরণের কথা ত আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরতো এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিতো, দুপক্ষের দম্ভই ত সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকতো যে, বৈধব্য-জীবনের এত বড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলুম না। কিন্তু সে অপেক্ষাও করলে না, নিজেই বললে, উত্তর ত নেই, দেবেন কি? একটু থেকে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, প্রায় সকল দেশেই এ আত্মোৎসর্গ কথাটার একটা বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে, নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য অবস্তু ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন ক'রে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নরনারী কারও জীবনেরই শ্রেয়ঃ আছে কিনা। সংস্কারবুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই—কিন্তু আর না, আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বললাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ ক'রে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েছে জগতের সে কল্যাণ করে নি।

কমল বললে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বললাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ কথা তিনি কখনো শেখান নি যে নিঃশেষে দান ক'রেই তবে মানুষে সত্য ক'রে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখবরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

কমল বললে, তিনি বলতেন, মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের, তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করবার দুর্ব্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখবরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ ত' ও নয়—ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে ডেকে আনা। অর্থহীন সৌখিন জিনিষের মত ও শুধু ছেলেখেলা; তার বড় নয়।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। বললুম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন, এবং জগতের যা কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করে নি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা, আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বললুম, তুমি যা বলছো, সত্যিই এ শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালবাসতে পারি নি শুনে তুমি বলেছিলে, এ চিত্তের অক্ষমতা, এমন অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলে না। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্মনিগ্রহ বলে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থ-ই সেদিন তুমি দেখতে পাও নি।

কমল বললে, আজও পাই নে আশুবাবু, সংযম যেখানে উদ্যত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান ক'রে আনে। ও ত' কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই ত সংযম—শক্তির স্পর্দ্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর এক ধরণের অসংযম, এ কথা কি কোন দিন ভেবে দেখেন নি আশুবাবু?

ভেবে দেখি নি সত্য। তাই চিরদিনের ভেবে আসা কথাটাই খপ্ ক'রে মনে পড়লো। বললুম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি! সেই ভোগের

ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস ক'রে ভোগ করতে চায়, ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা ত মেটে না—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে! তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও-পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেছেন, 'ন জাতু কামঃ কামনামুপ-ভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশি জ্বলে ওঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বলতে গেলেন কেন? তারপরে?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বললে, শাস্ত্রে ঐ রকম আছে নাকি? থাকবেই ত। তাঁরা জানতেন জ্ঞানের চর্চ্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্ম্মের সাধনায় ধর্ম্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যলোভ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকী—এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ ক্ষেত্রেও তাঁরা আক্ষেপ করে যান নি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার উপহাস ও বিদ্রূপে যেন হতবাক্ হয়ে গেলুম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হতে পারে না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা ক'রে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বললে, কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন ক'রে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে—আর না। এর আসল সত্তা ত বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।

বললুম, তা হ'তে পারে কিন্তু ও যে রিপু, ওকে ত মানুষের জয় করা চাই!

কমল বললে, কিন্তু রিপু বলে গাল দিলেই ত সে ছোট হয়ে যাবে না।

প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাদের কোন্ সত্তাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই ত দুঃখকে জয় করা নয়? অথচ ঐ ধরনের যুক্তির জোরেই মানুষ অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়। শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হ'লো ও বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হ'লো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মত কিছুই ত' তার নেই—কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য হ'লো কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না, শান্ত মুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু। দুঃখ যে পাই নি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিই নি। শিবনাথের দেবার যা ছিল তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েছি—আনন্দের সেই ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্তদাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলি নি, শুকনো ঝরণার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দুহাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকি নি। তাঁর ভালবাসার আয়ু যখন ফুরোলো, তাকে শান্ত মনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো ক'রে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হ'লো না। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাবলেন, এত বড় অপরাধ কমল মাপ করলে কি ক'রে? কিন্তু অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হ'লো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিল। হয়ত সত্যি, হয়ত আমার ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠলো—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু। বললুম, কমল, এমনি মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় আমারও আছে—সেই ত সাত রাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো ত?

কমল চুপ ক'রে চেয়ে রইলো। জিজ্ঞাসা করলুম, এ জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে কমল? এমনি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই ত বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতের আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বলবো, এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা ক'রেই কি সাঙ্গ ক'রে দেবো?

বললুম, রাত্রি ত কেবল একটি মাত্র নয়, কমল, প্রভাতের আলো শেষ ক'রে সে ত আবার ফিরে আসতে পারে?

সে বললে, আসুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন করবো।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম, কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্য দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেছে। দেখলাম, না না, তা নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র—আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্টও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুখের পথ রোধ করে না। ওরা অনাগত তাই—যা আজও এসে পৌঁছয় নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্ব্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য্য মেয়ে। সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলো না, কিন্তু এ কথাও ত মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারলাম না যে, এ ত' কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা শিখেছে একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেছে। কতটুকুই বা বয়েস, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়সেই সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে নিয়েছে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যই ত। জীবনটা সত্যি ত' আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এত বড় দান ত' সেজন্য আসে নি। আর একজন কেউ আর একজনের জীবনে বিফল হ'লো বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বলবো কি ক'রে?

বেলা আস্তে আস্তে বলিল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হ'লো, বৃষ্টিও কমেছে—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিল না—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোটখাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকী ছিল, কিন্তু আজ সে-সকল তেমনই অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল—অন্যমনস্কের মত সে নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়নকক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন নির্জ্জন; নিঃসঙ্গ গৃহের মাঝে আসিয়া তাহাদের কাছে ঝাপসা হইয়া গেল; অথচ পরমাশ্চর্য্য এই যে, কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যেদিন নারী ছিলাম!

চব্বিশ

দশ-বারো দিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অথচ আশু-বাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কমবেশী সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাধিল হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র ও অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এমনি শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে তাহাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইত না। অবশেষে তাহারাই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ, ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুনডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর-দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে; অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে,

তাহারই ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে, অপরাহ্ণে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সেও গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারো দিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য্য যে কি, ঠাহর করিতে পারিলেন না।

নীলিমা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজা না-ভেজার প্রশ্নই ওঠে না। খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙ্গাবার সমাজ নেই,—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেমনি অফুরন্ত। সেই রাজেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনের বা জানাশোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হ'লো না, ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তার নিজের কর্ত্তব্যে বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না, ও তাই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হ'লো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে, অথচ মেয়েদের কত কথাই ত' ভাবতে হয়।

আশুবাবু বলিলেন, ভাবাই ত' উচিত, নীলিমা ?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ওরকম বেপরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে ত' আমরাও পারি।

নীলিমা বলিল, না পারি নে। ইচ্ছে করলে আমিও পারি নে, আপনিও না, কারণ জগৎ-সংসার যে-কালি গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেকদিন থেকেই একথা ভেবে দেখেচি। পুরুষের তৈরী সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেচি—কত যে জ্বলেচি, সে জানাবার নয়—শুধু

জলুনিই সার হয়েছে; কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়ে নি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা ত' আজকাল নরনারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশী আর এক-পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ব-বিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল ক'রে মেলে না,—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখলেই দেখা যায়, এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুক্‌রে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে সে দশ-বারো দিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইলো না, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হ'লো না যে এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্য্যাদা হানি হয়। বলুন ত, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমার হ'লে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিতো কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্যি নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি করতো?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা করতো, রাঁধতো বাড়তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো, ছেলে হ'লে তাদের মানুষ করতো; বস্তুতঃ একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতো না।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজকর্ম্ম করবো না, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম ঘুরে বেড়াবো, এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার ত কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ এই ধরণের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাকতে ত' জানে না, তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্ম্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো—আনন্দের ধারার মতো সংসার তার উপর দিয়ে বয়ে যেতো, ও টেরও পেতো না। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেছে, আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি, কেউ একটা দিনও সে সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারতো না।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই বটে। তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্ণের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমাদের গাড়ী।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন সংবাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ খবর পাওয়া মাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলুম আমার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়েছেন। কে জানতো আমাকে আপনারা এতো ভালোবাসেন, তা হ'লে যাবার আগে নিশ্চয়ই একটা খবর দিয়ে যেতুম।—এই বলিয়া সে তাঁহার পরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেমনিই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলচি আমার দোষ হয়েচে, আমি ঘাট মানচি; কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেন না, তখন সে সত্যই ভারী আশ্চর্য্য হইল, এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-বচনে কহিল, আপনি আসবেন জানলে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতুম না, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারী হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী, নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, সত্যিই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবে না—তবে ভারী ক্ষুণ্ণ হবেন তারা। শুনেচি, আরও দু চারজনকে আহ্বান করেচেন। আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার।—এই বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েচে যে আজ ওর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা খুলে বলতে বাধতো। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বলতুম, না তুমি বলে ডাকতুম?

কমল কহিল, তুমি বলে; কিন্তু এমন নির্ব্বাসনে যাই নি যে এর মধ্যেই তা ভুলে গেলেন।

না ভুলি নি, শুধু একটু খট্‌কা বেধেছিল। বাজেবাজেই কথা। সে যাক্। সাত-আট দিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজছিলুম। আমরা কিন্তু ঠিক খোঁজা নয়, পাবার জন্য যেন মনে মনে তপস্যা করছিলুম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য্য তাহার মুখে নাই, তাই অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্ট একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু? আমি ত' সকলের পরিত্যক্ত, দিদি, ভদ্রসমাজের কেউ ত' আমাকে চায় না!

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয় ত' এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি ক'রে চেয়ে থাকে ত' এই নীলিমা। এতখানি ভালবাসা হয়ত' তুমি কারও কখনো পাও নি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্য নহে, এই ধরণের আলোচনার ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত; বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এমনিই ছিল তাহার

স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ ত', দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই আমিই ভার নিয়েছি বলবার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে,—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'রে দুজনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন, আগ্রায় এত লোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেন না কেন? জ্ঞানতঃ কোনদিন কোন অন্যায় করেন নি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বলতে পারেন নি এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেছেন। বোধ হয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পার।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে; হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর ত' এই, আর একটা?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যে-মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন এবং পরে দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এইমাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি

চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে আছে; কিন্তু আমাকে খুঁজছিলেন কেন? এর কোনটাই ত আমি ঠেকাতে পারি নে।

নীলিমা কহিল, অথচ, ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন; কিন্তু আমি তোমাকে খুঁজি নি ভাই, কায়মনে ভগবানকে ডাকছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙ্গলা-দেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবো না; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী দুটোই ত' খুইয়েছি, এর ওপর উপরি লোকসান যা ভাগ্যে ঘটেছে সে বিবরণ দিতে পারবো না,—এখন ভগ্নীপতির আশ্রয়টাও ঘুচল। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই, যে ক'টা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তারপরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাই নে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বলবো, না পাই মরবো! পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জ্জনার মত আর ঘাটে ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না।—বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ ব'লে।

নীলিমা বলিল, সে জানি; কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও, সেই ত' আমার ভয়।

কমল কহিল, হলুম বা অদৃশ্য; কিন্তু দরকার হ'লে আমাকে খুঁজতে যেতে হবে না দিদি, আমি পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এমনি ক'রে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন কি আমি করতে পারি?

তোমাকে কিছুই করতে হ'বে না কমল, যা করবার আমি নিজেই করবো।

আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্ত্তব্যে অপরাধ না করি। এ বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারি নে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারি নে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন; কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেন না কি ক'রে? মেয়ে ত আপনার বড় হয়েছে।

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেন না, কারণ অস্বীকার করার যো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশ পাক খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায় না! শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আশু বদ্যির দুর্ব্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে--সেটা লোকে ভুলেছে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু; কিন্তু তাও যদি না হয়, পরিচয়টা কি সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে।--এই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ একমাত্র সন্তান, কি ক'রে যে মানুষ করেছি, সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃহৃদয় সৃষ্টি করেছেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি তাঁকে পর্য্যন্ত উপহাস করবে। তা ছাড়া তুমি বুঝবেই বা কি ক'রে; কিন্তু পিতার স্নেহই ত শুধু নয় কমল, তার কর্ত্তব্যও ত' আছে? শিবনাথকে আমি চিনতে পেরেছি। তার সর্ব্বনেশে গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ে না। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দ্দকও আশা করে।

কিন্তু এ চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশীদিন থাকবে না, সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন, তা হ'লে?

তা হ'লে তারা ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, কিন্তু বিশ্বাস করবার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি স্থির করেছেন?

হাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ ক'রে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না?

কই, প্রশ্ন ত' কিছুই করেন নি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হ'লে যে শক্তিমান, সে দুর্ব্বলকে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এতে বলবার কি আছে?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিল না, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল? সন্তানের সঙ্গে পিতার ত' শক্তিপরীক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্ব্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি? কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে, তবুও যে এত বড় কঠোর সঙ্কল্প করেচি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই ত'? সত্যিই কি এ তুমি বুঝতে পারো নি?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেচি; কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে; কিন্তু দুঃখ নিবারণ করতে পারলেন না বলে কি রাগ ক'রে তার দুঃখের বোঝা সহস্র গুণে বাড়িয়ে দেবেন?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে-লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেচেন, তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় ক'রে বিসর্জ্জন দেবেন, ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেন না?

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁহার মুখে আসিল না—শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পর তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ ক'রে যে-ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখতে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়! বরঞ্চ আমি কামনা করি, ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেন না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এমনি করেই মানুষে আপনাকে শোধরাতে শোধরাতে আজ মানুষ

হতে পেরেছে। ভুলকে ত' ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকে পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেকছে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়ে না। কোন উপায় কি তুমি বলে দিতে পারো না?

আমি? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল এবং ইহাই স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধকণ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্ত্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, না, এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবো না। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কিনা জানি নে, যদি পায় তখন এই কথাই বলবো যে খাইয়ে পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজের বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেন নি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি আজ দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হন্তারক হতে যাব কিসের জন্য?

কথাটা আশুবাবুর ভাল লাগিল না, কহিলেন, তুমি কি তা হ'লে বলতে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়?

কমল কহিল, অন্ততঃ ভয় দেখিয়ে নয় এইটুকু বলতে পারি। আমি আপনার মেয়ে হ'লে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ-জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে এইভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এই দিকেই দেখতে পেয়েছিলেন; কিন্তু আমি পাই নে। তবু আমিও পিতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালবাসা দিতে পারে না—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এ ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের অন্ত থাকবে না; কিন্তু তখন তাকে বাঁচাবে কিসে?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাবনা ছিল, কিন্তু সে-ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে, তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষা করবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এসব কথার মারপ্যাচ কমল, যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় করেই পেতে হবে, ওকালতির জোরে তার থেকে অব্যাহতি মিলবে না।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করি নি, আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে কিন্তু লজ্জা নেই—মণি কাউকে ঠকাতে যায় নি, ভুল ভেঙ্গে সে যদি ফিরে আসে তাকে মাথা হেঁট করে আসতে হবে না, এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবুও ভরসা পাই নে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙ্গবেই, কিন্তু তার পরেও যে তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে, তখন সে থাকবে কি নিয়ে? বাঁচবে কোন্ অবলম্বনে?

অমন কথা আপনি বলবেন না। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হ'তো, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলে, নইলে আমিই বা আজ বেঁচে থাকতুম কি ক'রে? বরঞ্চ আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, ভুল যদি ভাঙে তখন যেন সে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত ক'রে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশী বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার দেখতে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্ত্তব্য?

আমি মা হ'লে মেনেই নিতুম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতুম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন করতুম না। মনে মনে বলতুম, এ-জীবনে যে রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েছে, সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বড়, বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলুম না কমল! শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ-বাড়ীতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে ত যথার্থ ভালবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ; এ মিথ্যে যেমন ক'রে হোক নিবারণ করাই পিতার কর্ত্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতিগত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারেই সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিত-বোধ, সেই ভালমন্দ সুখদুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনিয়ার ডাকা। অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিত, তথাপি আজিও হয়ত তাহার মূল, অন্তরে শিথিল হয় নাই—সংসারে ইহার তুলনা বিরল, এ সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন জাতীয়।

ইহার ভালমন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্ব্বিঘ্নে শান্তি ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কাটিয়াছে, তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধচিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে, এমনি দুর্ল্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছেন, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুল বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন্ স্পর্দ্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগ্যের হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সবকিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিণাম চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ বিবাহে সম্মান

নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার 'পরে ইহার ভিত্তি, এই স্বল্পকালব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই রহিবে না—হয় ত সবই সত্য কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে বস্তু বাকি থাকিবে সে যে পিতার শান্তি, সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড়, এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একবার ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত তড়িৎরেখাও হয়ত পিতার অনির্ব্বাপিত দীপশিখার দীপ্তির পরিমাপ অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেমনি বসিয়া আছে; বেশ বুঝা গেল এ লইয়া সে আর বাদানুবাদ করিতে চাহে না। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া; কিন্তু এমন করিয়া একজন মৌনাবলম্বন করিলে ত অপরের মনে শান্তি মানে না। বস্তুতঃ এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাহার, মুখে যাই কেননা বলুন, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্দ্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা। কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত, ভদ্রসমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটে না, অথচ এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই সঙ্কোচ ঘুচে না।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপীয়ান, তবু কখনো সে-দেশে যাও নি; কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক কিছু চোখে দেখেছি। অনেক ভালবাসার বিবাহ-উৎসবে যখন ডাক পড়েছে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে-বিবাহ যখন অনাদরে উপেক্ষায় অনাচারে অত্যাচারে ভেঙ্গেছে তখনও চোখ মুছেছি। তুমি গেলেও ঠিক এমনি দেখতে পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখতে পাই আশুবাবু। ভাঙ্গার নজীর সে-দেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠছে, ওঠবারই কথা, এও যেমন সত্যি

ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝতে যাওয়াও তেমনি ভুল। ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয়, আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না; বলিলেন, সে যাক, কিন্তু আমার এই দেশটার পানে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি। যে প্রথা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে তার সৃষ্টিকর্ত্তাদের দূরদর্শিতা? এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের 'পরে নেই, আছে বাপ-মা-গুরুজনদের 'পরে। তাই বিচারবুদ্ধি এখানে আকুল-অসংযমে ঘুলিয়ে ওঠে না, একটা শান্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি ত মঙ্গলের হিসেব করতে বসে নি আশুবাবু, সে চেয়েছে ভালবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানে না; কিন্তু তর্ক ক'রে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্যক্ত করচি; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্য্যের প্রত্যূষের আবির্ভাব দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান; কিন্তু সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাকলে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌঁছুবে না। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই, এখন করিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝতে পারি নি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করছি যে, ঘরের অন্যান্য জানালাগুলো খুলে দেওয়া চাই। এ ত চোখের দোষ নয়,—দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে, যে-দিকটা খোলা আছে সেদিকে দাঁড়িয়ে আমরণ চেয়ে থাকলেও এ ছাড়া কোন কিছুই কোনদিন চোখে পড়বে না।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না কমল, আর একটুখানি বসো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই,—অবিশ্রাম বুকের ভেতরটা যে কি করছে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝতে পারি। তুমি কি যথার্থই বলচ আমি চুপ ক'রে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকে, আমি তো কুশ্রী বলতে পারি নে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশোবার বোঝাতে চাচ্ছি কমল, এ মোহ, এ ভালবাসা নয়—এ ভুল তার ভাঙবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙ্গে তা নয় আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙ্গে পড়ে। তাই অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও-দেশের এত দুর্নাম, এত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার মামলা।

শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বলো কমল, তাই বলো। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখে এসেছি।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ দেশের বিবাহ-প্রথা? তাকে তুমি কি বলো? সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙ্গে না, কমল?

কমল কহিল, ভাঙ্গবার কথাও নয়, আশুবাবু। সে ত অনভিজ্ঞ-যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়—চোখ চেয়ে, পাকা লোকের যাচাই-বাছাই করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ না থাকলে তাতে সহজে ফাটল ধরে না। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারি মজবুত—সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইল না।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙ্গে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?

কমল বলিল, যে স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু তার বেশী ওঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকু মাত্র দিয়েই বিদায় করেছে, আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করতে পারি, দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে বুঝি সব

গেল। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়ে যা হাতে থাকে, মাণিকের মতো তা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে,—বলে, ঐ ত সর্ব্বনাশ।

নীলিমা কহিল, বলার হেতু আছে কমল। মণি-মাণিক্য সকলের জন্য নয়, সাধারণের জন্য নয়। আপাদমস্তক সোনা-রূপার গয়না না পেলে যাদের মন ওঠে না, তারা তোমার ঐ এক ফোঁটা হীরে-মাণিক্যের কদর বুঝবে না। যাদের অনেক চাই তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার, অনেক আয়োজন, অনেক জায়গা দিয়েই তবে জিনিষের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে স্বর্য্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে কমল, এ আলোচনা বন্ধ থাক।

আশুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই না হয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেন না। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভ-বুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারে না। ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি নাও হতে পারে। স্ত্রীর দুশ্চরিত্র স্বামী পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক, বেলার পক্ষে স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই, আমি জোর ক'রে বলতে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই, স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক ক'রে তার ঠিকানা মেলে না।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, স্বর্য্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে যাওয়াটাও এমনি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হ'তো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠতো না,—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়ি নি, জ্ঞানবুদ্ধি কম, তর্ক ক'রে তোমাকে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিষটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা

ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস,—কাড়াকাড়ি ক'রে এদের পাওয়া যায় না—অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণধী কমল এক নিমেষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, এ সকল নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে নীলিমার এলোমেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্য্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ জিজ্ঞাসা বৃথা—আরক্ত আভায় আকাশের যে দিকটা আজ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক-নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখব, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এভাবে অবজ্ঞা ক'রো না। বহু বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেছে, মিথ্যে দিয়ে কখনো এতো লোককে ভোলানো যায় না।

কমল অন্যমনস্কের মতো একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয়, দিদি। একদিন যারা বলেছিল নরনারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিলো সবচেয়ে বেশী, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয় নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং এই অসত্যের 'পরেই ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হ'লো না।

কিন্তু এ কথা আমাকে কেন বল কমল ?

কারণ, আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে চাটু-বাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিলো মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিলো।

জীবনে যে-কোন অবস্থাই অস্বীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেন না। এই আমার শেষ অনুরোধ; কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বই কি কমল; কিন্তু সে ত মনিবের ফরমাশ মত কাটাছাঁটা মানান করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরার মধ্যে দিয়ে বয়। তাই বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা বলে দিচ্ছি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেন না, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরাজীতে Emancipation বলে একটা কথা আছে; আপনি ত জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়া তারও একটা অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলেমেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরী করে নি, করেছিল আপনাদের মত যাঁরা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন-দড়ি আগলা ক'রে যাঁরা আপন কন্যা-সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যান্‌সিপেশনের জন্য যত কোঁদলই মেয়েরা করি না কেন, দেবার আসল মালিক যে পুরুষেরা—আমরা মেয়েরা নই, জগৎ-ব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলি নে, আশুবাবু। আমার নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সেদিন মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদল ক'রে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জ্জন করে নি। এমনি হয়। বিশ্বে এমনিই হয়; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্ব্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব ত তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে।

মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে ত সন্তানের মুক্তি থাকে না, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেন না। এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্য্যাদার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

যে লোকটি ইহার পিতা তাঁহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইঁহারই উদ্দেশে দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মতো বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্ব্বকালের মতো বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন এবং কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

পঁচিশ

শীতের সূর্য্য অস্ত গেল। সায়াহ্ন-ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপ্সা হইয়াছে। একটা জরুরী সেলাইয়ের বাকীটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্ব্বেই সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধুমহলে জানাজানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা সুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এমনিই একটা কিছু যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে, তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

তাহার পর হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া অবশেষে এমন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলে না।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল, যেন মাথা তুলিবার সময়টুকু নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে, স্থিরতা নাই, অতএব অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইল, বলিল, আশ্চর্য্য এই যে শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়ল না।

কমল মুখ তুলিল না, কিন্তু ঘাড নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ তুমি এতই সাদাসিধে যে কোন সন্দেহ কর নি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে ?

কেউ কি পারে না পারে জানি নে, কিন্তু আপনিও কি পারবেন না ?

অজিত বলিল, হয়ত পারি, কিন্তু সে তোমার মুখের পানে চেয়ে, এমনি পারি নে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা হ'লে চেয়ে দেখুন, বলুন পারেন কিনা।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জলিয়া উঠিল ; কহিল, তোমার কথাই সত্যি, তাকে অবিশ্বাস কর নি বলেই তার ফল দাঁড়াল এই।

দাঁড়িয়েছে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণে হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পরে অজিত সংলগ্ন অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনের অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বলতে জানো না ?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালবাসে, ওটা ওদের স্বভাব।

তা হ'লে সে স্বভাবের প্রশংসা করতে পারি নে। স্পষ্ট বলতে একটু শেখো, নইলে সংসারের কাজ চলে না।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে ও-পক্ষের অসুবিধেও এমনি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুকরিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশী, বক্তা হ'লে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হ'লে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর নাট্যকার হ'লে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা প্রকাশ পেলে না, হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালবাসলে যে কি ক'রে সেইটা শুধু জানি নে; কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জেলে আনি।—এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং তাদের হ'য়ে কৈফিয়ৎ দিতে পারব না, কিন্তু তারা ভালবাসলে কি করে, জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটে না—স্পষ্ট, পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্ত্তমানে অন্যের খাওয়া-পরায় কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্যে বাড়িওয়ালার শরণাপন্ন না হ'তে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ, তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট মজবুত ক'রে গড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত রাখে না। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনুরোধ আসিল, আমরা ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর; কিন্তু আমরা কারা?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটি-দিন মাত্র দেখেছ, তবু আশা করি তাকে ভোল নি?

কমল হাসিমুখে কহিল, না। শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা সাদা, আজ হয়েছে হল্‌দে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণা মাত্র, আর কিছু না। ও ৺কাশীধাম থেকে সদ্য-প্রত্যাগত, ঘণ্টা-দুয়ের বেশি নয়। ক্লান্ত, তদুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়; তথাপি আমি আসছি শুনে ও

আবেগ সম্বরণ করতে পারলে না। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য্য, আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্ব্বাহ্নেই সমুপস্থিত। যাক, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি ত ভাঙচে কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠল বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, বসো এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে দ্বিধা করিতেছিল। হরেন্দ্র ইহা বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও সহাস্যে কহিল, বসো হে সতীশ, জাত যাবে না। কাশী-ফেরৎ যত উঁচুতেই উঠে থাকো তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে, এ কথাটা ভুলো না।

না, সেজন্য নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজে না, হরেন্দ্রবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মোহন্ত মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়সেও ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও খাট। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা। সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহন্ত ও মহারাজ হচ্ছেন দুই বন্ধু—সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমতো আমাকে না-মেনে চলা। একজনের ত পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশি তত্ত্ব-সঞ্চয় ক'রে; ভয় হচ্ছে ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠবো না। এখন ভাবনা কেবল ওই অর্দ্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকেও ফিরিয়ে এনেছে। ইতিমধ্যে আচার-নিষ্ঠার যে লেশমাত্র ত্রুটি ঘটে নি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেছি, শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ী-ভাড়াটা আমার আর লাগতো না।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা? আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি একটা নাম আছে—সতীশ জানতেও পারে, কিন্তু আধুনিককালের আঁকা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেছো? দেখ নি? তা হ'লে ঠিকটি উপলব্ধি করতে

পারবে না। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার ত' হঠাৎ মনে হয়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকছে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙ্গে গেলে তারা না খেয়ে মারা যাবে না, দেশের কোন একটা কলাভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্ছেন, এ কি সত্যি?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য বস্তুটিকে তুমি চিনতেই পারো না। সেইটি তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে কিনা সে তুমিই জান, কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, আমি যাই করি না কেন ওদের ভয় নেই। কারণ চতুর্ব্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সংবাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই; কিন্তু ভারতের সত্য বস্তুটি আমাকে বুঝিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলি নি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুলতেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ করবো না। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি?

সতীশ বিনীতকণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবে না; কিন্তু তর্কের জন্য নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটাকয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবো না?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত, সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিল না, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাসা ক'রে বললেন, আমি কাশী-ফেরৎ যতো উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওর শ্রদ্ধার অবধি নেই—আশ্রম ভাঙ্গলে ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙ্গে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভাল করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাকলে আমাদের বন্ধুত্ব হ'তে পারতো না। তার মতো ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির মধ্য দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য। এই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে আমরা গড়ে তুলতে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্পকাল বৈকুণ্ঠ-বাসের লোভ আমাদের নেই; কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া ত কখনও সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় না। আর শুধু ছেলেরাই ত নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেছি। কষ্ট ওখানে আছে—থাকবেই ত'। বহু শ্রম ক'রে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই ত আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের ত' কিছু নেই।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হো'ক না কেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো না, কারণ সেটা ব্যক্তিগত হ'য়ে পড়ার ভয় আছে; কিন্তু ভারতীয় আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে, এ ত অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম এ সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম্ম নয়; জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ-যুগেও সে উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্জ্বলিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি-জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল; সে প্রয়োজন আজও বিলুপ্ত হ'য়ে যায় নি, এ সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাঁহার মৃদুকণ্ঠ সতেজ ও উদ্দীপনায় তাঁর কালো মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেই দিকে নিঃশব্দে ও নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক্, আশ্রমের বিগত-গৌরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেনদা,

আমরা মরেছি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্য দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম-লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙ্গতে চাচ্ছেন, কিন্তু ভাঙ্গাটাই কি বড়ো? গড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশী বড়ো নয়? আপনিই বলুন?

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে?

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখি নি এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয় নেই।

তবে?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমের শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তুলাভের ব্যাপারটা যে আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করছেন!

তাহার ক্রুদ্ধ মুখের চেহারা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করছেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব! স্বভাব বললেই ত কৈফিয়ৎ হয় না হরেনদা! ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার, তাকেই এতে অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা করা হয়। একে ত' উপেক্ষা করা চলে না।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ওঁর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দাম নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্ম্মে, কিন্তু তা'কে ভাল হ'তে হয় নিজের গুণে। শুধুমাত্র প্রাচীন ব'লে সে পূজ্য হয়ে ওঠে না। যে বর্ব্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো, আজও যদি সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করতে চায় তাকে ত ঠেকান যায় না সতীশ!

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়দের সঙ্গে ত বর্ব্বরদের তুলনা হয় না, হরেনদা।

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি; কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবি নি, হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জানো আমি নাস্তিক নই; কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করা যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্ব্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করি নি, হরেনদা। আপনি ত' জানেন, আপনাকে কতো ভক্তি করি আমরা; কিন্তু কষ্ট পাই, যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে উপাদান, যে সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি, বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয় নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখতে পাই, সে-ই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম্ম, সে-ই আমাদের আপন জিনিষ। এই ধ্বংসোম্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, নাও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই রকম কথার উত্তরে কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল; তাই দিয়ে সে পৃথিবী জয় ক'রে বেড়িয়েছিল—সেদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান; কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিলে তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যা উপাদান হ'য়ে তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে সংসার থেকে মুছে দিলে। এতটুকু দ্বিধা করলে না। সে অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্ন-তাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত? তাতে তত্ত্ব নিরূপণের সত্য ছিল না?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না-থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ-দোরে এনে হাজির ক'রে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাই নে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেনদা, এ সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল; আর কিছুই নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়; কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিক কালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, আমি লজ্জার কারণ দেখি নে সতীশ।

সতীশ বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ স্তব্ধভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার, সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি, হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের ত' জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্ত্য নীতি ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু; বলিল, সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হ'তো না যে ভাবের জন্য, বিশেষত্বের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার সমাদর, মানুষের জন্যই তার দাম। মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হ'লো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় ত হবে? তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নরনারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন ত' নবীন তুর্কির দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরা-গত পুরানো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিন তার হয়েছে বারম্বার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে, তার সমস্ত আবর্জ্জনা ভেসে গেছে, আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তাকে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিল, তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে বিগত-গৌরব আবার আজকের দিনেও সে ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করে নি তারও বিবর্ত্তন আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠলো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরও হবে। সতীশবাবু, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি ; কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে, এও ত' না হতে পারে ? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এও ত' সম্ভব ?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস, হবেও।

তবে ?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু, মন্দ ত' ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু, তার চেয়ে যে আরও ভাল—সে। সেই আরও ভাল যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে, সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হুন, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারে নি, তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট ; কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকী রয়ে গেল, ফরাসী ইংরেজ এসে পড়লো বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয় নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে প্রশ্ন থাক, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এমনি ক'রে বলতে থাকলেই হবে সর্ব্বনাশ।—এই বলিয়া হরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙ্গলায়—সে বেশীদিন নয়, বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে ক'রে সত্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট জনকয়েক, অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিজাতীয় স্পর্দ্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকেই তুচ্ছ ক'রে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত, কদাচারী ক'রে তুলেছিল ; কিন্তু এত বড় অকল্যাণ বিধাতার সইল না। প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়লো। সেই বিষম দুর্দ্দিনে মনস্বী যাঁরা, স্বজাতির কেন্দ্রবিমুখ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে, স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁরা শুধু বাঙ্গলা দেশেরই নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য।—এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানেন। সুতরাং হরেন্দ্র অজিত উভয়েই

তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে যখন নমস্কার জানাইল তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে খুব বেশী লোকে হয়ত সে সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যই সেটা হ'তে পারে নি, কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ চুপ করিয়াই আছে। হয়ত জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিল না। অজিতকে সে চিনিত, কিন্তু হরেন্দ্র যখন ইহারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকাল পূর্ব্বের কথাগুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জুড়িয়া এমনি বিসদৃশ শুনাইল যে সে নীরব থাকিতে পারিল না। কহিল, হরেনবাবু, এক ধরনের লোক আছে যারা ভূত মানে না কিন্তু ভূতের ভয় করে। আপনি তাই এবং একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। এমন অন্যায় আর কিছু হ'তেই পারে না। এ দেশের আশ্রমের জন্য কখনো টাকার অভাব হবে না এবং ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবে না; অতএব আপনি ছাড়াও সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া কহিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি, সে খোঁজ তিনিও করেন নি, আমিও করি নি। তাঁর প্রয়োজন ছিল না, আমার মনেও ছিল না। কামনা করি ধর্ম্মকে যেন আমরা এমনি ভুলেই থাকতে পারি; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী বলে' এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন এবং নমস্য বলে' যাঁদের নমস্কার করলেন, স্বদেশের সর্ব্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারী, এ প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুলবে না।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখনও শুনেছেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা হ'লে সেইটে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা; কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ বলে' আমি ভাবতে পারি নে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া, ত্বরিত-পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভাণ করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানেই হয় মানুষদের ভুল। ওর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়িতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো বলে' বাতিল ক'রে দিতে ওর ব্যথা নেই; কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এই কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

কমল কহিল, পারি, শুধু দান নেবার বেলাতেই একটার বদলে অন্যটা নিতে পারি নে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেছি। ও-শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা, আমার সন্দেহ জন্মেছে; কিন্তু দীনহীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘরছাড়া ক'রে এনেছে তাদের দিয়ে যে কি ক'রব আমি তাই ভেবে পাই নে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও ত তাদের পারব না।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই; এদের দিয়ে অসাধারণ, অলৌকিক কিছু একটা ক'রে তুলতেও চাইবেন না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন ক'রে তাদের বড় ক'রে তোলে তেমনি ক'রেই এদের মানুষ ক'রে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃশংশয় হ'তে পারি নি কমল! মাষ্টার পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয়ত পারব, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল, তার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ওদের মানুষ করা যাবে কিনা সেই আমার ভয়।

কমল কহিল, হরেনবাবু, সকল জিনিষকেই অমন একান্ত ক'রে আপনারা ভাবেন ব'লেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পান না। সন্দেহ আসে হয় ওরা দেবতা গড়ে উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল অসংযত পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সামনে থাকে না। পরায়ত্ত, মনগড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত, মলিন

ক'রে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা দেখে এসেছি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েছে কি? পেয়েছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েছে অনধিকার, পেয়েছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়। পুরুষেরাও তাকে বলে সুন্দর, সে আমার সয়, কিন্তু মেয়েদের সেই নিজেদের পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্য্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয় তখন আশা করার কিছু থাকে না। আপনারা নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবারা কেমন আছ বল ত? ছেলেরা একবাক্যে বললে, খুব ভাল আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে, এমনি শাসন। নীলিমাদিদি আমার পানে চেয়ে বোধ করি এর উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক চাপড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ কথার জবাব খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতে এরাই আনবে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে!

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক, কিন্তু রাজেন, সতীশ এরা ত যুবক; এরাও ত সর্ব্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেন না, সুতরাং সেও যাক; কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই ত বেশী পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ ক'রো না কমল, কিন্তু তোমার রক্তে ত বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা ইয়ুরোপীয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশুজীবন গ'ড়ে উঠেছে। মা এ দেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভাল। দেহে রূপ ছাড়া বোধ হয় সেদিক থেকে কিছুই পাও নি। তাই, পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় বলে' জেনেছ।

কমল কহিল, রাগ করি নি হরেনবাবু; কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেন না। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় ক'রে নিয়ে কোন জাত কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেল, ভোগও ছু'টল। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম ত আর জগৎ ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা ক'রে কারও বাঁচবার জো নেই।—এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বলবার দিন পাবেন—কেমন! বলেছিলাম ত! দিন-কয়েকের

নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জানতাম; কিন্তু চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি।—বলিতে বলিতে সুবিমল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেই দিনই যেন আসে!

কমল কহিল, অমন কথা বলতে নেই হরেনবাবু। অত বড় জাত যদি মাথা নীচু ক'রে পড়ে, তার ধুলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দ্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরী আছে, কিন্তু নিজে দুর্দ্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিবু-নিবু হয়ে আসচে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখো নি। আচ্ছা চললাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি-উঠি করিল, কিন্তু উঠিল না।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না প'ড়ে চোখের ওপর প'ড়লে খানায় প'ড়তে হয়। সে আলো যে নেবায়, তাকে বন্ধু বলে জানবেন।

হরেন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময়ে মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার নেই, তবু বলিতে পারি, যত্ত বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক, ভারতের কাছে সে সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাশে প্রমোশন না-পাওয়া ছেলের এম. এ. পাশ করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্মমর্য্যাদাবোধ ব'লে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা ব'লেও তেমনি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে; কিন্তু এই ভারতই এক-দিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্ব্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াত। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতে সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার ক'রবে। ক'রবেই ক'রবে।

কমল রাগ করিল না, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে; কিন্তু কোন্ মহা-অতীতে একজনের পূর্ব্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল এবং কোন মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে—এ আলোচনায় সুখ পেতে হ'লে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার। আজ আসি।—বলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

আট-দশ দিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাঁহাদের জীবনের এই কয়দিনে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। অথচ, আকস্মিক নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল। ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিল না, ঘটিলও তাই।

ফটকের দরওয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ কেহ বসিত না, তথাপি, খানকয়েক চৌকি, মেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙ্গান ছিল, আজ সেগুলা অন্তর্হিত। শুধু ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখান লণ্ঠনটা এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, সেগুলি পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিল না। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্ণের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিল না, পর্দ্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই; একটু বেশী মাত্রায় খুশি হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, কমল যে! এসো মা, এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল—এ কি! আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন—বুড়ো? সে ত ভগবানের আশীর্ব্বাদ কমল। ভেতরে ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও ত ভাল দেখাচ্ছে না?

না; কিন্তু আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছো, কমল?

ভাল আছি। আমার ত কখনো অসুখ করে না কাকাবাবু।

তা জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ তোমার লোভ নেই। কিছুই চাও না ব'লে ভগবান দুহাতে ঢেলে দেন।

আমাকে দিতে কি দেখলেন বলুন ত?

আশুবাবু কহিলেন, এ ত ডেপুটির আদালত নয় মা, যে ধমক দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি যে দুনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাই নি। তাইত আজ সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ্দ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, শূন্যের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে রেখেচে—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েছে, ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোক শুধু ভুল ক'রেই ভাবে মা, গণিতশাস্ত্রের নির্দ্দেশে শূন্যের দাম আছে। আমি ত দেখি কিছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটি হয়, শূন্যের সংখ্যাগুলো ভীড় করার জোরে শূন্য কোটী হয়ে ওঠে না। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিল না, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান-হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই ত যাবার সময় হ'ল, কাল-পরশু যে চললাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাবতে ভরসা পাই নে; কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুলবে না।

কমল কহিল, না। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য ঠেকেচে ব'লে, আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখি নি কাকাবাবু, তারা সত্যি সত্যিই পদার্থ—মায়া নয়!

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েছে তা বাড়িতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবে না। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়। এবার একটুখানি দূরে যাব কল্পনা করেছি। পুরানো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা ক'রে যাব। এখানে তোমারও ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্ব্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে, কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবে না। এই অকর্ম্মণ্য দেহটার দাম ত ভারী, এটাকে ব'য়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াব না; কিন্তু কে জানত কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন ক'রেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এত বড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাবতে পেরেছে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাদিদিকে দেখচি নে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন, কাল সকাল থেকেই আর দেখতে পাই নি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তাঁর বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার-পাঁচজন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয় নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন ক'রে গড়ে তুলবে এই তার কল্পনা। তুমি শোন নি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুনবে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যেবেলায় ভদ্রলোকেরা চ'লে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ ক'রে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড় একটা দেখাও পাই নে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্ম্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্রই সম্পূর্ণ ক'রে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম, হয়ত এই আমার শেষ উইল, এটর্নিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের

জন্য এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল। নীলিমা কি একটা সেলাই ক'রছিল, ভালমন্দ কোন সাড়া পাই নে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। কি যে হ'ল হঠাৎ ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল চোখ-মুখে ঝাপটা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম, চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশী নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে ব'সল, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠলো, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো। সে কি কান্না! মনে হ'ল বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম, কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে প'ড়ল—আমার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্ত্ত নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই-তিন। এ অবস্থায় তাকে কি ব'লব আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মতো উঠে দাঁড়ালো, একবার চাইলেও না, ঘর থেকে বা'র হ'য়ে গেল। না বললে সে একটা কথা, না বললাম আমি। তারপরে আর দেখা হয় নি।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ আপনি আগে বুঝতে পারেন নি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবি নি। আর কেউ হ'লে সন্দেহ হ'ত এ শুধু ছলনা, শুধু স্বার্থ; কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চয্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণ দেহ, এই অক্ষম, অবসন্ন চিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায় জীবনের দাম যার কাণাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এত বড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয়।—এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে, বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না। ও শুধু

চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকী দিন ক'টা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা!

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ-বিচ্ছেদের যখন মামলা আনে, আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিল। তারপর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। নিজের স্বামীকে এমনি ক'রে সর্ব্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ ক'রে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলে না। ও বলে, তাঁকে ত্যাগ করাটাই ত বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্য্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও কষ্টি-পাথর, ওতে যাচাই ক'রেই ভালবাসার মূল্য ধার্য্য হয়। আর এ কেমনতর আত্মসম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেছি, তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলো না? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়, এ বাড়াবাড়ি; কিন্তু আজ ভাবি, ভালবাসায় পারে না কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ। ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্মমর্য্যাদা-বোধের টাগ-ওব-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, তুমিই ওর আদর্শ, কিন্তু চাঁদের আলো যেন সূর্য্যকিরণকে ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যে কত দিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দুটো দিনে আমি দুশো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি, কমল! স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালবাসার যে কেবল একটিমাত্র দিক, এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত বাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জ্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কিন্তু কি বলে' যে একে আজ নমস্কার জানাব আমি ভেবেই পাই নে, মা।

কমল বুঝিল, পত্নীপ্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে-সকল দিক আঁধার করিয়াছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভাল কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অনুমতি দিতে পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্ব্বাদটুকু রেখে যাব, দুঃখের মধ্য দিয়ে সে যেন আপনাকে একদিন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি-ভালবাসা—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন।—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমাদিদির সম্বন্ধে কি স্থির ক'রলেন?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখ মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারি নি, এখনো পারব না। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই; কিন্তু কখনও এ সংশয় আসে নি যে, একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালবাসাকে সন্দেহ করি নি, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আবার তেমনি সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আত্মপ্রবঞ্চনা বলতে পারব না। এ তর্কে মিলবে না, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্য দিয়েই মানুষ এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানি নে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এত বড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে, সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকী দিনগুলোকে শূলের মত বিঁধবে। ভাবি সে আর যদি কাউকে ভালবাসত। এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল সংশোধনের দিন ত আর শেষ হয়ে যায় নি, কাকাবাবু।

কি রকম? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে কর?

অন্ততঃ অসম্ভব ত নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘটতে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে করেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মতো মেয়ে?

কমল কহিল, তা জানি নে; কিন্তু যাকে পেলে না, পাওয়া যাবে না, তাকেই স্মরণ ক'রে সারাজীবন ব্যর্থ-নিরাশায় কাটুক, এই কি তার জন্য আপনি প্রার্থনা করেন?

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রার্থনা করি নে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবে না কমল! আমি যা পারি, তুমি তা পার না। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে' জেনেছে, তাদের উপেক্ষা করা চলে না, তৃষ্ণার শেষবিন্দু জল এ জীবনেই তাদের নিঃশেষে পান ক'রে না নিলেই নয়, কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত—উপুড় হয়ে শুয়ে থাবার প্রয়োজন হয় না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ কথা মানি কাকাবাবু; কিন্তু তাই বলে ত আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারব না। আকাশকুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তর-কাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে, শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এমনি করেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে' ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে। নীলিমাদিদির দেখা পাব কিনা জানি নে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাব।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—যাচ্চ মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হ'লেই বুকের ভিতরটা যে হাহাকার ক'রে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, কিন্তু আপনাকে ত আমি কোন দিক থেকেই

ভরসা দিতে পারি নে। দেহ-মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসি নে, কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া নীলিমা, এই কি সহজ বিস্ময়! কিন্তু এর কারণ জান কমল?

কমল স্মিতমুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই তাই। চোরাবালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারে না, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়; কিন্তু নিরেট মাটি লোহা পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার ওপরেই চলে। নীলিমাদিদিকে সব মেয়েতে বুঝবে না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায় তারা ওকে বুঝবে।

হুঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাকে সত্যি ক'রে বুঝেছি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে—জ্বালা নিবেছে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাঁধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই ত তাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে চেয়েছিলাম—মেয়েরা শুধু উপলক্ষ, নইলে ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দুভাগ ক'রে নিয়ে চলে ওদের দুদিনের লীলা, তারপরে সেটা ফুরোয় ব'লেই, গলার সুর ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে, নইলে বাজত না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেত। আমি ত জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায় নি, মণি আপনি ভুলেছে। সূর্য্যাস্ত-বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে, কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়; কিন্তু তাই বলে' তাকে মিথ্যে বলবে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলে না মা, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি বল ত?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাইত' ঘুরে ঘুরে একটা প্রশ্নই বারে বারে আসচে কাকাবাবু, শেষ আর হচ্চে না, বরঞ্চ যাবার

সময় আপনার ওই আশীর্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্য দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারের অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশী নয়, ওটাকেই নারীর সর্ব্বস্ব বলে' যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই সুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি; দেশান্তরে যাবার পূর্ব্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌঠাকরুণকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু; উনি প্রস্তুত হয়েছেন, আমি গাড়ীতে আনতে পাঠিয়েছি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি? কিন্তু বেলা ত নেই?

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট-পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাঁহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা বটে; কিন্তু সন্ধ্যে হয়, আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন।

উনি লিখেছেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পার আমাকে জানিও; কিন্তু কাল ব'লো না যে আমাকে জানান নি কেন? —নীলিমা।"

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট আত্মীয় বলে' আমি দাবী করতে পারি নে, কিন্তু ওকে ত আপনি জানেন, এই চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয় না।

তোমার বাসাতেই ত থাকবেন?

হাঁ, অন্ততঃ এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ বাড়ীতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে ও-বাড়ীতেও দোষ হবে না।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ কথা বলিলেন না যে, এতকাল এ

সুযুক্তি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেমসাহেবের জিনিষ-পত্রের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাও গে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ বাড়ী থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ওর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেছি, কমল। বেলার স্বামী এসেছেন নিতে, বোধ হয় ওদের একটা reconcilation হ'ল।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেন না যে?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্মগরিমায় বাধল। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামলা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারে নি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হচ্চ কেন, কমল? চরিত্র-দোষে যে-স্বামী অপরাধী, তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখি নে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই—এমন কথা আমি মানতে পারি নে।

কমল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির একসুরে বাঁধা, এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিল না, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কমল তেমনি ভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না। যাইবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ বাড়ীতে পুরানো কেউ আর রইল না।

যদু?

হ্যাঁ, আপনার পুরানো চাকর।

কিন্তু সে ত নেই মা। তাঁর ছেলেব অসুখ, দিন-পাঁচেক হ'ল ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রাজেন ছেলেটির কোন খবর জান, কমল?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাইবোন, যেন একই গাছের দুটি ফুল।—এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকাকড়ি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ অপরিমিত, কোথায় যেন অন্যমনস্কে সে-সব ফেলে এসেচ। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই, এমনি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু! রাজেনের কথা জানি নে, কিন্তু আমি দু-পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুনতে পাই। তাই, বসে বসে ভাবি।

সেদিন বাসায় ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকে নি, আজও সে ছেড়ে থাকবে না। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই।—এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল সহজে উপরে যাইবার যো নাই, রাশিকৃত বাক্স-তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়; বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল, পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে; উঁকি মারিয়া দেখিল, অজিত হিন্দুস্থানী মেয়েলোকটির সাহায্যে ষ্টোভে জল চড়াইয়াছে এবং চা-চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দ্দিক আঁতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, চা-চিনি কি তুমি লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখ নাকি? জলটা ফুটে ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এল।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরী ক'রে দিচ্চি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাক্স-তোরঙ্গ পোঁটলা-পুঁটুলি এ সব কার?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েছে। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতেই দিন কেটেছে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বের করেছি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন; কিন্তু ওগুলো কি নীচেই পড়ে থাকবে? চুরি যাবে যে!

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, যায় নি ত, একটা চামড়ার বাক্সে অনেক-গুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভাল। একজাতের মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরেও সাবালক হয় না। তাদের মাথার উপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভগবান কৃপা ক'রে করেন। চা থাক্, নীচে আসুন। ধরাধরি ক'রে তোলবার চেষ্টা করা যাক।

সাতাশ

বাড়ীওয়ালা এইমাত্র পুরা-মাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজি-চেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত, মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধাছাদা জিনিষগুলোর ফর্দ্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই, যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশী নীরব।

সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রের নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায় উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা—কমল, নিশ্চয় এসো ভাই। —নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, যাবে নাকি?

যাব বইকি। নিমন্ত্রণ জিনিষটা তুচ্ছ ক'রতে পারি আমার এত দর নয়; কিন্তু তুমি?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা তেমন—তবে কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনও চিঠির 'পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক, বাঙালী-মহলে খবরটা জানাজানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু কি ভাবে ও কোথায়, এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ জানা কঠিন ছিলো না—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত তাহাদের গম্যস্থানটা আপাততঃ অমৃতসর; কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙ্গালো-বাড়ী তৈরী করিয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ীটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে; এই বাড়ীতেই দুজনে কিছুকাল বাস করিবে। মালপত্র যাইবে লরিতে এবং পরে শেষরাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রর ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি?

যাই না। আশ্রমের দোর ত তোমার খোলাই রইল, যবে খুসি দেখা করে যেতে পারবে; কিন্তু আমার ত সে আশা নেই, শেষ দেখা দেখে আসি গে, কি বল?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেথায় নানাছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইসারায় আজ শুধু একটিমাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, ইহার সম্মুখে একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মত কাপুরুষতা আর কিছু হইতেই পারে না; কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ী কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রর বাসায় দ্বিতলে সেই হল-ঘরটায় নূতন দামী কার্পেট বিছাইয়া

অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেকগুলো, কোলাহলও কম হইতেছে না। মাঝখানে আশুবাবু ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জনকয়েক ভদ্র-লোক। বেলা আসিয়াছেন এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল এবং ঘরে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল একদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময়ে কলস্বরে সংবর্দ্ধনা করিল, কমল যে? কখন এলে? অজিত কই?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল যে ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিত না। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেন নি, শরীরটা ভাল নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।

অনেক? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। দেখছিলাম, ধর্ম্মকে তো ফাঁকি দিলেন, কর্ম্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কিনা!—এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বন্যলতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই, যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বসিল, কতটুকুই বা! তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিষেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রর কথায়। আর দুটি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগভরে বলিয়া ফেলিল, এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হ'লো। কমল ছাড়া ঠিক এমনি কথাটি আর কেউ বলতে পারতো না।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শনশাস্ত্রের কোন্ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এতে পরিস্ফুট হ'লো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিনতে পার ত?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হ'লো। চিনতে তুমি পারছ ত অক্ষয়?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওঁর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিল না, কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিল না, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই সহর থেকে, হয়ত বা এদেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্ছেন; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্ত্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েছ বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটা আর নেই। রাজেন্দ্র আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে ক'টি ছেলে বর্ত্তমানে আছে, হরেন্দ্রর অভিলাষ জগতের সোজা পথেই তাঁদের মানুষ করে তোলেন। তোমরা সকলে অনেকদিন অনেক কথাই বলেছ, কিছু ফল হয় নি। তোমাদের কর্ত্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফলল বুঝি

ওঁর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই নি। এইটি অনেক পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল; করবেনই ত। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আমার মনে হয় ভাঙ্গবার প্রয়োজন ছিল না। সকল ধর্ম্মমতই ত মূলতঃ এক, সিদ্ধিলাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন ক'রে চলা। যারা মানে না বা পারে না, তারা নাই পারল, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ ক'রেই বা লাভ কি? কি বল অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার ত এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হ'লো না আশুবাবু, বরঞ্চ হ'লো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন ক'রে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতাম না; কিন্তু তা নয়, আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্ম্মের চেয়েও বড়—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্ম্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা যেন হ'লো, কিন্তু তাই বলে কি তোমার উপমাকেই যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল যে পরিহাস করে নাই তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশী নয়? সকল ধর্ম্মই যে আসলে এক, এ আমি জানি। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ও সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধন। মুঠোর মধ্যে ওকে তে পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল ক'রে বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া চলে। তাইত জীবনের প্রয়োজনও ঢের বড সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ ত সবাই জানে, কিন্তু তাই বলে কি মানতে পারে? আপনিই বলুন না অক্ষয়বাবু, ঠিক কিনা। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল, ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না।

আশুবাবু বলিলেন, অথচ তোমারই যে কমল, সকল আচার অনুষ্ঠানেই ভারী অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না? তাইত তোমাকে বোঝা এত শক্ত।

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সামনের পর্দ্দাটা সরিয়ে দিন, আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝতে বিলম্ব হবে না। নইলে আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি ক'রে? মাঝখানে কুয়াসার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু ত পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাই নে, চাই শুধু এর পরিবর্ত্তন। কালের ধর্ম্মে আজ যা অচল, আঘাত ক'রে তাকে সচল করতে চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি বলেই ত। মিথ্যে বলে জানলে, মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, মিথ্যে শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারাজীবন মেনে মেনেই চলতুম—একটুকুও বিদ্রোহ করতুম না।

একটু থামিয়া কহিল, ইয়ুরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে ক'রে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচার-অনুষ্ঠানে। পুরানোর গায়ে টাট্‌কা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার পূজো, ভেতরে গেল না শেকড়, সখের ফ্যাশান গেল দুদিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এমনি ক'রেই ফাঁকা হ'য়ে; কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সামলেছেন।—এই বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিল না, গম্ভীর হইয়া কহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিকমত আজও সায় পায় না, মনের মধ্যটা রহিয়া রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুস্কিল এই যে, তুমি ভগবান মান না, মুক্তিতেও বিশ্বাস কর না; কিন্তু যারা তোমার এই অজ্ঞেয় বস্তু সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেললেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করি নে। সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেল, আমি নিজের দুর্ব্বলতাই অনুভব করেছি।

তা হ'লে ভাল করেন নি হরেনবাবু। বাবা বলতেন, যাদের ভগবান যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশী জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যে লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট ক'রে আনলেও লাভ হয় না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে।

হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে যুগে ফিরে যাওয়া। ভাবতেন, ত্নিয়ার বয়স থেকে হাজার-দুই বছর মুছে ফেললেই আসবে পরম লাভ। এমনি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলাতের পিউরিটান একদল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুচিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুলবে বাইবেলের সত্যযুগ। তাদের লাভের হিসাবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানে না শুধু মঠধারীর দল যে, বিগত দিনের দর্শন দিয়ে চলে যখন বর্ত্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙ্গার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেচি কিন্তু ভাঙ্গা-আশ্রমে বাকী রইলেন যাঁরা, তাঁদের ক্ষতি করি নি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়, ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল, এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে যুগের ইতিহাসের যে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল, যত উজ্জ্বল হোক তবু সে ছবি, তার বড় নয়; এমন বই সংসারে আজও লেখা হয় নি আশুবাবু, যার থেকে, তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনার গর্ব্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগেও না। রামায়ণ মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃজঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়া যাবে না। পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি নিয়েই ত মানুষ? তারা যে আপনার চারিদিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বায়ুর চাপকে ঠেকান যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি তাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখোমুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারি নে, তাকেও অবজ্ঞা করি নে। এই গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, শুনেছি, একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল; কিন্তু আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোষাক; মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বললেন, খাবার তৈরী হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বৈকি হে। বল গে, রাতও হ'ল।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌঠাকরুণ আসা পর্য্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয় না, ওঁর ত কোথাও জায়গা ছিল না, কিন্তু সতীশ রাগ ক'রে চলে গেল।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ সতীশেরও অন্য উপায় ছিল না। সে ত্যাগী ব্রহ্মচারী—এ সম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন; কিন্তু আমারই যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভাল হ'ল সব সময়ে ভেবে পাই নে।

কমল অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হ'য়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্ব্বহ। এই বলিয়া সে পলকের জন্য আশুবাবুর প্রতি চাহিল, হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু হরেনকে পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকেই সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পূজো বারে বারেই ঘাড় হেঁট ক'রে আত্মপূজোয় নেমে আসে। এ ছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ ত শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়, এ দু'য়ে মিলিয়ে তবে সে এক। এই অর্দ্ধেককে বাদ দিয়ে যখনই দেখি সে নিজেকে বৃহৎ ক'রে পেতে চায়, তখন দেখি সে আপনাকে পায় না, ভগবানকে খোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্য দুশ্চিন্তা রাখবেন না হরেনবাবু, ওদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিত না, তাই শেষের কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল—আত্মদর্শন। অর্থাৎ আপনাকে নিগূঢ় ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা, সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মান না, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে না রাখলে তারা একাগ্র চিত্ত-যোজনায় সফল হয় না। সতীশকে আমি ধরি নে কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার কমল।

এই ত যোগ। আসমুদ্র-হিমাচল ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ব্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দুচিত্ত নির্ব্বাত-দীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। সঙ্কোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত, সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা; কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়। তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না আশুবাবু, সত্যি নয়। শুধু ত হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্ম্মেই আছে; কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই ত কোন কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যুবরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাদের জিদের জোরকেই তা' সপ্রমাণ করেছে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করে নি। যোগ কাকে বলে আমি জানি নে, কিন্তু এ যদি নির্জ্জনে বসে কেবল আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মচিন্তাই হয় ত এই কথাই জোর ক'রে ব'লব যে এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথা দিয়েও নয়। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্ব্বার আসিয়া জানাইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে। সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

আঠাশ

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত্তে নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্ছেন। পরিচিত সকলের বাড়ীতেই আপনি এক-আধ বার গেছেন, শুধু আমার ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে নয়; 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করে না, অভিমান-ও করে না; কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়া মনে করিত। কমল ইহা জানিত; কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃকপাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তাহার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি ত কখনো যেতে বলেন নি?

না। সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবে না?

কি ক'রে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্ছি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদলাল কি ক'রে? বরঞ্চ আরও ত কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ তাই হ'ত বটে; কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ বুঝলেন কিনা জানি নে—না বোঝাও আশ্চর্য্যি নয়—কিন্তু আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামে প্রায় চৌদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা ত সেই দেড় হাজার বছরের পুরানো সত্যেই আজও দৃঢ় হ'য়ে আছে; সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান, কিছুরই ত ব্যত্যয় হয় নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানি নে! জানবার

কখনো সুযোগও হয় নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় ত কেবল এইটুকু বলতে পারি যে ওঁদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে কোন একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মানতে হবে; কিন্তু উপরে চলুন।

না, আমি এখান থেকেই বিদায় নেব। আমার স্ত্রী পীড়িত। এতো লোককে দেখেছেন, একেবারে তাকে দেখবেন না?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানি নে। আমাদের পরিবারে ও-প্রশ্ন কেউ করে না। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখাপড়া শেখবার সময় পায় নি, দরকারও হয় নি। রাঁধাবাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে আছে, আমাকেই ইহকাল পরকালের দেবতা ব'লে জানে, অসুখ হ'লে ওষুধ খেতে চায় না, বলে স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে বুঝবে স্ত্রীর আয়ু শেষ হয়েছে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রর কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি ত ভাগ্যবান, অন্ততঃ স্ত্রী-ভাগ্যে! এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই, ঠিক জানি নে। হয়ত একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে; কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ, একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, একটা অনুরোধ ক'রব?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন, এই সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাবব। আচ্ছা চললাম, নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভালমন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে, এই সেই অক্ষয় এবং মানুষের জানার বাহিরে এই ভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্বিঘ্ন-শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে। একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা!

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপস্থিত। ইহাই নীলিমার স্বভাব, বিশেষ কেহ কিছু মনে করে না। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি ব'লে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বলছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষ বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখে না। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিরোধের সৃষ্টি।

কমল বুঝিল ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিল না যে উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়। দুর্ব্বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাইবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষ-বেলায় তার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে কহিলেন, কিছু মনে ক'রো না মা, এ-ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও ত ওই দলের লোক! সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রের সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন, কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্য্যা। তাই সার্কেলের মাথা। ইংরাজী বলা-কওয়া, চলাফেরা, বেশভূষায় আপ-টু-ডেট। এটুকু ভুললে যে ওদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ ত করি নি।

আশুবাবু বলিলেন, ক'রবে না তা জানি। রাগ আমাদেরও হ'ল না, শুধু হাসি পেল; কিন্তু বাসায় যাবে কি ক'রে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাব?

বাঃ, নইলে যাব কি ক'রে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে; কিন্তু আর দেরী করাও হয়ত উচিত হবে না, কি বল?

সকলেরই স্মরণ হইল যে তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে, দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল, হ্যালো! বেটার লেট দ্যান্ নেভার। এ কি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলো সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে ত আর দেখা হ'ত না। আমরা আজ ভোর রাত্রেই দুজনে চলে যাচ্চি।

আজই? এই ভোরে?

হাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে সুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁর গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হ'ত আমি দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ জিনিষ আমি চাই নি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বার বার বলেছি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা-কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত ক'রে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয় নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব্বসমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্বত্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে ত আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জান? তা হ'লে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র ক'রে বাড়ী গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মরার কবর তৈরী হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখব, কমল? কই সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাব অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান ত মানি নে, হলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই কমল। ঐ একই কথা মা। এই আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার দাম বেশী।

সে ঠিক কথা মা; কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল যাবে না।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে ত আস নি, নীচে চল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এমনি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসে নি আর কমল এখানে বসে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল—যা ও কখনো করে না।

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এই শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিল না,

কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিষটা পেলে, কমল তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপিচুপি জবাব দিল, পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না; কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই বিধান।

দ্বারের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলো না যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিল না।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসব, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাবঃ জীবনের কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেন না। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এই রূপে সে দেখা দেয়, তাকে আর কিছুতেই চেনা যায় না। আর যাই কেন না কর দিদি, অবিনাশবাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজী হ'য়ো না।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়ীতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি, কমল। অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষা ক'রো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার। ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেচি যে ভালবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস; তার জীবন; তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলব না। আমার ক্ষোভের নিঃশ্বাসে তোমাদের বিদায় ক্ষণটিকে মলিন ক'রে দেব না; কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল, শুধু দু-চারজনের জন্যই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি,

তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বৈষ্ণবদের দিন পর্য্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম্ম, কাকাবাবু।

ধর্ম্ম! তোমার ধর্ম্ম?

কমল কহিল, হাঁ। যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে সেই মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি ক'রেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই ত মানুষের মুক্তির পথ। দেখতে পান না কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলাল, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনিই জলচে? তেমনি ক'রেই ছাই ছাই ক'রে আনচে? এ নিববে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, কমল, মণির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারি নি—তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্ব্বলতা, কি জানি সে কি, কিন্তু এ মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানি সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন। আচ্ছা আসি। বাসদেও, চল।

টেলিগ্রাফ-পিয়ন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরী তার। হরেন্দ্র গাড়ীর আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম আসিয়াছে মথুরা জেলার এক ছোট সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ—গ্রামের এক ঠাকুরবাড়ীতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহু-লোকপূজিত বিগ্রহমূর্ত্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন মূর্ত্তিটাকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। দুই তিন দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোক কীর্ত্তনাদি সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সংবাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ এবং অনাবিল জ্যোৎস্না রাত্রি সকলের চক্ষেই এক মুহূর্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দুদিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলে না?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করে নি। কিছু করতে পারা ত যেত না, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে চায় নি।

আশুবাবু যুক্তহাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করে নি। শুধুই দেশ—এই ভারতবর্ষটা। তবু, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! [illegible] যাই কর, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত ক'রো না। বাসদেও, চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশী বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল; বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি ক'রেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত গিয়া সকলের বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন এবং শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ-নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন, চল।

শেষ প্রশ্ন

॥ এক ॥

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা শহরে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ-বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ-বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াহুড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় নির্বিঘ্ন জীবন। বাদশাহী আমলের কেল্লা ও ইমারত দেখা ইঁহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙ্গা ও আ-ভাঙ্গা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে, এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া যমুনার এপার হইতে, ওপার হইতে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার যত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙরাইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোকে কবে কি বলিয়াচে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে সুমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়ঘর ছিল, কোন্ জাঠসর্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে,—সে কালির দাগ কত প্রাচীন,—কোন্ দস্যু কত হীরা মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত,—কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই।

এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মসাফিরের দল যায় আসে, অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন ফেরত বৈষ্ণবদের পর্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজ দিন শেষ হয়, এমনি সময়ে একজন প্রৌঢ়বয়সী ভদ্র বাঙালী সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা, সুরূপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে শহরের এক প্রান্তে মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা, বাবুর্চি, দরোয়ান আসিল; ঝি-চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ি ঘোড়া, মোটর শোফার, সহিস, কোচয়ানে এতকালের এত বড় ফাঁকা বাড়ির সমস্ত অন্ধ্র রন্ধ্র যেন যাদুবিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক। কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি-বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত

সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। মনোরমা বাড়ির ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পর করিয়া না রাখেন। এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ি এবং মোটর যখন-তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনাগোনা করিয়া মেয়ে ও পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন, গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনে হৃদ্যতা এমনি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক এ কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ-খানেকের অধিক সময় লাগিল না। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সংকোচ এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। ইঁহারা হিন্দু অথবা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয় না। তবে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়া যতটা বুঝা যায় সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছিল যে ইঁহারা যে সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ বাচ-বিচার করিয়া চলেন না। বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ, যে সমাজেরই অন্তর্গত হউন, বহুবিধ সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ মুখয্যে কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আব বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর-দশেকের একটি ছেলে; অবিনাশ কলেজে পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা সচ্ছল,—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর দুই পূর্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জ্বর ছাড়িল, কিন্তু ভগিনীপতি ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহে তিনিই কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর সংসার দেখেন, বন্ধুরা, সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ, হাসে, —বলে, ভাই. বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ করো না,—কপাল! নইলে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে, সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের, নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেণ্টিং মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এইদিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস-পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোকসমাগম ঘটে। আজ কি-একটা পর্বোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,

জন-দুই নীচের ঢালা বিছানার উপর দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন-দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকী সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটামাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্নমেণ্টের প্রতি রাইচ্যস ইনডিগনেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমন সময় মস্ত একটা ভারী মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতে সকলেই সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচাস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন জল খাইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে পড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? এই বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বদ্যির অসময়? এতবড় দুর্নাম যে আমার ছোটখুড়োও দিতে পারেন না অবিনাশবাবু?

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বলচ বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক ছোটখুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি। কিন্তু, এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাকরুনের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বলব মশাই, বাতে পঙ্গু! নইলে, যে পায়ের ধুলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধুলো ঝাঁট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখতে হত অবিনাশ বাবু। কিন্তু আজ আর বসবার জো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশু বাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্যন্ত টেনে এনেছি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেছি,—সপরিবারে যেতে হবে। তার পরে একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে হবে না।

আরও একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস, মেয়েদের জন্য না হোক, আমাদের পুরুষদের জন্য দুরকম খাবার ব্যবস্থাই,—অর্থাৎ কিনা,—প্রেজুডিস যদি না থাকে ত —বুঝলেন না?

বুঝিলেন সকলেই এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন সকলেই যে তাঁহাদের প্রেজুডিস নাই।

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, না থাকবারই কথা! মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলো না। প্রত্যেক

বাড়িতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশে নিয়ে বাসায় ফিরতে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার শখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে। মাছ-মাংস, পিঁয়াজ-রসুনও ত স্পর্শ করেও না।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস খান না?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজীর ভারী অনিচ্ছে, সে হলো আবার সন্ন্যাসী-গোছের মানুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি-সমস্ত বলে যাচ্ছ বাবা!

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন এবং কন্যার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিল না।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিল না এবং আরও দুই-চারি মিনিট যাহা ইঁহারা বসিয়া রহিলেন, আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল। এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্খিত বিষন্নতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবু পুত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত; নিজে সে আজও অনূঢ়া— আয়োতির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ, এই সন্ন্যাসী-গোছের বাবাজী যেই হউন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ, তাঁহার নিষেধ নহে কেবলমাত্র অনিচ্ছার চাপেই এতবড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস রসুন-পিঁয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে।

এবং লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্ত-মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল। এবং এই আগন্তুক পরিবারের সহিত মিলামিশার যে সবুজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতেই আরম্ভ করিয়াছিল অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

।। দুই ।।

মনে হইয়াছিল আশুবাবু শহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা শুধু তাহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসর-মহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন; বাড়ির মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্বেই আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন-দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁসফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলী! মোস্ট ওয়েলকাম!

ওস্তাদজীদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না যেন! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেছি, মশাই, আবিষ্কার করেছি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা নয়,—সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। এই বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহে এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে—যে কি বিস্ময়ের বস্তু তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক লাগে! বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতিনমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এমনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক। কৈ আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিলেন, পাননি বুঝি? আশ্চর্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, বুঝতে পারিনি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হউক, ইঁহারা যে পূর্বে হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী, ব্যক্তিটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু, রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কেবলমাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ-প্রকৃতি অবিনাশ পর্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইল না, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ির সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গানবাজনা শুরু হইতে পারিতেছে না।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ-ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল, —বিশেষত্ব বর্জিত মামুলি ব্যাপার, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্রপরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্য সত্যই একেবারে অপূর্ব শোনাইল। শুধু তাহার অতুলনীয় অনবদ্য কণ্ঠস্বর নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহাতে পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই সর্বাঙ্গীন তান-লয়-পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল, তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমীর খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যায়সা কভি নহি শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতেই গান-বাজনার চর্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু, সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যেটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টনটন করিতে থাকে তাহা সে জানিত না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন করিতে স মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেছি। তুলনাই হয় না। এই বছর-খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিটলি ইমপ্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হঁা।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাচ্চা লোক বলিয়া বন্ধুমহলে খ্যাতি আছে। গানবাজনা ভাল লাগাটা তাঁহার মতে চিত্তের দুর্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ম দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে শহরের আবহাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শান্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইঁহাদেরও ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল ; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টিই লেগে থাক, এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ গানের প্রাণ থাকা-না থাকার সুনির্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় আর কাহারও ছিল না। গুণমুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখে ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন ! কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল, মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সহর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন, এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান-মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর-মহল। ক্রমশঃ তাহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্য আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক আহারের রুচি ছিল না, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুণ্ডলা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং মাত্র দুই-তিনদিনের আলাপেই কি করিয়া সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিবর্তন হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে আমার কানের। ওঁর গলার অস্ফুট, সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক ? বলিনি যে, মণি, এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা ?

কন্যা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু,—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক না অক্ষয়। থাক না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার-কয়েক মাথা নাড়িলেন, কহিলেন, না অবিনাশবাবু, চাপলে চলবে না। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্তব্য জ্ঞান করি। উনি—

আহা হা,—কর কি অক্ষয়! কর্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে, হবে এখন এখন আর একদিন। এই বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সংকোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই নাকি? কিন্তু তার কি স্থান-কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ শহরে যদি আর না আসতেন, যদি ভদ্র পরিবারে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং আজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, It is too much.

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, No it is not.

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা হা—করচ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রায় উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি করে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্যে।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন,—মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এই সকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, মিছে কথাই ত কারণ, প্রফেসরি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের অর্থাৎ, আপনাদেরই ইচ্ছেয় ছাড়তে হতো। আর তাই ত হলো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্যে।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সে-ই কখনো-না-কখনো মাতাল হয়। যে হয় না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাসতে পারেন, কিন্তু এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন, এ অপবাদ ত আমি দিইনি। আমাকে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করবার জন্যে, আপনারা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এ সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা হলে আশা করি আরও একটা সত্য এমনিই স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না জানিনে। তবে, এ জানি, অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেমনি বিপুল। কি স্বীকার করতে হবে আদেশ করুন!

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেছেন। সত্য কি না?

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন,—আপনি কি-সব বলছেন অক্ষয়বাবু? একি কখনো হয়, না হতে পারে?

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আশুবাবু। তাঁকে ত্যাগ করে আমি আবার বিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চললো, —মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট! তাতে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে দাঁত পড়ে চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এই জন্যেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হলো।

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—অ্যাঁ। শুধু এই জন্যে? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না, মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্মল সত্যবাদিতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ-লোকসান চুলোয় যাক, একবার মিথ্যে করেই বল যে, সে গভীর অপরাধ করেছিল, তাই তাকে ত্যাগ করেছ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বে না।

শিবনাথ রাগ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এরকম অযথা কথা আমি বলতে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু ?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিল না ; শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই ত জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে, অসুখ ত অপরাধ নয় শিবনাথবাবু ? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন ? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেন না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হলো কোথায় ?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধহয় বাপ-মা নেই।

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝি-র বিধবা মেয়ে।

বাড়ির ঝি-র মেয়ে ? চমৎকার! কি জাত ?

ঠিক জানিনে। তাঁতি-টাঁতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয় ?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্যে। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারী হইয়া রহিল। কৌতূহল ও উত্তেজনাবশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা হলে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহই হলো ?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না—বিবাহ হলো শৈব মতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশদিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ ?

শিবনাথ সহাস্যে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশবাবু। নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁকি ছিল না, ফাঁক যথেষ্টই ছিল। সেটা বার করবার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিলেন না, সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল ! এ কি হইল !

মিনিট দুই-তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে,—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক এমনি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক, যাক, যাক,—যাক এ সবকথা। শিবনাথ, তা হলে সেই পাথরের কারবারটা করচ? না?

শিবনাথ বলিল, হ্যাঁ।

তোমার বন্ধুর নাবালক ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হল? তাদের মা আছেন, না! অবস্থা কেমন? তেমন ভাল নয় বোধ হয়?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা! হঠাৎ মারা গেলেন, আমরা ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে! অকৃত্রিম সুহৃব!

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমারই এতখানি সে-সময়ে তিনি করতে পেরেছিলেন! একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক, শিবনাথ এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে একটা অংশের দাবী করলে না কেন? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিল না, কহিল, অংশ কিসের? করবার ত একলা আমার।

প্রফেসরের দল যেন অকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি-রকম শিবনাথবাবু?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বৈ কি।

অক্ষয় বলিলেন, কখ্খনো না। আমরা সবাই জানি যোগীনবাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন? কোন ডকুমেণ্ট ছিল? শুনেছিলেন?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল নাকি?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রি আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বেশ হয়েচে। তা হলে শেষ পর্যন্ত বিধবাদের কিছুই দিতে হল না।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপটা খাসা রেঁধেচ হে! আর দু-একটা আন ত?

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কৈ আপনারা ত কিছুই খাচ্চেন না?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চলে যাচ্ছেন?

মনোরমা এ কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; ঘৃণায় তাহার সর্ব দেহ কাঁটা দিয়া উঠিল।

।। তিন ।।

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহকাল গত হইয়াছে। দিন-দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে কোন সময়েই পুনরায় শুরু হইয়া যাইতে পারে, এমনি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটা রকমের একটা বালাপোশ গায়ে দিয়া আরামকেদারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মেয়ে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাও নি, আজ যে আমাদের এতবারী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল মা, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—

তা হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি! কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে। তুই না হয় একটুখানি ঘুরে আয় গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিকপত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল।

আচ্ছা, চললাম। কিন্তু ফিরতে আমার দেরি হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনব তা বলে যাচ্চি, এই বলিয়া সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ি ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা? শেষ হল? কি লিখেচে?

কিন্তু, কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

মনোরমা উত্তর দিল না, শুধু নমস্কারের পরিবর্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা? কেমন লাগল?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা হলে আমি নিয়ে যাই, পড়ে এখ্খুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। এই বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড়-ছাতা, হাত-মুখ ধোয়া পড়িয়া রহিল, কাগজখানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন গল্প, কে লিখিয়াছে কিংবা কেমন লিখিয়াছে।

এইভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই; এই সময়ে চাকরটাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে?

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন গেল?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশী নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুসলধারায় বারি-পতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জান এ-সব আমি ভালবাসিনে। এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি-সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ কি আমি বলচি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথবাবুর মত একজন দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্ছ?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপাকার করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাববশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেইদিকে চক্ষু নির্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সংবাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল।

শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলাম না আশুবাবু। এখন তা হলে চললাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে?

শিবনাথ কহিল, তা হোক। ও বেশী নয়। এই বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সেজন্যে আপনি লজ্জিত হবেন না। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে বলেন নি। অত নির্দয় আপনি কিছুতে নন।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি যেন একটা মতলব

নিয়ে এ-বাড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়,—এও আর একটা কথা। কিন্তু কথা যাই হোক, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিল না, আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশী দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধুলো দেবেন, আমি খুশীই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেন না! আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল, এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরি করে দেব বাবা?

আশুবাবু বললেন চা, আমার জন্যে নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি, ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী মেয়েদের মত কাপড়-পরা,—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে-বাবুটি এইমাত্র গেলেন তিনিই কি না? কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল, মেয়েটি শিবনাথের সেই স্ত্রী নহে ত?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথবাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানালে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা বটে মণি, কিন্তু, আমার ভয় হচ্ছে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ-বাড়িতে সঙ্গে আনতে পারেন নি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল, এ-বাটীতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না,

কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু, ওঁদের দুজনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন কে ডাকচে, আমার নাম করো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি, কাজটা হয়ত ঠিক হল না।

কেন বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক,—তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। ঝি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা-কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু করব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিল না। বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে, আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্ছিনে।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চিনে। তোমার যাঁরা সমশ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জান। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দোষ, কিন্তু এ হল—কি জান মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

মনোরমা বুঝিল, এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ মা? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছে, শিবনাথ যেন না আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আসচেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন—বেশ যা হোক শিবনাথবাবু, ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল,—তা আমার চেয়ে ইনিই ভিজেছেন ঢের বেশী। এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইঁহারাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা-

কাপড় ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জলধারা গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয়ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত না-ই হউক, পতি-পত্নী সম্বন্ধের পবিত্রতা ইহাদের মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতে তেমনি নশ্বর এই দুটি নরনারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! আর পরমাশ্চর্য এই, যে দেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যে, দেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সংবাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্তকালের অধিক সময় লাগিল না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড়-জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সমবয়সী এবং সিক্তবস্ত্র পরিবর্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। রূপ ইহার যত বড়ই হউক, শিক্ষাসংস্কারহীন নীচজাতীয়া এই দাসী-কন্যাটিকে এস বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ বাধ করিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেমনি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়া দিতে হবে।

দিচ্চি। বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইঁহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফরসা ধোপার বাড়ির কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাথা-সাবান গায়ে মাখিনে, ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে। কিন্তু, শুনচেন দিদিমণির স্নানের ঘর। তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারিনে, আমার ভারী ঘেন্না করে! তা ছাড়া যার-তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নির্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝকঝক করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখব? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাত মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুণ, সাবান-টাবান মেখে তৈরী হয়ে নাও, তার পরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নেব। দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্য দিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত, সে এই অপরিচিত অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের পরে কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

॥ চার ॥

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়, তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু,—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য পালনীয় বিধি বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে কিন্তু ইঁহাদের ঠেকিত না। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসতেন তাহার সীমা ছিল না; স্ত্রী বিয়োগের পরে আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাঁই দিতেও পারেন নাই, হয়ত, তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি! অথচ, বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে-তিন মণ ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিলেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন, সে ত জানি, সে-ই আশু বদ্যির যথেষ্ট।

মনোরমা এ কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ কথা আমার সয় না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে! আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বার বছরের মেয়ে, জানিস ত সব। কার গলায় যে কিসের মালা পরার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানিরে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দু'চক্ষু ছলছল করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সেও দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে নাই এবং পত্নী-প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ গৃহের সর্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্ম-সংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ, আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি করে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষ দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি, মণির মায়ের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ খবর কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশবাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাস্য করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলছি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাস্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে ও বয়সও হয়েছে, মেয়ে দেবে কে ?

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েছি, দেহের ওজন সাড়ে-তিন মন, বাতে পঙ্গু, কখন চলতে হার্ট ফেল করে তার ঠিকানা নেই, মেয়ে দেবে কে ? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মরেছে অবিনাশ, মরেছে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি সার্সী পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাটীর সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগবে না, মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো !

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেকছে !

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এস, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণে দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দুটোর জায়গায় দু'শোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন একটুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেন না সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ি পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হউক, আশু বদ্যির নির্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার জো ছিল না। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত শিবনাথ গুণী, তাহার সর্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ,—এ সকল কি কিছুই নয় ? তবে কিসের জন্য এত সম্পদ ভগবান তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছিলেন ? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূর করিবার জন্য ? মাতাল হইয়াছে ? তা কি হইয়াছে ? মদ খাইয়া মাতাল ত এমন কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ তিনি নিজেও ত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে ? মানুষের অপরাধ গ্রহণ করা অপেক্ষা মার্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই বলিয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেন না, অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি ?

আশ্বাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোক এ কাজ পারলে কি করে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত ভিতরে কি একটা রহস্য আছে,—হয়ত—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বলতে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দোষ এ কথা সে ত নিজের মুখেই স্বীকার করেছে?

আশ্বাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা করেছে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

আশ্বাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনিই নিজেই এ দুষ্কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য,—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিক্রি দিলে কি করে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশ্বাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন?

আশ্বাবু কহিতেন, না না সে কথা ঠিক নয়, তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারি নে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জান অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেন না।

ইহার পরে আশ্বাবুর মুখে আর কথা যোগাইত না।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশী। মুখে সে বিশেষ কিছু বলিত না, কিন্তু পিতা কন্যাকেই ভয় করিতেন সর্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ এ তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ-বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার দিন-দুই পর্যন্ত আশ্বাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজেও নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। কিন্তু আসিবামাত্রই আশ্বাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরামকেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথে স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন রূপ কখনো দেখিনি! মনে হল এদের দু'জনকে ভগবান যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েছেন।

বলেন কি!

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেন না, তা বলে রাখলাম অবিনাশবাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা শুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকে না আশুবাবু।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ-ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেন না এ'র সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে, ডানদিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্বের পরিহাসের ভঙ্গীও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তা হলে অকারণ দম্ভ করেনি বলুন? কিন্তু পরিচয় হল কি করে?

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে আনতে সাহস করেন নি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বক্র হলে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হলও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড়-বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুশী হতে পারেনি। ওরই সমবয়সী, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে, শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন, মেয়েটি যথার্থই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ, সে যে আমাদের ভদ্রসমাজের নয়, তাতে তার সন্দেহ নেই।

অবিনাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, কি করে বোঝা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে কাপড়ের পরিবর্তে একখানি ফরসা কাপড় চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কারও কারও ব্যবহার করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেন না ইহার মধ্যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গীর মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায় না। তাছাড়া, মেয়েদের চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্যন্ত বুঝতে নাকি বাকি ছিল না যে, মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নীচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয়, এরও হয়েছে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা! কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি ভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে নাকি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে জায়গাটা ভাল লাগচে কিনা—প্রশ্ন করার সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ, শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেন না।

না তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বললাম, মণি, ওঁদের বিদায় দিতেও একবার এলে না? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারব না, আসুন বলে বিদায় দিতেও পারব না। নিজের বাড়িতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি?

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু। কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলছেন। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে ত জানে সবই,—তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, কহিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন না, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া শুইলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন?

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন না, তেমনি অর্ধশায়িতভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন-একটা ব্যথার মত লেগেছে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এমন ছটফট করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির,—শুধু রূপেই নয়।

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখিনি, কথাও শুনিনি আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান না? আমি যে কেউ আছি এ কথা না-ই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবী করিনে।

অবিনাশ কিছু আশ্চর্য হইলেন, বলিলেন, এ ত খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু? শুনলে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্র-সমাজে চালিয়ে দিতে চায়।

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ তার কথা মনে হল সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম, এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে। কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয় গোপন করেছে! এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সে সত্যই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন, মেয়েটি তাঁর স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়! কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু এঁদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে, তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়? অবিনাশবাবু, আপনি ত অক্ষয় নন, এ ত আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনে।

অবিনাশবাবু লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে! তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁহার শেষ হইতে পাইল না, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবে না?

না, মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবে না মনোরমা?

নিশ্চয় পারব,—চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে এবং বোধ হয় এক সপ্তাহের পূর্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

॥ পাঁচ ॥

দিন-দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর-দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা —বৈকালে নিশ্চয় আসবেন।—আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসী দ্বারের পর্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল নাকি—আসতে না আসতেই জরুরী তলব পাঠিয়েছে, যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যে-মশাইকে গিলে খেতে চায় নাকি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোটগিন্নী, কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোটগিন্নী, অমৃত ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখলে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বৈ কি:

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না,—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বে না।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবে না মুখুয্যে-মশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত বেড়া বাঁধিয়ে রাখবো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধার্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত,—ইতিমধ্যে অধীনের দশ-দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একবারে দশ-দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দুটো শুধু তাজা হয়েচে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হতে উপরে এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন শুরু করেছে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে, আজ কি একটা পর্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা-কূলে সমবেত হয়েচেন এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্বিকার-চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

ভাল কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু অতি উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করছেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশ্ব উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েছে, বাবাজী স্বয়ং মেরামতি-কার্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্ত প্রায়, এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসিমুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটিকে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বলতে গিয়েও হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বলতে, অন্ততঃ আপনাকে বলতে বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন; আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্ম সমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম হিন্দুতেই হয়। যথাসময়ে অর্থাৎ বছর-চারেক পূর্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হতোও তাই, কিন্তু হল না। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে, সেও এক বিচিত্র ব্যাপার,—বিধিলিপি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন; আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়েহলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়িতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনিই বাড়ির কর্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়ীমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বললেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারে না। তিনি নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে, এখন বিবাহ হলে তিন বৎসর তিন মাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলস্থুল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিনতাম, বুঝলাম এর আর নড়চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড় লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ী ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না, তিনি ভয়ানক রাগ করলেন; অজিত দুঃখে, অভিমানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙ্গে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাস হলাম, হল না শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বললে, বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে যার জন্যে তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে? তিন বছর এমন কি বেশী সময়?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে ত জানি। বললাম, মা তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু এ সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যেন মারাত্মক।

মণি হেসে বললে, তোমার ভয় নেই বাবা, আমি তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচল বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোনদিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জানতো এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করলে একটা দিনের জন্যেও তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার জো নেই অবিনাশবাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত-চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার জো নেই। কিন্তু আমি আশীর্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। অজিত সর্বাগ্রেই খুড়োমহাশয়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতো না।

অতঃপর, উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেলে, বছর-দুই পর্যন্ত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করিনি তা নয়। কিন্তু মণি হঠাৎ জানতে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বললে, বাবা এ চেষ্টা তুমি করো না। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান করনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বললাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা। কিন্তু, মেয়ের দু'চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বললে, হয় না বাবা। শুধু কথা-বার্তাই হয়, কিন্তু তার বেশী—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেছেন তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর আদেশ তুমি করো না। দু'জনের চোখ দিয়েই জল পড়তে লাগল, মুছে ফেলে বললাম, অপরাধ করেছি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি এবং কত অন্যায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন কিসের?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি, মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে মেমসাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কত বড় ভ্রম বলুন ত!

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি আসল বস্তু পাওয়া। এই

পাওয়া না পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে।—এই যে অজিত! মণি কৈ?

বছর-ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়ে-জামায় কালির দাগ। কহিল মনি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য করছিলেন তাঁর কাপড়েও কালি লেগেছে তাই বদলে ফেলতে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সামনে আনতে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখনকার কলেজের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশু-বাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মনির আসতে মিনিট-পাঁচেকের বেশী লাগবে না। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরি হলে সব দেখার সময় পাওয়া যাবে না। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটে না।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ, তোমারই দেরি, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকী।

ছেলেটি নিজের পোশাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদলাতে হবে না, এতেই চলে যাবে।

এই কালিসুদ্ধ?

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশও যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে-সকল কথা শুনিতে-ছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাদাসিধা পোশাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্ত মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ, কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল, পিতৃস্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গেছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড-মোটরযানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যলুব্ধ নারী ও রূপলুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্বত্রই তাহাদের সাজসজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্বখ্যাত, অনন্ত

সৌন্দর্যময় তাজের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে যাইতেছে।

যমুনা-কূলে যাহা-কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অবক্ষয়ের দলবল ইতি-পূর্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সংবর্ধনা করিলেন। বাতব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতিগুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিন্যস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচা গেল। এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ করগে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই বেগমসাহেবকে কুর্নিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাকে দিয়ে হবে না।

মনোরমা ক্ষুন্নকণ্ঠে কহিল, সে হবে না বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারব না।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ বলিলেন, তা যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে, এ কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হতো না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন; মনোরমা বলিল, সে হবে না বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে এর অর্ধেক সৌন্দর্য ঢাকা পড়েই থাকবে। যিনি যত খবরই দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশী জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধই করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভান করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, আশু-বাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে!

আশুবাবু উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন এলেন শিবনাথবাবু! এদিকে আসুন!

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আপনার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়। কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীর পরিচিত। বসো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এর পরিচয় ত দিলেন না।

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বৈ কি। উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিন কয়েক হল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখতে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখলে?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেন-না এই পরম বিস্ময়ের জিনিসটি সে এখনো দেখেনি, এইবার দেখবে। কিন্তু আলো কমে আসচে, আর ত দেরি করলে চলবে না অজিত।

মনোরমা বলিল, দেরি ত শুধু তোমার জন্যই বাবা। ওঠো।

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্যে যে আয়োজন করতে হয়।

তা হলে সেই আয়োজন কর বাবা!

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি রকম মনে হল?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি, পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইল না। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে বাবা, ওঠো এইবার।

উঠি মা। এই বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ প্রস্তাবের জবাবও দিল না, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা, সে হবে না। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন একমুহূর্তেই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

অবিনাশের চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবে না। মনোরমার বিশ্বাস ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্ধেক সৌন্দর্যই উপলব্ধি করা যাবে না।

কমল সরল চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক? এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলা ত ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিল, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই—সৌন্দর্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিও নি কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজ-কণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশী হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না।

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিংবা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে, এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ মানুষ বধ-করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো! এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দলোকের অক্ষয় দান! এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট!

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করুন না, মানুষের অন্তরে সে-শ্রদ্ধার আসন আর থাকবে না।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিলেন, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেছি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসীকন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আরও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু তপরের চক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি, মা।

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষ হঠাৎ সইতে পারে না। আপনি সত্যই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে—এ মরেছে। এই বলিয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল চল, আমরা দেখে আসি গে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি। কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো—না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

॥ ছয় ॥

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয়, রব তিনি ইতিপূর্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া উর্দ্ধভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল-জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া, কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসত পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ,— ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জ্বলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেমনই ক্লান্ত ও মলিন; সে যেন দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গেছে!

আশুবাবু শুধু বলিলেন বসো। কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিংবা বসিল কি না সে দেখিবার সময় পাইলেন না।

অবিনাশ বোধ করি অক্ষয়ের যুক্তিমালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন; বলিলেন সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্বেলের মত সাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা,—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিল না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ত্রুটিও ছিল না—জানি ত সব, কিন্তু এ কথা উনি ভাবতেই পারলেন না তাঁর মৃত স্ত্রীর জায়গায় আর কাউকে এনে বসানো যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদুস্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন, এখন এ আলোচনা থাক।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিলেন, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিল না—সেই উদাস অন্যমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিল না, জানিবার চেষ্টাও করিল না।

কমল কহিল, ও—এমনিই। তোমার বাড়ি যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়িটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়াই সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্তন হইল না,—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া, যেন দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

অবিনাশের দেরী সহিতেছিল না, বলিলেন আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে। তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেন না, কহিলেন এ ক্ষেত্রে অপরাধ হবে না। আমরা এতগুলো লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করচি, তুমি বল।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েচি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি ভালবেসেচি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝতে পারচি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, কহিলেন কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ঠাবোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশু বদ্যি বড্ড নিরীহ মানুষ কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেচ, আরও দিন-দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল, এ-সব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এইজন্যেই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এইজন্যেই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বলতে বাধচে যে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে শ্লেষ ছিল, বলিল খুব সম্ভব আপনারা মানেন না, একটু শুনতে পাই কি?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন করে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জীবন-যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বিধবা-জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। এ কি তুমি মানো না?

কমল বলিল, না। একটা বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরঞ্চ বলুন এইভাবে এদেশের বৈধব্য-জীবন কাটানোই বিধি, বলুন একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে,—আমি অস্বীকার করব না।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্যের মধ্যে—না থাক, ব্রহ্মচর্যের কথা আর তুলব না,—কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবনযাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্যাদাটাও দেব না?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা এ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে বহু মর্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি স্ফীত হয়ে উঠেছে যে, তার আর স্থান-কাল কারণ-অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয়, এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয়, আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করেন না?

কমল জবাবও দিল না, রাগও করিল না, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেন না, তিনি আশুবাবু। অথচ, কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ-সব কদর্য ধারণা আমাদের ভদ্রসমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্রসমাজে অচল হয়েই ত আছে। এ আমি জানি।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল। পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্য বলিচিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু পারে না,—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারিনে।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েচি মানি, কিন্তু সে দিন ত বুড়ো ছিলাম না। কিন্তু তখনো ত এ কথা ভাবতে পারিনি।

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সেই বুড়োর শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো-মন খুশী হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ! হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই,—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের কত ভাল ভাল বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ করে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দলোকের বিসর্জনের বাজনা, এ কথা সে জানতেও পারে না।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন, ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া উন্মাদযৌবনের এই নির্লজ্জ স্তবগানে সকলের গানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন আশুবাবু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো-মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে এ সত্যিই সেই কি না।

কমল কহিল, মনের বার্ধক্য আমি তাকেই বলি আশুবাবু, যে-মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন, জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই,—বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙ্গিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকী দিন-কটা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু, নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময়মত একবার দেখব বৈ কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না, বলিয়া উঠিল. আমার একটা প্রশ্ন—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস কিসের জন্যে? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না?

অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল—না না, সে কি, সে কেমনধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমনধারা নয়। বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন আমাকে ডাকবার জন্যেই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা, তাই বলে যদি আমি ডাকি, আপনি রাগ করেন নাকি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, রাগ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু ত কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায়, বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না, রাজারা তাঁদের নামের আগে-পিছে কতকগুলো নিরর্থক বাক্য দিয়ে, কতকগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়? নইলে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, যেমন ইনি। কখনও কমল বলতে পারেন না, বলেন, শিবানী। অজিতবাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ আমি ত বুঝবই।

কিন্তু কি যে হইল, এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিল না, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অঘ্রাণের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা, হিম পড়তে শুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েচেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েছেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, উপরের—উনি। এই বলিয়া তিনি এইবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করবার জন্যে যেন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বসিয়া বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করিতে পারি কি?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন?

অক্ষয় বলিলেন, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই, তাই জিজ্ঞেসা করি, শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যই বিবাহ হয়েছিল?

আশুবাবু মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি অক্ষয়বাবু?

অবিনাশ কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট!

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই। কিন্তু আমাদের ত আছে।

কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাশার কথাই না ইহার মধ্যে আছে।

কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু? আমি বলচি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়,—ফাঁকি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, বিবাহ হল শৈব মতে। আমি বললাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি শৈবমতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে!

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কিনা, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম কোনদিন?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিল না, তেমনি উদার গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট। উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না নাকি?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই। কিন্তু সে হবে না। আমি আত্মহত্যা করতে যাব এ কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেন না।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গীতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানী, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়।

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারী হিম পড়বে, এখন না উঠলেই যে নয়।

এই যে মা উঠি!

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানী, আর দেরি করো না, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হল যেন কেবল তর্ক করার জন্যেই। কিছু মনে করবেন না।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে, শিবানী, শিখলে না কিছুই।

কমল বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চে না ত।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইল। পার যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই।

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বলচ কি আজ?

শিবনাথ জবাব দিল না, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চল।

আশুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য!

॥ সাত ॥

আশ্চর্যই বটে। এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া— পর্দার ও-পিঠে না-জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচরে রহিল! সকলের মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল, এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এইজন্যেই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন্দ-জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেতমর্মর মায়াপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠলে তোমার সত্যি অসুখ করবে বাবা।

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়ছে, উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেন্দ্রর টাঙ্গা-ওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশী ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব কোনমতে ঠেসাঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া ছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ; কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন সামান্য দাসীর মেয়ে হতে পারে না। অসম্ভব! এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ ত গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশবাবু!

অবিনাশ বলিলেন সেই কথাই ত ভাবচি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝতে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায় না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে! আপনাকেই ঠকানো! একেবারে monopoly-তে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্রঘরের culture সিকি-পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ-সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায় না অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দুই-ই এক অবিনাশবাবু। দেখলেন না, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাশার ব্যাপার। যখন সবাই বললে, এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বললেন, তাই নাকি! Absolute indifference নোটিশ করেন নি। এ কি কখনও ভদ্রকন্যার সাজে, না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর form-টার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যা হোক কিছু একটা হলেই ওর হলো। স্বামীকে বললে, ওরা যে বলে বিয়েটা হলো ফাঁকি। স্বামী বললেন, বিবাহ হল আমাদের শৈবমতে। কমল তাই শুনে খুশী হয়ে বললে, শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে আমার শৈবমতে ত সেই ভাল। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু।

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরেই বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করা—হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম। দেবে নাকি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তার পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া শুধু একটুখানি মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিল না, বলিল, আপনারা অবাক করলেন অবিনাশবাবু! তাঁদের যা-কিছু সমস্তই মিষ্টি-মধুর। এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা 'নী' যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো!

হরেন্দ্র কহিল, শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয় না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়িনী বলে ডাকলেই কি মধু ঝরবে?

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়া কহিলেন, হরেনবাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ-সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি, আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে, সহস্র খোঁচাখুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায় না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকী পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িলেন। সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য পরিহাস করিয়াছে, এবং শিবনাথের

শৈবমতে বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে আভিজাত্যের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ, শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক, ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারংবার প্রতিপন্ন করিতে করিতে, গাড়ি আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেলে হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পেঁছাইয়া দিতে গাড়ি চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ির মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন. না, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুন্ন হয় না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিত না। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি. কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্বের ধারণা কি আজ বদলায় নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন,—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা?

পিতা পিরুক্তি করিলেন না। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নতুন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধ হয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতিধ্বনিমাত্রই হতো ত এ কথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হত না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে অশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, কেবল, এরই জন্যে আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল. অবিনাশবাবু, এইখানে তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল,—তার সেদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি,—কিন্তু সমস্ত ছলাকলা, সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিনতে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—কি যে তোরা সব বলিস মা?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই আশুবাবু। যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি,

'কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এখানেই মস্ত মতভেদ আছে।

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে ত শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখেচো সে তুমিই জানো বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়?

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব ত তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি!

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি?

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ, পেলেই তার মিথ্যাচার হতো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেছে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে তোমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই ত ঠিক, এতে ব্যথা পাবার ত কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিত না, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপসা,—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইল না, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হল না। যাই হোক, —না, তার কাছে নেই।

তা হলে আত্মসংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন, সে শুধু নিষ্ফল আত্মপীড়ন। আর তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকানো নয়, পৃথিবীকে ঠকানো। তার মুখ থেকে শুনে মনে হলো, কমল এই কথাটাই কেবল বলতে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুনলে ভারী বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল,—বিস্ময় লাগে! সর্বশরীরে জ্বালা ধরে না? বাবা, কখনো কোন কথাই কি তুমি জোর করে বলতে পারবে না? যে যা বলবে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ ত দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকে না, অন্য পক্ষও ঠকে। যে-সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলেনি। সে যা বললে তার মোট কথাটা

বোধ হয় এই যে, সুদীর্ঘ সংস্কারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি, সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুজে মাথা নাড়লেই হবে কেন, মণি?

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটা দেখবার লোক ছিল না?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভাল করে জান যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হলে সৃষ্টি থেমে যেত। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধ করি কিছুই বুঝতে পারচো না,—না!

অজিত ঘাড় নাড়িলে আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোমকুণ্ডের আগুন জ্বেলে দিলেন, লোকে চেয়ে দেখবে কি, ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ খুলতেই পারলে না। অথচ, মজা হল এই যে, আমাদের মামলা হলো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তাঁর চাকরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈবমতে,—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জানালেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞাসা করা হলো, মেয়েটি কি ভদ্রঘরের? শিবনাথ বললেন, সে তাঁদের বাড়ির দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হলো, মেয়েটি কি শিক্ষিতা? শিবনাথ জবাব দিলেন, শিক্ষার জন্যে বিবাহ করেন নি, করেছেন রূপের জন্যে। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনে অজিত, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তারপরেই সব চেয়ে বেশী। আর এই হলো সমাজের সুবিচার!

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজের অক্ষয়বাবুরাও ত আছেন, তাঁরই ত প্রবল পক্ষ?

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আনতে বোধ হয়?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেন না, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই আসে মা?

অজিত বলিল, আশ্চর্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সব চেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশী।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয়। ভাবি, এইবার গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়ে না, ভয়েরও দাগ লাগে না। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবে না। দেবতার দলই আসুক, আর দৈত্যদানোবেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্বিকার চিত্ত,—শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুশী। কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইল না, আশুবাবু অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেন না অবিনাশবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, সেখানে কি করেছি, না করেছি, নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করে আনবে। তখন ?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেতে গিয়েছিলেন নাকি ?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে। বাবা ব্যারিস্টার। বাবা ডক্টর।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি ?

আশুবাবু তেমনিভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে মেয়ে নিয়ে এখানে সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বললেন সমস্ত চিত্ততলটা একেবারে ধুয়েমুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে। ছাপছোপ কোথাও কিছু বাকী নেই। সে যাই হোক, দয়া করে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেন না।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারী ভয় ?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হলে একেবারে মারা যাব।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অন্যায়।

বাবা বলিলেন, অন্যায় হোক মা, আত্মরক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল; মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয়বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে কর ?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোলমেলে বস্তু, মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে ত হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেছে, মীমাংসা আর হলো না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনো স্পষ্ট করে কিছু বল না। এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট করে বলবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি,—সে তোর কপাল। এখন খামকা আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন বল ত ?

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেছে, বাইরে বাইরে খানিক ঘুরে আসি গে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে? এই অন্ধকারে?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেইদিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই, একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেড়িয়ো না।

না, গাড়িতেই যাবো।

গাড়ির ঢাকনাটা তুলে দিয়ো অজিত, যেন হিম লাগে না।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা হলে অবিনাশবাবুকেও অমনি পেঁছে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু, ফিরতে যেন দেরি না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখচি এখনো যায়নি। এ ঠাণ্ডায় চললো বেড়াতে।

।। আট ।।

দিন-পনেরো পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা শহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদূর পর্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে তাহারই একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ি থামাইয়া দেখিল, শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙ্গাচোরা পুরাতন কালের একটা দ্বিতল বাড়ি, সম্মুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান,—তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিতে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলাম, কিন্তু শুনতে পেলেন না। পাবেন কি করে? বাপ্ রে বাপ্! যে জোরে যান,—দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভয় করে না?

অজিত গাড়ি হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে? শিবনাথবাবু কৈ?

কমল বলিল, তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েছেন কেন? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভাল ছিল না, তাই তাঁরা কেউ বার হননি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাকতে পারিনে।

কমল কহিল, আমিও না। কিন্তু পারিনে বললেই ত হয় না,—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল. নেবেন আমাকে সঙ্গে করে? একটুখানি ঘুরে আসবো।

অজিত মুশকিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্যন্ত ছিল না, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্বেই শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই?

কমল কহিল, শোন কথা! সঙ্গী-সাথী পাব কোথায়? দেখুন না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। শহরের বাইরে বললেই হয়,—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধ করি একটা চামড়ার কারখানা আছে,—আমার প্রতিবেশী ত শুধু মুচিরা। কারখানায় যায় আসে, মদ খায়, সারা রাত হল্লা করে,—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই?

কমল বলিল, বোধ হয় না। আর থাকলেই বা কি—আমাকে তারা বাড়িতে যেতে

দেবে কেন? তা হলে ত,—মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়,—তখন আপনাদের ওখানেও যেতে পারতাম। বলিতে বলিতে সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল; কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়িনি। আজ কিন্তু আমাকে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আনতে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইল না, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশী দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ি ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, নাঃ,—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা হলে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুন না?

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বসলে গল্প করব কি করে? অতদূরে পিছনে বসে বুঝি মুখ বুজে যাওয়া যায়? আপনি উঠুন, আর দেরি করবেন না।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জন, কদাচিৎ এক-আধজনের দেখা পাওয়া যায়,—এইমাত্র। গাড়ির দ্রুতবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল, কমল কহিল, আপনি জোরে গাড়ি চালাতেই ভালবাসেন, না?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করে না?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগচে। বোধ হয়, স্বভাব, না?

অজিত কহিল, তা হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও,—না?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন?

কমল কহিল, পড়লেই বা অজিতবাবু! দ্রুতবেগের ভারী একটা আনন্দ আছে। গাড়িরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি! কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুশী, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না। ঠিক না অজিতবাবু?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিল না, বলিল, এর মানে?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্ষণেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই। এমনি।

কথাটা সে যে বুঝাইয়া বলিতে চাহে না, এইটুকুই শুধু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিলেন, এরই মধ্যে? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেকদূরে এসে পড়েচি ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হলই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিলম্ব হলে ভাল হবে না।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা শহরে ত গাড়ির অভাব নেই, তাঁরা অনায়াসে যেতে পারবেন। চলুন, আরো একটু। এমনি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোকবিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারিদিকের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ একসময়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে গাড়ির গতিরোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরি চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম, মিথ্যের সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদই না মানুষে নষ্ট করে। আমাকে একলা নিয়ে যেতে আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম, এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘটত না।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে নিশ্চয় করে ত কিছুই বলা যায় না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে।

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে ঊর্ধ্বশ্বাসে কত দূরেই না বেড়িয়ে এলাম। আজ আমার কি ভালই যে লেগেছে তা আর বলতে পারিনে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই,—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিতেছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মতন হয়ত সত্যই ইহাতে কিছুই নাই, তবুও প্রথমটা সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ওই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধ হয় কেহই কিছু জানে না,—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানি মিথ্যা,—এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে তাহারা দেয় না, যেন সমস্তটাই তাহাদের কাছে একেবারে নিছক পরিহাস।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতেই কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভাল কথা, কি বলছিলেন, ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে? পারে বৈ কি!

অজিত কহিল, তা হলে ?

কমল কহিল, তা হলেও এ প্রমাণ হয় না, যে আনন্দ আজ পেলাম, তা পাইনি !

এবার অজিত হাসিল। বলিল সে প্রমাণ হয় না, কিন্তু এ প্রমাণ হয় যে আপনি তার্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূট-তার্কিক, তাই আমি।

অজিত কহিল, না, তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক, তাকে সত্যকার আনন্দভোগ বলা চলে না। এ ত আপনি নিশ্চয়ই মানেন ?

কমল বলিল, না , আমি মানিনে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত অল্পই হোক, পরিমাণ তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক, তবুও যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন না আর একদিনের নিন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, এ জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া। এই কি ঠিক নয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের দুই চক্ষু একান্ত আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিত কিছু একটা শুনিতে চায়।

কৈ জবাব দিলেন না ?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না ?

না।

একটা চাপা নিঃশ্বাস পড়িল। তাহার পরে কমল ধীরে ধীরে বলল, তার মানে স্পষ্ট বোঝবার এখনো আপনার সময় আসেনি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত ?

অজিত কহিল, করব।

গাড়ি আসিয়া সেই ভাঙ্গা ফুলবাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাটীর দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও এতটুকু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্যায়। কাউকে জানিয়ে গেলেন না, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেছেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনার ভারে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি করে? গাড়িতে একটা হাত-লণ্ঠন আছে, সেটা জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো?

কমল অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল, তা হলে ত বাঁচি অজিতবাবু। আসুন, আসুন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, আর যা হুকুম করুন পালন করব, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেন না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল; ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাড়িটি দ্বিতল। উপরে ছোট ছোট গুটি-দুই ঘর। অতিশয় সংকীর্ণ সিঁড়ির নীচে মিটমিট করিয়া একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। রাত অনেক হলো।

কমল জিদ করিয়া কহিল, সে হবে না, আসুন!

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাবচেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে ভারী লজ্জার কথা। কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বশী এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নীচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমোতো পারবো না।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্প মূল্যের আরাম-কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা-তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা,—যেন, সাধারণতঃ, তাদের প্রয়োজন নাই এমনি একটা লক্ষ্মীছাড়া ছাভ। ঘর শূন্য,—শিবনাথবাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল; কিন্তু মনে মনে ভারী একটা স্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, কৈ তিনি ত এখনো আসেন নি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধ হয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চলচে।

কি করে জানলেন?

কাল-পরশু দু'দিন যাননি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে নিচ্চেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, দু'দিন যাননি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সম্ভবতঃ আপনি ছেড়ে দেননি বলেই তিনি যেতে পারেন নি। নইলে স্বেচ্ছায় গরহাজির হয়েছেন এ ত তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না।

কমল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া

উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজনা করতে। বাস্তবিক, মানুষকে জবরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্যায়, না?

অজিত বলিল, নিশ্চয়।

কমল কহিল, উনি ভাল লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে যদি কেউ ধরে রাখতো, থাকতেন?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখবার ত কেউ নেই।

কমল হাসিমুখে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ ত মুশকিল। ধরে রাখবার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জানবার জো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেচি তা টেরও পাননি। থাক থাক, সব কথার তর্ক করলেই বা হবে কি? কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাই, আমি ও-ঘর থেকে চা তৈরি করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ করে বসে থাকবো? সে হবে না।

হবার দরকার কি। এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ করে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো,—কিন্তু সে ত আর-একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু,—তবুও আপনাকে বসতে ত দিলাম। অথচ, কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!

ইহার অর্থ যে কি ভাবিরা পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুরূহ। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাঁকেই বা বসতে দেননি কেন?

কমল কহিল, এই ত মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাদের নিজের হাতে কিন্তু কোথায় বসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয়, কেউ তার সন্ধান পায় না। আপনার চায়ে কি বেশী চিনি দেব?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষে এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাইনে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি বুঝি তা হলে আসামে?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও চায়ে আপনার রুচি নেই?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্যে।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর?

কমল বলিল, হাঁ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি ; কিন্তু কৈ, আজকে রাঁধবার ত সময় পাননি ?

কমল কহিল, না।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞাসা করুন—তা হলে আপনি খাবেন কি ? তার জবাবে আমি বলব, রাত্রে আমি খাইনে। সমস্তদিনে কেবল একটিবার মাত্র খাই।

কেবল একটিবার মাত্র ?

কমল কহিল, হাঁ। কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হলো, তবে শিবনাথবাবু বাড়ি এসে খাবেন কি ? তাঁর খাওয়া ত দেখেচি—সে ত আর এক-আধবারের ব্যাপার নয় ? তবে ? এর উত্তরে আমি বলব, তিনি ত আপনাদের বাড়িতেই খেয়ে আসেন—তাঁর ভাবনা কি ? আপনি বলবেন, তা বটে, কিন্তু সে ত প্রত্যহ নয়। শুনে আমি ভাববো এ কথার জবাব পরকে দিয়ে আর লাভ কি ? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হবে, অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে।

অজিত সত্য সত্যই এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে ? আপনি কি রাগ করে বলছেন ?

কমল কহিল, না, রাগ করে নয়। রাগ করবার বোধ হয় আজ আমার জোর নেই। আমি জানতাম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আগ্রা ছেড়ে আজও তিনি যাননি। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে বসি গে।

এ ঘরে আনিয়া কমল বলিল, এ আমাদের শোবার ঘর। তখনও এর বেশী একটা জিনিসও এখানে ছিল না,—আজও তাই আছে। কিন্তু সেদিন এদের চেহারা দেখে থাকলে আজও আমাকে বলতেও হতো না যে আমি রাগ করিনি। কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু, আর ত দেরি করা চলে না।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, আজ তাহ'লে আমি যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি।

হাঁ, আসবেন। এই বলিয়া সে পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল।

অজিত বার-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাবু কতদিন হ'ল আসেন নি ?

হ'ল অনেকদিন। এই বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

॥ নয় ॥

অজিত যখন বাড়ি ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ,—কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয় ত দুইটা,—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত ; শোওয়ার কথা দূরে থাক, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ, মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু, মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না, ন হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবিতে হয় না।

গেট খোলা ছিল। দরোয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ি আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বলচি কি একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাটলো ত? শিক্ষে হ'ল ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোলবার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল ক'রো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দ্যাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোও গে। কাল শুনবো সব কথা। যদু! যদু!—সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজতে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় শহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বললে অন্যায়। কিন্তু আমাদের যা হচ্ছিল তা আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে—মণিই বা গেলো কোথায়? তাকেও ত তখন থেকে দেখচি নে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েছেন।

শোবে কি হে? এখনো যে তার খাওয়াও হয়নি। বলিয়াই তাঁহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখলে?

অজিত কহিল, কৈ না?

তবেই হয়েছে। এই বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়িটা নিয়ে সেও দেখচি খুঁজতে বেরিয়েছে। দ্যাখো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে। আজ রাতটা তাহলে জেগেই কাটলো।

আমি দেখচি গাড়িটা আছে কি না। এই বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ি মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নীচের বারান্দার উত্তর-প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিঁকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জ্বলিতেছে কিনা জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্য হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা হইতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়,—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। উভযের কেহ জানিতেও পারিল না তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ি-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখচি মেয়েটার খাওয়া হল না। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবো না, আপনি শুতে যান।

যাই। কিন্তু কিছুই খাবে না? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না, কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুতে যান।

এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে?

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যদু বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলে অজিত তাহার খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়িবারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে ?

আমি অজিত।

বাঃ! কখন এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে থামিতে দিল না। বলিতে লাগিল, দ্যাখো ত তোমার অন্যায়। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেবে সারা,—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই ত বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিল না।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেন নি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিই গে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা খবর দিলে না কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঘুমিয়ে পড়ব কি রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্যন্ত।

তা হলে খেয়ে শোও গে। রাত আর নেই।

তুমি খাবে না?

না। এই বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ! বেশ ত কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিল না। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া, নিজের জিদ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই,—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে,—বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই,—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিল না এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্বাক নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল, জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিল না, সে রহিল কি গেল এটুকু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিল না। গভীর নিশীথে এমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিংবা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটেছিল, না?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল?

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হল যে?

অজিত শুধু কহিল, এমনিই।

মনোরমা নিজে চা খায় না! সে পিতাকে চা তৈরি করিয়া দিয়া একবাটি চা ও

খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভাল নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক, তবুও এ-বাড়িতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই!

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাইনে এ কথা ত আমি বলিনি বাবা!

না না, বলনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুনলে?

আশুবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি শোনেন নি কিছুই, জানেন না কিছুই, সমস্তই তাঁহার অনুমান মাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইল না। কারণ, এমন করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায় না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেন না, আমিও শুতে গেলাম; তুমি ত আগেই শুয়ে পড়েছিলে,—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওঁর মনটা আজ তেমন ভাল নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে কাটাতে চায়, আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরের মধ্যে জেগে কাটাতে হবে? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য বাবা?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তা হলে তাঁর কর্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থে যদি অন্য কাউকে বোঝায় ত তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলাম না। শুধু একটা রাত মাত্রই নয়, তবু একজন তাই নিয়ে গোটা তিনটে রাত্রি জানালায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্তব্য কে নির্দেশ করেছিলেন তখন জিজ্ঞেস করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে এ কথা জেনে নিতে ভুলবো না। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ-দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু বসো, আমি রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি

চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশী দূরে গড়াইবার সময় পাইল না, ইহাতে সে স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছে। মধ্যাহ্নভোজনের সময় সে প্রায় কথাই কহিল না এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ়, তেমনি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোন-দিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে ত বাবা?

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ত জেগেই ছিলাম। খেতেও বললাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলে না। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় হয়েছে আমি ত ভেবে পাই নে। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত করে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞাসা করবার কি আছে বাবা?

জিজ্ঞাসা করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন—বিশেষতঃ মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ ত খুব স্পষ্ট। বোধ হয় সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা কর। এ-রকম অন্যায় ধারণা ত তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অন্যায় করে থাকেন সে তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনকে গায়ে পড়ে দিতে হবে বাবা?

পিতা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেন, না। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলাপাড়া করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে এবং এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেন না। অজিতকে তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়া সুশিক্ষিতই নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা চরিত্রের সত্যপরতা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয় না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্তে রাগ করিয়া রহিল, এমন অসম্ভব সে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা কঠিন।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু খবর

লইয়া জানিলেন গাড়ি আসিয়াছে অজিতের জন্য। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তিনি অতি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হলো? আবার বিগড়েচে নাকি?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে ত!

যদি হয়ও, জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বল। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে?

অজিত কহিল, কৈ আমি ত জানিনে। তবে, আজও আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে, বাড়ি পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশী। ঘোড়ার গাড়িতে ঠিক হয়ে উঠবে না।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল, কাল সভাভঙ্গের পরে আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরেই মজলিস বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল, এই সঙ্গে এ কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্বচ্ছন্দতায় কথাটা তাঁহার নিজেরই মনে নাই এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ-সকল কতদূরে বিরক্তিকর তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবে না অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞেসা করে দেখ না। এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ করে আছ বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে? মণি? আচ্ছা, সে-সব আর একদিন হবে, এখন, যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসো গে। কিন্তু বেশী দেরী করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবে না তা বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুঁড়ে হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া উচ্ছল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিত হইয়া পড়িয়া ফোঁস করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া করে বেড়াতে! ছিঃ!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুক স্নিগ্ধ-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে ত মা? না, একদম ভুলে বসে আছ?

কি বাবা?

আজ যে সকলের নেমন্তন্ন? তোমার গানের পালা শেষ হলে তাঁদের যে আজ খাওয়াবে,—বলি, মনে আছে ত?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আছে বৈ কি। মোটর পাঠিয়ে দিয়েচি তাদের আনতে।

মোটর পাঠিয়েছ আনতে? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবে না।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের প'রে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আমাকে এ কথা বলতে হতো না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর 'পরে তুমি কেন রাগ করে আছ, এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার করে নিতেন,—কিন্তু তিনি ত নেই,—আমাকে কি তা বলা যায় না।

তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্তা হয়নি?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল? কখন হল? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হতো না, কিন্তু তিনি ঘুমোন নি। আপনি শুতে যাবার খানিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপরে?

তারপরে আর কোন কথা আপনাকে বলব না? এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল-পরশু আমি এখান থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল, সে তিনি শুনিতে পাইলেন। মিনিট-কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, সে-ও তাঁহার কানে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেন না, সেইখানেই মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া

বসিয়া রহিলেন। বৈঠকে বসিলে বেহারা গিয়া সংবাদ দিল, বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিল না, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল,—সকলেরই বার বার করিয়া মনে হইতে লাগিল, বাড়ির একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

॥ দশ ॥

এদিকে অজিতের গাড়ি আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারের সংকীর্ণ বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া ছিল, চোখাচোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়িটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে ত দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাব?

কেন, ভয় করবে নাকি? না হয় আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব। আসুন। এই বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরে আনিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেচি। আপনি না এলে রাগ করে আমি সমস্ত মুচীদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ ত কম নয়। কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর ঢের বেশী সদগতি হতো।

এ কথার মানে? বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,—কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং, তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যবহার, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হলো সাধু লোকেদের ভাল-মন্দর বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্মবুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না যে আসলে ঐটেই হলো ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কথা তারা জানবে কোথা থেকে?

অজিত আশ্চর্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে আনন্দ নেই নাকি?

কমল কহিল, না নেই। কর্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই ত বন্ধন। তা না হলে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে বসে রেঁধেচি—

আপনি এসে খাবেন বলে, এত বড় অকর্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্‌খানে? অজিতবাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উলটো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকেই উপলব্ধ হয়, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক, আপনি খেতে বসুন। এই বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হচ্চে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিতবাবু, আমি? আমার দরকার? এই বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলো অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কাল আমার খাওয়া হয়নি।

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাত্রে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেন না। তাই হয়েছে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদ-সুদ্ধ আদায় হচ্চে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু, আমি একেবারে জন্তুর মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খাননি, অথচ সেদিকে আমার হুঁশ নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে বড়, তাই ত তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিতবাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এ সব মাছ-মাংসের কাণ্ড। আমি ত খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। এই বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল-ডাল আর আলু সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল। কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বলতে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে ত আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেছে অক্ষয়বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারিনে।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মানিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য থাকে না,—রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই যেন

আপনি আমল দিতে চান না। হাত বাড়িয়ে পথ আগলানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক! যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি। ধৈর্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছয় না। ইচ্ছে হয়, আমি যদি তাঁর মেয়ে হতাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিলতো কি করে?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বললাম। মণির মত আমি যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেন না! তিনিও এমনি ধীর, এমনি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোটজাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্মরহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিত আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল। কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্ছি।

না, সে হবে না। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে এক পা-ও উঠবো না।

বেশ মানুষ ত! এই বলিয়া কমল হাসিয়া আহার্য-দ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানে না। কিন্তু আজ এত প্রকার পর্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায় এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং, যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। কমলের খাওয়ার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে করে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি করে বেড়ায়, তারা কিন্তু

আপনার পাদস্পর্শের যোগ্য নয়। সংসারের দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা জানিনে, কিন্তু এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন ত একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেছেন?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি খাই। এতে আমার কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল নাকি?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন অসমীয়া ক্রিশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিল না, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এইরকম নানা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রসাধনা আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেছি জাতে তাঁতী।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বলতেন, তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতী নয়, বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা তিনি যে-ই হোন, এখন রাগ করাও বৃথা আপসোস করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেন না, কয়েক মাসেই জ্বরে মারা গেলেন। বছর-তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্তকাল পূর্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সবচেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল, মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র। তার বেশী নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায়—এমন মানুষ খুব কম দেখেছি, অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইল, এ হয়ত উপহাস করিতেছে। কিন্তু এ কি উপহাস? কহিল, এ-সব কি আপনি সত্যি বলচেন?

কমল একটু আশ্চর্য হইয়াই জবাব দিল, আমি ত কখনই মিথ্যে বলিনে অজিত-বাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, এ জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আপনি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজি জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে, কমল শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে চলুন ও-ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠব।

বসবেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর আমার সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না, শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথবাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর 'পরে ত আপনার জোর নেই!

কমল, কহিল না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে ত তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়িভাড়াটা এ মাসের দেওয়াই আছে, আমি তা হলে কাল-পরশু চলে যেতে পারি!

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আসবার সময় আপনার জন্যে কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিলাম। নেবেন?

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছু নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্য তা নিঃশেষ হয়েছে! কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয় না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নন।

না-ই হলাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়! আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিন না?

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেচি আমি কখনোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার অন্যথা হইবে না। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ বাড়িভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে। সহসা ব্যথার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির?

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানে না এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যাঁর কাছে এ সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্চে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা হলে আসুন, নমস্কার। এই বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট-দুই সেইখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

॥ এগার ॥

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবাবুর বসিবার ঘরে সার্সীগুলা সারাদিনই বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন. সেই কাগজের পাতায় পিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারার দিবা-নিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি ত বাবা, তা হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা-দুটো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা মোটা বালাপোশ লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাও গে,—এখনো একটু বেলা আছে কিন্তু বুঝবে বাবা কাল—

অর্থাৎ কাল তোমার চাকরি যাইবেই। কেন সাড়া আসিল না, কারণ প্রভুর এবংবিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাই ত বলি, এ কি যোদোর হাত। এমন করে পা ঢেকে দিতে ত তার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

কমল বলিল, কিন্তু এদিকে যে হাত পুড়ে যাচ্চে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেন না, বলিলেন, ওখানে নয় মা, তুমি আমার খুব কাছে এসে বসো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এমন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারী ইচ্ছে হল আপনাকে একবার দেখে আসি, তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেছো। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী-সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই,—নিতান্ত নিঃসঙ্গ জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—কমল, তোমার যখন খুশি স্বচ্ছন্দে আসিও। আর যাহার কাছেই হোক, আমার কাছে কোন সংকোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই-তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলো নীচে খসিয়া পড়িতে হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন করলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে। যেটুকু বাকী আছে তা না পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, তা ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই ত হবে, তার চেয়ে বসে দুটো গল্প করো, আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি ত আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর-সকলে রাগ করবেন যে!

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন, কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী। তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন-দুই হল তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন, মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন, ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন ত মনোরমা, কিন্তু বাকী কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হতো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশী, যেন অক্ষয়বাবুকেও হার মানিয়েছে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ দিন দু-তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

এবার কমল হাসিল, কহিল, অর্থাৎ কুশাংকুরের উপর বজ্রাঘাত! কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরের তুচ্ছ একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্যে? আমি ত কারও বাড়িতে যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা যাও না সত্যি। শহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানে না, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা

ভুলতেও পারে না মাপ করতেও পারে না। তোমার আলোচনা না করে, তোমাকে খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলা তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জানো? অক্ষয়বাবুর রচনা। ইংরিজী না হলে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নাম-ধাম নেই, কিন্তু এর আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা, তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে নাকি নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন হবে,—এ তারই মঙ্গল-অনুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলো দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নয়, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই—বিরোধ থাকতেই পারে না, কিন্তু এ ত সে নয়। ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এব আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ ত এক নয় কমল একে ত আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি ত আর এ লেখা শুনতে যাবো না,—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতাই নেই। তাই বোধ হয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেচে ভরাডুবির মুষ্টিলাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিল না, তবু তাহার ভিতরটায় কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্বলতাটুকু তাঁরা ধরেচেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

তুমিই কি পেরেচো মা?

বোধ হয় ওঁদের চেয়ে বেশী পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়োলোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয়-আশয়—

কিন্তু সে ত মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল?

কমল সহাস্যে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি—

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সমবয়সী। তোমার মুখ থেকে আমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে ত আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় আছে

নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশু বদ্যির কেউ কানাকড়ি দাম দেবে না। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, না-ই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। তার খোঁড়া-কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই দেয় কমল, তাকে বিনয় করে বলে, এই আমার ঢের। বলো গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রু নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না। এই দুজনের কোথাও মিল নাই ; শুধু অনাত্মীয়-অপরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়—শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ! কোন সম্বন্ধই যেখানে নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে ত বলতে?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না! না কেন?

কমল এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, হয়ত বাড়িতেই আছে। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসে না! হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা? বলে না। হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধ হয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না।

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরানো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার জোগাড় করচে। এই ত চলচে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরোনো অভ্যাস?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভালবেসেছে, দেশের কাজে হাজতে গেছে, বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে

সংসারী হবার ইচ্ছে, কিন্তু, সম্প্রতি বোধ হয় সেটা একটু বদলেছে। আগে মাছ-মাংস খেতো না, তার পরে খাচ্ছিলো, আবার দেখছি পরশু থেকে বন্ধ করেছে। যদু বলে, বাবু ঘণ্টাখানেক ধরে ঘরে বসে নাক টিপে নাকি যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন ?

হাঁ। চাকরটাই বলছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন ? অজিতবাবু ?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর হল সর্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল। এবং যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়াছে সে-ই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল। এবং সবাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাঁহার স্বভাব, সেই আশুবাবুর পর্যন্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা ঘরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির এখানে এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন ? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। সে সোজা পথে সোজা মতলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর্টিকেলটা পড়লেন ? বলিয়াই তাঁহার নজরে পড়িল সেই খেলাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া অক্ষয় কাগজগুলা কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ওধারের সোফায় বসিয়া সেইদিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে শুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েচি আশুবাবু। ওর অধিকাংশই সত্য, এবং মূল্যবান। দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় ত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্তব্য। ইউরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে মানি,

কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বসে তাঁদের ভ্রষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আত্মপ্রসাদের অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে বার-কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে ত তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ কথা বলে আসচেন এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করে না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার জো নেই এবং এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ-সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বলব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার ত আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি না যাই, কিন্তু এ তোমাদেরই ভাল-মন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার ত এ-প্রস্তাবে আপত্তি নেই।

অন্য সময়ে হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু, একে তার মন খারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ, সদম্ভ প্রতিকূলতার মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু? অনুকরণটা, না ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটা?

আশুবাবু বলিলেন, ধরো, যদি বলি দুটোই!

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে ফাঁক থাকে। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বৈ কি কমল, আছে। ও-রকম সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে ত কিসের মধ্যে আছে বলো ত।

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আশুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে,—কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার আদর। আসল কথা, বর্তমানকালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি না। এ ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশী নয়?

কমল বলিল, না, তার বেশী নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব

বহুদিন চলে আসচে বলেই সেই ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কৈ? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেইখানেই সত্যিকার লজ্জা আশুবাবু!

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা হলে ত সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনা সাক্ষী আছে।

তাঁহার কুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর বলে হয়ত চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাঁকে ভগবান বলেন তিনিও চিনতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিল, এ শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি:

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট্।

দেখুন হরেন্দ্রবাবু—

দেখচি। বিস্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন! কহিলেন, দ্যাখো কমল, অপরের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম, কত আদর্শ কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প, কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে। এর কিছুই ত তা হলে থাকবে না?

কমল কহিল, থাকবার জন্যেই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয় তা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনে আবার তারা নতুন রূপে, নতুন সৌন্দর্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে, বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার?

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয়বাবু।

আশুবাবু বলিলেন কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলো না কমল, বাইরের অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েছে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতে বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের জায়গা জুড়ে বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা কমল।

কমল কহিল, তা হোক। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্যদের একটি শাখা ইয়োরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেমনি যদি এদেশেও ঘটতো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব-পিতামহদের জন্যে শোক করতে বসতাম না, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত করতাম না। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিংবা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাও ত সত্য না হতে পারে। তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের দানের মধ্যে, আমারে পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয় সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাব। হিন্দু কখনো মরে না।

অক্ষম হাতের কাগজ ফেলিয়া তাঁহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল, এবং মুহূর্তকালের জন্য কমলও নির্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ উদ্দেশ্য বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে, এবং, এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল কিন্তু এবারও সে আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার ইচ্ছে হয় না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনের লজ্জা নেই,—এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুশী করতে দাতাকর্ণ নিজের পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্থ স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল,—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে

হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্মমতার পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ বলে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ! এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহুযুগের ধন!

কমল বলিল, হোক বহুযুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগত দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি! আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরি করবার সময় নেই,—পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল তখন এইভাবে পুরুষের দল নিজেদের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেচ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয় মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ কাকাবাবু। আপনি ত এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চললাম। এই বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা?

আর হয়ত আমি আসব না কাকাবাবু। এই বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

॥ বার ॥

আগ্রার নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাঁহারই যত্নে এবং তাঁহারই গৃহে নারী-কল্যাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্যোগটা একটু ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিসটা সুসম্পন্ন ত হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ মেয়েদের জন্যই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়ার নিষেধ ছিল না। বস্তুতঃ, এ আয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল, লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই পরামর্শমত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোট শালী নিলীমা ঘরে ঘরে গিয়া ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে শহরের সমস্ত বাঙালী ভদ্রমহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কন্‌কনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিল না, মালিনী নিজে গিয়া ধরিয়া আনিল! অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই-চারটা মামুলি বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ-পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য-বিষয় যেমন অরুচিকর তেমনি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালের সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারীজাতির আদর্শ-বিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইঁহাদেরই 'তথাকথিত' শিক্ষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ অক্ষয়ের গর্ব ছিল এই যে, তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পান না। সুতরাং লেখার মধ্যে সত্য যাহাই থাক, অপ্রিয়-বচনের অভাব ছিল না। এবং এই 'তথাকথিত' শব্দটায় ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছে। শেষের দিকে সে গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই শহরেই ঠিক এমনি একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে, যে ভদ্রসমাজে নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। যে স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্বলতা। উপসংহারে অক্ষয় এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সেই শিক্ষিতা নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ-লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচ-বশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে মুখে পরিব্যপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি, এই নব-প্রতিষ্ঠিত নারী-কল্যাণ-সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে, এবং এ লইয়া নারী-মণ্ডলে, পর্দার ভিতরে ও বাহিরে কৌতূহলের অবধি নাই। সুতরাং, রুচি ও নীতির সম্যক বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্নমালার প্রখরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়বাবুর এই লেখার আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচি বিস্টলি এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হেয়। নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধ-লেখককে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা-খুশী তাই বলিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিস্ট এবং ব্রুট বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এইপ্রকার বাক-বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেই উত্তেজনার মুখে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ-পাঠের গোড়া হইতেই সেই যে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিলেন না। আরও একটি মানুষ তর্কযুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না, ইনি হরেন্দ্র-অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনায় নিত্য-অভ্যস্ত অবিনাশ।

ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের ভাল-মন্দ নিরূপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয় এবং এ প্রকার আলোচনায় নর-নারী কাহারও কল্যাণ হয় না, মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশ বোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে নিজের আসন ছাড়িয়া আসিয়া এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পাশে বসিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে নিরর্থক আজ আপনার শান্তি নষ্ট করার জন্যে আমি দুঃখিত আশুবাবু।

আশুবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বাড়িতেও ত আমি একাই বসে থাকতাম, তবু সময়টা কাটল।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু থামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর সব মেয়েরা?

তাঁরাও আজ এখানেই খাবেন।

অবিনাশ ও অজিতকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবু গাড়িতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদেরও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রাজী হইতে হইল, সমস্ত পথটা আশুবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ্য করিয়া মেয়েদের

মাঝখানে অক্ষয় তাঁহাকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ি আসিয়া বাসায় পৌঁছিল। নীচের বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিল, বোম্বাইওয়ালার মত তাহার পোশাক, কাছে আসিয়া আশুবাবুকে ইংরাজীতে অভিবাদন করিল।

কি?

জবাবে সে এক টুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন, অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া দেখিয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের? কি লিখেচে কমল?

লিখেচে, পত্রবাহকের মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসু-মুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র আর কাহারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আশুবাবু সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তাঁর আত্মীয় নই, বস্তুত, সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাব কিসের জন্যে!

গাড়ির উপর হইতে অক্ষয় কহিল, Just like her!

কথাটা সকলেরই কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জন্যে জামিন হলে—

আশুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল—বলিলেন, জামিন হওয়ার গরজ আমার নয়। তাঁর স্বামী আছে, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্মিত হইল, বলিল, তাঁর স্বামীর কথা ত শুনিনি।

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night, এস অজিত, আর দেরি করো না। এই বলিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরের গাড়ি-বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ড্রাইভারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কুঠিতে গাড়ি পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বস। মজা দেখলে একবার?

এ কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুতঃ, তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তিপ্রিয়তা ও চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার এই মুহূর্তকাল পূর্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কমল তাহার

নির্জন নিশীথ গৃহকক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী-জীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই নারী-কল্যাণ-সমিতি উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শপন্থী অক্ষয় নারীত্বের আদর্শ-নির্দেশের ছলনায় যত কটূক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাক, অজিত দুঃখবোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি, অক্ষয়ের ক্রোধান্ধ বর্বরতায় যত তীক্ষ্ম শূলই থাক, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন, তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল। কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভাল সে বলে না। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের সুতীব্র নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাবই পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। সে বলে, ভদ্রসমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করার অপরাধ স্পর্শে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল! দুর্দশাপন্ন, ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়টা টাকার ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যে সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্রের সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেই সকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি—তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজার সাহেবের গৃহে তাহার জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অরুচিকর। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? গোপন করিলেই বা ক্ষতি কি হইত? কিন্তু, দুনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা-খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদি বা পড়িয়াছে, গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য। দৈবক্রমে তাহারই মুখে সে প্রথম সংবাদ পাইল যে শিবনাথ কোথাও যায় নাই, এই শহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের 'পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাটমহিষী মমতাজের স্মৃতিসৌধের তীরে বসিয়া যে কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখলে ত অজিত? আমি নিশ্চয় বলচি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল।

অজিত কহিল, না-ও হতে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে! কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ খবর ত সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে ত ঢের বেশী অন্যায়। স্বামীকে লুকোনো ত ভাল কাজ নয়।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত বা তাঁর মতের বিরুদ্ধে পরের কাছে টাকা ধার করতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কত বড় অন্যায় বল ত? এ কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অজিত কহিল, তিনি টাকা ত চাননি, শুধু জামিন হতে অনুরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয় পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্য? সত্যিই ত আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধ হয় কাউকেই ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না না, কথাটা ঠিক ওভাবে আমি বলিনি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটাকে হঠাৎ ঝোঁকের উপর বিদায় করা পর্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারী একটা গ্লানি চলিতেছিল, কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল, সোজা নিজে এসে ত নিয়ে গেলেই হত। খামকা একটা বাইরের লোককে সকলের সামনে পাঠানোর কি আবশ্যকতা ছিল? আর যাই বল, মেয়েটির বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেহারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে, জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিশ্রী চেহারা—মনিলেন্ডার কিনা। ফিরে গিয়ে হয়ত নানান্‌খানা করে বানিয়ে বলবে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবে না আশুবাবু, সত্যি বললেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, এই অক্ষয় লোকটা একেবারে নুইসেন্স। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ কর না অজিত। বদুকে ডেকে ঐ দেরাজটা খুলে দেখ না কি আছে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো টাকা,—আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধ হয় তাদের বাসাটা চেনে—শিবনাথকে মাঝে মাঝে পোঁছে দিয়ে এসেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েই গেছে, আজ রাত্রে থাক, কাল সকালে বিবেচনা করে দেখলেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোঝ না অজিত, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সে রাত্রেই কখনো লোক পাঠাতো না।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ি নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন ফিরবে তারও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই শুনতে

পাবেন। তার পরে আর টাকা পাঠান উচিত হবে না আশুবাবু। বোধ হয় আপনার হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেন না।

কিন্তু এ ত তোমার শুধু অনুমান মাত্র অজিত।

হাঁ, অনুমান বৈ আর কি।

কিন্তু বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন ত এর চেয়েও বড় হতে পারে?

তা পারে, কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে?

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-ও ত শুধু তোমার অনুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অনুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন না, কেবল বেদনায় দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

॥ তের ॥

নারী-কল্যাণ-সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, মুখুয্যে মশাই, কমলকে আমি একবার দেখব আমার ভারী ইচ্ছে করে তাকে নেমতন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস ত কম নয় ছোটগিন্নী ; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমতন্ন করা !

কেন, সে বাঘ না ভালুক ? তাকে এত ভয়টা কিসের ?

অবিনাশ বলিলেন, বাঘ-ভালুক এদেশে মেলে না, নইলে তোমার হুকুমে তাদেরও নেনতন্ন করে আসতে পারি, কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করিনে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ করিয়া বলিল, না, সে হবে না। তুমি না যাও আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আহবান করে আসব।

কিন্তু আমি ত তাদের বাসাটা চিনিনে।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি তোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, তোমাদের মুখে যা শুনি তাতে শিবনাথবাবুরই দোষ,— তাঁকে ত আমি নেমতন্ন করতে চাইনে। আমি চাই কমলকে দেখতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ! কমল যদি আসতে রাজী হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী—তিনিও বলেচেন আসবেন। বুঝলে ?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন না। অথচ বাধা দিতেও ভরসা পাইলেন না। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তাই নয়, মনে মনে ভয় করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ করে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান মলে দেবে। বাসায় ত থাকো শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে—তোমার ভয়টা কিসের ?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে,—কিন্তু করতে হবে কী ?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখব, আলাপ করব, ঘরে এনে খাওয়াব। তুমি

কি ওদের বাসা চেন ? আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে নেমতন্ন করে আসতে হবে। কখন যেতে পারবে বল ত ?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা ? সেজদা ? ওঁর অভিপ্রায়টা কি ? এই বলিয়া সে বারান্দার ওধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া পাইয়োনিয়ার পড়িতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন সমস্তই, কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ওঁর অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন, আমার কাজ নেই। আমি ওঁর শালী, শালীর বোন নই যে পতি-পরম-গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন করবেন। আমার যাকে ইচ্ছা খাওয়াব। ম্যাজিস্ট্রেটের বৌ বলেছেন খবর পেলে তিনিও আসবেন। ওঁর ভাল না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবে না হরেন। কালকের ব্যাপারটা মনে আছে ত ? আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিল না। এবং, পাছে সেই লজ্জাকর টাকার কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং নীলিমার কানে যায়, সেই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুন না বৌদি, আমার বাসাতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনুন। আপনি হবেন গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মীছাড়ার গৃহে একদিন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলেগুলোও দুটো ভালোমন্দ জিনিস মুখে দিয়ে বাঁচবে।

নীলিমা অভিমানের সুরে বলিল, বেশ—তাই হোক ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোঁটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাব।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ কেলেঙ্কারী তা হলে আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়তই দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এই ঢের ভাল শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে, কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ি করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল যে, কষ্ট করিয়া আর যাবার প্রয়োজন নাই। কাল রাত্রে-খাবার কথা তাঁকে বলা হইয়াছে—তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফেরবার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাক্স। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওটা ? কোথায় যাচ্চেন ? বললেন, যাচ্চি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয় দিয়ে বললাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমতন্ন করেচেন। নিতান্তই মেয়েদের যে। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, কথা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজের ব্যাপার, যেতে হবে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আসবেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন

আছে কি? একটুখানি হেসে বললেন, না। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু একলা ত যেতে পারবেন না, কাল কখন এসে আপনাকে নিয়ে যাব? শুনে তেমনি হাসতে লাগলেন। বললেন, একলাই যেতে পারব,—অবিনাশবাবুর বাসা আমি চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভাল। ভারী নিরহঙ্কার।

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতে-ছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথায় মোটা বাক্সটা? তার ইতিহাস ত প্রকাশ করলে না ভায়া?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞাসা করিনি।

করলে ভাল করতে। বোধ হয় বিক্রি কিংবা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, হতেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারী-কল্যাণ-সমিতিকে অক্ষয়ের প্রবন্ধ শুনেছেন ত? আমরা লোকটাকে ব্রুট্ বলি। কিন্তু, ও বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি বুদ্ধি থাকলে সমাজে অনায়াসেই সাধু-সজ্জন বলে চলে যেতে পারত—কি বলেন সেজদা? ঠিক না?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জন করিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হে, নিত্যানন্দ-শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু! এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও গে যাও।

চেষ্টা করব। কিন্তু চললাম বৌদি, কাল আবার যথাসময়ে হাজির হব। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতেই কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে - সে কোনমতেই আসিবে না জানিয়া আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালীনীকে খবর পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আসলেন না।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যান-বাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামা কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য হইলেন। দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল।

কমল বলিল, কারণ, খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে তুমি বল। কাজটা ভাল হয়নি কিন্তু—ছোটগিন্নী, ইনিই কমল! আর একটা নাম শিবানী। এঁকে দেখবার জন্যেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। এসো,

বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবে চল। যোগাড় বোধ হয় তোমার সমস্ত হবে গেছে? তা হলে অনর্থক দেরী করে লাভ হবে না,—ঠিক সময়ে আবার ওঁর বাসায় ফিরে যাওয়া চাই ত?

এ-সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয় না; প্রত্যাশাও থাকে না।

হরেন্দ্র আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময়ে জুটতে পারিনি বৌদি, ত্রুটি হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন, তাঁকে যথোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হল। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া মুহূর্তকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েছে, কিন্তু এ-সব আমি খাইনে।

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্যান্ন বলেন—আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নিলিমা অবাক হইল, কহিল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এ-সব খাইনে বলেই অভাবটাও আবার কম। আপনি কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু মনে না করিলে চলে না। নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, না খেলে এত জিনিস যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিল, কহিল, যা হবার তা হয়েছে,—সে আর ফিরবে না। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্যেও কি নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটিমাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না। কিন্তু ইহার দৃঢ়তা যে কত বড়—তাহা পৌঁছিল হরেন্দ্রর কানে। শুধু সে-ই বুঝিল ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্ত্রীর দিক হইতে অনুরোধের পুনরুক্তির সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক বৌদি, আর না। খাবার আপনার নষ্ট হবে না, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেঁছে-পুঁছে খেয়ে যাব, কিন্তু ওঁকে আর নয়। বরঞ্চ, যা খাবেন, তার যোগাড় করে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না ঠাকুরপো, তুমি থাম? এ ঘাস নয় যে তোমার একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় ফেলে দেব—তবু তাদের খাওয়াব না।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ কিসের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্যেই ত তোমার যত দুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জন কম কর না। এতদিনে বৌ এলে ত ছেলেপুলের ঘর ভরে

যেত। এ হতভাগা কাণ্ড ত ঘটত না! নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্তিক, দলটিও তৈরি হচ্চে তারই উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতেই খাওয়াব না—এই তোমাকে আমি বলে দিলাম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

কমল বুঝিতে কিছুই পারিল না, আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিসটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটি-কয়েক ছাত্র আছে আমার, তারা আমার কাছে থেকে ইস্কুল কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ওঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? কৈ, এ ত এতদিন শুনিনি!

হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মত কিছুই নয়। কিন্তু চরিত্রবান ভাল ছেলে তারা। তাদের আমি ভালবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ, গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখতে? দেখলে খুশী হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি—যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাশী বেড়াতে; তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তাদের দেখলে আপনি খুশী হবেন।

অবিনাশ সেইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠল? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস হরেন!

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্যায় মুখুয্যেমশায়। ঠাকুরপো ত তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসেন নি যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্চ? নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বলে না। বরঞ্চ, যারা বলে—তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন হাসিয়া বলিল, বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করছিলেন—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে মেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা কহিল, আমি বলেছিলাম রাগে। কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়! ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তার পরে যেন পরকে বলতে যান।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা ত সবাই ইস্কুলে-কলেজে পড়েন?

হরেন বলিল, হাঁ, প্রকাশ্যে তাই বটে।

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশ্যে কি-সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চা করা হয়, সেটাও অম্‌নি খুলে বল?

শুনিয়া সবাই হাসিল। নীলিমা অনুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখুয্যে-মশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ওঁর বিচার করে নেবেন না। মাঝে মাঝে মাথা ওঁর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হতো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই স্নিগ্ধ পরিহাস-টুকুর পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুনঠাকুর আসিয়া জানাইল, কমলের খাবার তৈরি হইয়া গেছে। অতএব, এখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা-দুই পরে আহারাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন—কমল তখন পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না করুক, কলেজের পড়া মুখস্থ করা ছাড়াও ত কিছু করে,—সে কি?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হতে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই। কিন্তু পায়ের ধুলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বলব আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানেব আতিশয্যে অবিনাশের গা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বলতেই বা বাধা কি ঠাকুরপো; তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙলে কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মত করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিচ্চ এ কথা জানাতে দোষ কি? তোমার কাছে ত আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলাম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও ত বলচি নে বৌদি, বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল। কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহানুভূতি নেই?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কি, না জানলে ত বলা যায় না হরেনবাবু। কিন্তু পুরাকালের ছাঁচে তৈরি করে তোলাটাই যে সত্যিকারের মানুষের ছাঁচে গড়ে তোলা এও ত যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই যে আমাদের ভারতের আদর্শ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শই যে চিরযুগের চরম আদর্শ—এই বা কে স্থির করে দিলে বলুন?

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হতে পারে কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্বপিতামহগণের আদর্শ। ভারতবাসীর এই নিত্য-কালের লক্ষ্য—এই তাদের একটিমাত্র চলবার পথ। হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু সে এই লক্ষ্যই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানিনে কেন মানুষের এ ভুল হয়। নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারতবাসীকে

চোখে দেখতেই পায় না। আরও ত ঢের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন?

অবিনাশ কুপিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক তারা। আমার কাছে এ আবেদন নিষ্ফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শ-ই স্পষ্ট করে দেখতে পেলে যথেষ্ট মনে করব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশবাবু। নইলে এতবড় অন্ধ ভাবতে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এমনি করেই ভাবে। সেদিন অজিতবাবুর সুমুখেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী,—আজও মনে মনে হয়ত তাই আছেন,—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতেছিলেন, কিন্তু কমল সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেচি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? না-ই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা বলচ, নিজে তার অর্থ বোঝ না। এতে মানুষের সর্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবে না অবিনাশবাবু, যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিল, এ-সব নিছক শিবনাথের কথা।

কমল কহিল, তা ত জানিনে—তিনিও এ কথা বলেন।

এবার অবিনাশ আত্মবিস্মৃত হইলেন। বিদ্রূপে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জান। কথাগুলি মুখস্থ করেচ। আর জান না কার?

তাঁহার এই কদর্য দৃঢ়তার জবাব কমল দিল না, দিল নীলিমা। কহিল, কথা যারই হোক মুখুয্যেমশায়, মাস্টারিগিরি কাজে কড়া কথার ধমক দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন করায় লজ্জা আছে। কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ি ডাকতে পাঠাও না ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে ত আর ভয় নেই। এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, মুখুয্যেমশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠচে—তাতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হবে না।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ ত, তোমরা বসে গল্প কর না, আমি শুতে চললাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আনতে গেলে কিন্তু না বলতে পারবেন না।

কমল সহাস্যে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেনবাবু? না-ই বা গেলাম?

না, সে হবে না। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নই। নিতান্তই সাদা-সিধে গেরুয়াও পরিনে, জটা-বল্কলও ধারণ করিনে। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গেই মিশে আছি।

কিন্তু সেও ত ভাল নয়! অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা আর একরকমের জোচ্চুরি। বোধ হয় অবিনাশবাবু একেই বলেছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরঞ্চ জটা-বল্কল-গেরুয়া ঢের ভাল। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই—হটতেই হবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভাল বলেন না? পারি, আর না পারি, এর আদর্শ কত বড়।

কমল কহিল, তা বলতে পারব না হরেনবাবু। সমস্ত সংযমের মত যৌন-সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর একধরনের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিক ক্ষীণ হয়ে আসে। বেশ, আমি যাব আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে,—না গেলে আমি ছাড়ব না। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই—ঘটা করে আমরা কিছুই করিনে। সহসা নীলিমাকে দেখাইয়া কহিল, আমার আদর্শ উনি। ওঁর মতই আমরা সহজে পথিক। বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ ওঁতে নেই,—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি ওঁর দুসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, ওঁর কঠোর আত্মশাসন!

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করে না, কিন্তু বলুন ত—নারীত্বের এতবড় মহিমা, এতবড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহের উনি গৃহিণী, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর ন্যায়। এ-বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব ওঁর উপরে। অথচ, কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবারা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে?

কমলের মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালটা কি আছে হরেনবাবু? অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ

জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভাল হয়ে উঠবে কিসের জোরে?

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং নীলিমা আশ্চর্য দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্যে লোকে একে যত গৌরবান্বিতই করে তুলুক, গৃহিণীপণার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই। এই গৌরব ছাড়াই ভাল।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ ত আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার ত ওঁর নিজের নয়—হলে এ উপদেশ দিতাম না। অথচ, এমনি করেই কর্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি, এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানের হরিশবাবুর কথা মনে পড়ে। ষোল বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মারা গেল—তাকে বাড়িতে এনে নিজের একপাল ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বললেন, লক্ষ্মী দিদি আমার, এখন এরাই তোর ছেলে-মেয়ে। তোর ভাবনা কি বোন, এদের মানুষ করে, এদের মায়ের মত হয়ে এ বাড়ির সর্বেসর্বা হয়ে আজ থেকে তুই সার্থক হ—এই আমার আশীর্বাদ। হরিশবাবু ভাল লোক, বাগানময় তার ধন্য ধন্য পড়ে গেল,—সবাই বললে, লক্ষ্মীর কপাল ভাল। ভাল ত বটেই। শুধু মেয়েমানুষেই জানে এতবড় দুর্ভোগ, এতবড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র কহিল, তার পরে?

কমল বলিল, পরের খবর জানিনে, হরেনবাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারিনি, আগেই চলে আসতে হয়েছিল; কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ি এসে দাঁড়াল। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব। নমস্কার। এই বলিয়া সে একমুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল।

॥ চৌদ্দ ॥

'আশ্রম' শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে-ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্যায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা-খরচায় স্কুলে পড়াশুনা করিতে পায়—ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অতবড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিল না। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্যভাবে। কিন্তু এ-সকল জিনিসের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির বিরাম থাকে না। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয় না। হইলও তাই। এ বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাই-বোন ছিল না। পিতা ওকালতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেনের বিধবা মা। তিনিও পরলোকগমন করিলেন। ছেলের তখন লেখাপড়া সাঙ্গ হইল। অতএব, আপনার বলিতে এমন কেহই আর রহিল না যে তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিংবা উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। এতএব, পড়া যখন সমাপ্ত হইল তখন নিতান্ত কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধুসঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাঙ্কের জমানো সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতি গঠন করিল, বন্যাপ্লাবনে আচার্যদেবের দলে ভিড়িল, মুক্তি-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা-খোঁড়া নুলো-হাবা-বোবা ধরিয়া আনিয়া সেবা করিল,—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভালো লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, টাকা দাও, পরোপকার করি। বাড়তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে হাত না দিলে আর চলে না,—এমনি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হউক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকী আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এ খবর সেইদিন সে প্রথম পাইল। অবিনাশদের কলেজে তখন মাস্টারি একটা খালি ছিল, চেষ্টা করিয়া সেই কর্মে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এ দেশে আসিবার ইহাই তাহার ইতিহাস! পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন শহর গুলোর সাবেককালের অনেক বড় বড় বাড়ি এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র যোগাড় করিয়া লইল। তাহার আশ্রম।

কিন্তু এখানে আসিয়া যে-কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল—

তাহারই অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। এই মেয়েটি অচেনা লোক বলিয়া একটা দিনের জন্যও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন কি চাই, ঠাকুরপো, আমাকে জানাতে লজ্জা করো না। আমি বাড়ির গিন্নী নই—অথচ গিন্নীপনার ভার পরেছে আমার ওপর। তোমার দাদা বলছিলেন, ভায়ার অযত্ন হলে মাইনে কাটা যাবে। গরীব মানুষের লোকসান করে দিয়ো না ভাই। দরকারগুলো যেন জানতে পারি।

হরেন কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জায় সে এমনি জড়সড় হইয়া উঠিল যে, এই মিষ্ট কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাহার মুখের দিকেও চাহিতে পারিলে না। কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন-দুয়ের বেশী লাগিল না। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই,—এমনি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেমনি সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাঁহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নাই—তিনিও যে এ বাড়িতে পর—এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজসজ্জায়, তাহার রহস্য-মধুর আলাপ-আলোচনায় ধরিবার জো নাই, তেমনি এইগুলাই যে তাঁহার সবটুকু নহে এ কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাম্ভীর্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দায়,—এমনি হালকা তাঁহার হাসি-খুশির মেলা, অথচ একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাঁহাকে অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না- বাটীব মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আবহাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রর সপ্তাহ-দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আটকাচ্ছিল?

হরেন্দ্র সলজ্জে কহিল, একদিন ত যেতেই হত বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হত। কিন্তু দেশসেবার নেশার ঘোর তোমার এখনো চোখ থেকে কাটেনি ঠাকুরপো, আরও দিন-কতক না হয় বৌদির হেপাজতেই থাকতে।

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাকব বৌদি! এই ত মিনিট-দশেকের পথ——আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব কোথায়?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নমে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাসনে আর কোথাও, এইখানে থাক। কিন্তু সে কি হয়? ইজ্জত বড়—না দাদার কথা বড়! যাও আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও গে। ছোটগিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হল চড়কের সন্ন্যাসী—পিট ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর বামুন রাখিয়া অতিশয় শান্তশিষ্ট নিরীহ মাস্টারের ন্যায় কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়িতে অনেক ঘর। গোটা-দুইঘর ছাড়া বাকী সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাস-খানেক পরেই এই শূন্য ঘরগুলো তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ কাজে লাগে না। অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। সে ছিল তাহার দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সমিতির সেক্রেটারি। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর-দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ-ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধু বান্ধবগণের সন্ধানে ফিরিতেছিল। হরেনের চিঠি এবং ট্রেনের মাশুল পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন্দ্র কহিল, দেখি যদি তোমার একটা চাকরি-বাকরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অন্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলার কোন একটা গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার সাধুসংকল্প মুলতবী রাখিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং একাকী আসিল না, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সতীশ এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্রবচনের জোরে নির্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, ভারতবর্ষই ধর্মভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এ দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং বর্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অসংখ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় ত এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীশের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিল না; সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য সে মনে মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল। এবং ইতিপূর্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই, এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ববাদিসম্মত ভাল ভাল কথা জানিত; কয়েকদিন ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্ব-পিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী। আর্যরক্ত-সম্ভূত কোন্ পাষণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারে না, এবং পারিবার মত দুর্মতিপরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিল না।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল। কিন্তু, ইহা তপস্যা এবং সাধনার বস্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সে শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হরেন্দ্রের চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্তি হইল,—এইরূপে, অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরের লোকে বিশেষ কিছু জানিতও না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। শুধু এইটুকুই সকলে ভাসা-ভাসা রকমের শুনিতে

পাইল যে, হরেন্দ্রের বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলেরা লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিত না, নীলিমাও না।

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ-মাংস আসিবার জো নাই, ব্রহ্মমুহূর্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিল না, সাধন-মার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল,—অতএব এ কাজগুলাও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠে না; ছেলেদের পড়াশুনা গেল—ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাধা-নিয়মের শৈথিল্য ঘটিল না—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল—বাহিরের কোথাও আহারের নিমন্ত্রণ জুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া বহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোন মার্জনা ছিল না। ছেলেদের খালি পা, রুক্ষ মাথা, পাছে কোথাও কোনও ছিদ্রপথে বিলাসিতা অনধিকার-প্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি-সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ প্রহরা দিতে লাগিল। মোটামুটি এইভাবেই আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের ত কথাই নাই, হরেন্দ্রের মনের মধ্যেও শ্লাঘার অবধি রহিল না। বাহিরে কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ত পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেকেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ত এ জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিত না. বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটা বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে, রাজেনের আচরণ পূর্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয় না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, শরীর ভাল নাই। অথচ, শরীর ভাল না থাকার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কি তাহার নালিশ, কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসে না, রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে তখন এমনি তাহার চেহারা যে, কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয় না। অথচ এ-সকল একান্তই আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার জো নাই—এ কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করে না। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলারক্ষার ভার তাহারই উপরে। এই-সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তাহা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আভাসে-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না—ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন নিজেও যেন না বুঝিত তাহা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিল না। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই,—

সকালে যখন সে বাড়ি ফিরিল তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতেছিল। হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি রাজেন, কাল ছিলে কোথায় ?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, একটা গাছতলায় পড়ে ছিলাম।

গাছতলায় ? গাছতলায় কেন ?

অনেক রাত হয়ে গেল—আর ডাকাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গালাম না।

বেশ। অত রাত্রিই বা হল কেন ?

এমনি ঘুরতে ঘুরতে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত ?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল—গ্রাহ্য করলে না, আর আমি জানব কি করে ?

তাই ত হে, এতটা ত ভাল নয়।

সতীশ মুখ ভারী করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি ত একটা কথা জানেন, পুলিশে ওকে দুই বছর জেলে রেখেছিল ?

হরেন বলিল, জানি, কিন্তু সে ত মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর তো কোন সত্যিকার দোষ ছিল না।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সুদৃষ্টি ওকে আজও ছাড়েনি।

হরেন কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি, ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে রাজেন ভগবান পর্যন্ত বিশ্বাস করে না ?

হরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, কৈ না !

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করে না। আশ্রমের কাজকর্ম, বিধিনিষেধের প্রতিও তার তিলার্থ শ্রদ্ধা নেই। আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকরি-বাকরি করে দিন।

হরেন্দ্র কহিল, চাকরি ত গাছের ফল নয়, সতীশ, যে ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেব। তার জন্যে চেষ্টা যথেষ্ট করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা হলে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট এবং আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্তব্য। আপনি অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে এতদিন আমার প্রবৃত্তি হয়নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়াও আমি কর্তব্য মনে করি।

হরেন মনে মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নির্মল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। এদিক দিয়ে অতবড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারে না। রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ কথা ভাববারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করিনি, সে স্বাভাবিক রকমের নির্মল, কিন্তু—

হরেন প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিন্তুটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। ও তখন ক্যাম্‌বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং বাসায় বি. এস-সি পড়ত। সবাই জানত ও-ই ফার্স্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে হঠাৎ কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি ডাক্তারি পড়ত নাকি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন কলেজে থার্ড-ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাস্টাররাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসীমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তার পরেই বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর-দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন পিসীমা তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ক্লাসে প্রত্যেক বিষয়েই ও ফার্স্ট হচ্ছিল, অথচ বছর-তিনেক পরে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে! ওই এক ছুতো—ভারী শক্ত, ও আমি পেরে উঠবো না। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বললে, ছেলে পড়িয়ে বি. এস্‌-সি, পাস করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাস্টারি করে কাটাব। আমি বললাম, বেশ তাই কর। তার পরে দিন-পনর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই,—এমনি পড়াই পড়লে যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সবাই বললে, এ না হলে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে।

হরেন এ-সব কিছুই জানিত না,—রুদ্ধনিঃশ্বাসে কহিল, তার পরে!

সতীশ কহিল, তারপরে যা আরম্ভ করলে সেও এমনি অদ্ভুত। বই আর ছুঁলে না। কোথায় রইল তার খাতা পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট্ বুক—কোথায় যায়, কোথায় থাকে, পাত্তাই পাওয়া যায় না। যখন ফিরে আসে তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্যন্ত ছিল না।

তার পরে?

তার পরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়িময় যেন দক্ষযজ্ঞ শুরু করলে। এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, ওটা খোলে, একে ধমকায়, তাকে আটকায়—সে বস্তু চোখে না দেখলে অনুধাবন করার জো নেই। বাসার সবাই কেরানী ভয়ে

দুজনের সাঁদগাম হয়ে গেল—সবাই ভাবলাম আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ আমাদের সবাইকে ধরে বোধ হয় ফাঁসি দেবে ।

তার পরে ?

তার পরে বিকেল নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাকে ধরে নিয়ে তারা বিদায় হল। আমাকে দিলে দিন-চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আর পাওয়া গেল না। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান স্টেপ্ ! ওন্‌লি ওয়ান্ স্টেপ্ ! তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান্ স্টেপ্। গো। গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বললে, সতীশ, তুমি ভাগ্যবান। অফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দু মাসের মাইনে হাতে দিয়ে বললেন, গো। শুনলাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ-তল্লাশিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। সে আমার বন্ধু।

হরেন খুশী হইল না, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মত।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে, তারা আমাকে বিনা-দোষে লাঞ্ছনা করেচে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েছে।

হরেন বলিল, বিনা-দোষে লাঞ্ছনা করাটাও ত আইন নয়। যারা তা পারে, তারা এ-ই বা পারবে না কেন ? এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারী অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে, পাছে, তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া যায়। হরেন স্থির করিল, ব্যাপারটা সত্যই হউক, বা মিথ্যাই হউক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোনমতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে, তখন কোথাও চাকরি করিয়া দিয়া হোক বা যে-কোন অজুহাতে হোক, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিন-কয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্বোপলক্ষে দুদিনের ছুটি ছিল। সতীশ কাশী যাইবার অনুমতি চাহিতে আসিল ! আগ্রা আশ্রমের অনুরূপ আদর্শে ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রর মনের মধ্যে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল, হরেনদা, ওর সঙ্গে আমিও দিন কতক বেড়িয়ে আসি গে।

হরেন বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্চি। যাবার গাড়ি ভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার ?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল।

হরেন বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারিনি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বলবার প্রয়োজন নেই হরেনদা, সে আমি জানি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়িতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন। এবং বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিন-দশেক পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিল। হরেনকে নিভৃতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্ল মুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েছে হরেনবাবু। কাশীতে আশ্রম স্থাপনের জন্যে এ কদিন রাজেন অমানুষিক পরিশ্রম করেচে।

হরেন কহিল, পরিশ্রম করলে ত সে অমানুষিক পরিশ্রমই করে সতীশ।

হাঁ, তাই সে করেছে। কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের এই নিজেদের আশ্রমটুকুর জন্যে করত!

হরেন আশান্বিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিসটি ধরতে পারেনি। আমি নিশ্চয় বলচি, তুমি দেখতে পাবে এখন থেকে ওর কর্মের আর অবধি থাকবে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেছি জানো? আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখলে আর চলবে না। দেশের এবং দশের সহানুভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এবং বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক।

সতীশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজে বাধা পাবে না?

হরেন বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখতে আসবেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিশুদ্ধতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আসবেন?

হরেন বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশদা, বৌঠাকরুন। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই,—শুনলাম জয়পুরে গেছেন কার্যোপলক্ষে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেছ—তিনিও আসবেন; এবং শরীর সুস্থ থাকলে হয়ত আশুবাবুকেও ধরে আনতে পারব। জান ত, কেউ এঁরা যে-সে লোক নন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কহিল, আশীর্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—আসিলেন না শুধু আশুবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন্দ্র অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে। আপনি যাঁদের লক্ষ্মীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্নাশালায়। আজ আমাদের পর্বদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলে উনান জ্বালিতেছিল এবং সেই বয়সের আর একটি ছেলে বঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলেটিকে স্নেহের, কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্লমুখে কহিল, আজ রবিবার আমাদের আলুর-দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর-দম? ডাল কিংবা ঝোল, কিংবা আর কিছু—

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমে একটার বেশী হবার নিয়ম নেই।

হরেন হাসিয়া কহিল, হবার জো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এই ভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী-চাকরও নেই বুঝি?

হরেন কহিল, না। তাদের আমলে আলুর-দমকে বিদায় দিতে হবে। ছেলেরা সেটা পছন্দ করবে না।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিল না, ছেলে দুটির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই এ কথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সইতে পারবেন না। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত—শুধু আপনিই বুঝবেন এই সার্থকতা তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আপনাকে সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হরেন্দ্রর গভীর ও গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের কথা আলাদা, কিন্তু এই-সব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চার নাম কি মানুষ-গড়া হরেনবাবু? এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন,—মিথ্যে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে দেবেন না।

তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল। অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি হরেন।

কমল লজ্জা পাইল, কহিল, আমাকে সত্যিই কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে কারও মধ্যে আমি নই কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবে না। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে। দেখি, ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজী বা'র হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধ হাস্যের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত। সাবেককালের কারুকার্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিদ্যমান। বসিবার জন্য একখানা বেঞ্চ ও গোটা-চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ তাহাতে বসে না। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে সাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে, মাঝখানে তাঁহারই বাড়ির লতাপাতা-কাটা বারো ডালের সেজ এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ রঙের ফানুসে ঢাকা দেওয়ালগিরি এক কোণে জ্বলিতেছে; নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্য হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুশী হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ! বাঁচা গেল।

হরেন মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, এই ত মুশকিলে ফেলালি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েচেন, ওঁর সুমুখে কোন-কিছুকে ভালো বলতে সাহস হয় না—হয়ত সুতীক্ষ্ম প্রতিবাদের জোরে এখুনি সপ্রমাণ করে দেবেন যে, এর ছাদের নকশা থেকে মেঝের গালচে পর্যন্ত সবই মন্দ। এই বলিয়া তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর কোন সম্বল না থাক কমল, অন্ততঃ বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেচি এ তুমিও মানবে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা আজ বলে রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য-মাত্রই সত্য নয় কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিখিয়েছে, শিবনাথ কেবল এইটি দেখচি সে সেখাতে বাকী রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ত্রুটি হয়েছে মুখুয্যেমশাই, তাঁকে জরিমানা করে আমরা তার শোধ দেব।

কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়। তাই প্রার্থনা করি, তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু-একটা প্রিয়বাক্য বার কর—আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্যেই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ম ফলাটুকু লুকানো ছিল, তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি-একপ্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়কুটা ধুলাবালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখে-মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প একটুখানি নড়া-দাঁতের মত, চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারিনে, হরেন, তোমার বৌদি নিতান্ত মিথ্যে বলেন নি—আমাকে চিনতে ত তাঁর বাকী নেই—ঠিকই জানেন আমার পুঁজিপাটা সেই সেকেলে সোজা ধরনের, তাতে বস্তু থাকলেও রস-কস নেই।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝবে না। কিন্তু ছোটগিন্নী হঠাৎ যে-রকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন, তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ওঁর আপনি পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্ধায় আরও কি-একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল। ক্ষুণ্নকণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি। কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম, এ কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না?

নীলিমা বলিল, তা হলে আমার সম্বন্ধেও দয়া করে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো, যে কাউকে ছোটগিন্নী বলে ডাকতে থাকলেই সে সত্যিকার গৃহিণী হয়ে যায় না। তাকে শাসন করার মাত্রা-বোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখুয্যেমশায়ের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ঘরে এইটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক—ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

হরেন্দ্র হাত জোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকী রইল এখন থাক, বাড়ি ফিরে গিয়ে সমাধা করে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। যে ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলাম না, তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘটলো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন জিজ্ঞাসা করিল, অজিত-বাবু, শুনলাম কাল নাকি আপনি বাড়ি যাবেন?

কিন্তু আপনি শুনলেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আনতে গিয়েছিলাম, তিনিই বললেন, কাল বোধ হয় আপনি বাড়ি চলে যাচ্চেন।

অজিত কহিল, বোধ হয়। কিন্তু সে কাল নয়, পরশু। এবং বাড়ি কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত, বিকেল নাগাদ স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হব,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে-কোন দিকের গাড়ি পারো তাতেই এ যাত্রা শুরু করে দেব।

হরেন সহাস্যে কহিল, অনেকটা বিবাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আসবার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দেশ নেই।

হরেন কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক। কিন্তু তল্পি বইবার লোকের দরকার হয় ত আমি একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেন না।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয়ত আমিও একজনকে দিতে পারি, রাঁধতে যার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন. হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।

অবিনাশের কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল না, বলিলেন, হরেন, আর দেরি কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক না, কি বল?

হরেন সবিনয়ে কহিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেন না? দুটো উপদেশ তাদের দিয়ে যাবেন না সেজদা?

অবিনাশ কহিলেন, উপদেশ দিতে ত আমি আসিনি, এসেছিলাম শুধু ওঁদের সঙ্গী হিসেবে। তার বোধ হয় আর দরকার নেই।

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল! দশ-বারো বছরের বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা. কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই,—জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এ-সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটা সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাহাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে, নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে পারে,আজ এদের সেই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন।

হরেন কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন করব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি কিছু শুনবো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও দ্বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল. আমি ত বক্তৃতা দিতে পারিনে, হরেনবাবু।

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ। দেশের কাজে যা তাদের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, শুধু তাই

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন. আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই তো দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা ত সকলের এক নয়! আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে আমার উপদেশ ত আপনাদের কাজে লাগবে না।

সতীশ মুশকিলে পড়িল। এ কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হল দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ সত্য স্বীকার করবে না?

কমল বলিল, না বলতে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বলতাম, এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলবার এবং ভোলাবার এতবড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি, হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে. না ভাববন্ধন থেকে? কোন্‌টাকে দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ-সেবার আদর্শ?

হরেন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এ-সব নয় এ-সব নয়। এ আমাদের কাম্য নয়।

কমল কহিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে জীর্ণবস্ত্র, মাথায় রুক্ষকেশ. একবেলা অর্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠচে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়ে তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্র্যাজুয়েট তৈরী করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্মের সাধনা. ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্থটা আগে পরিষ্কার হোক।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয় আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্টন-মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বলচেন। তা যদি হয় সতীশ-বাবু, আমি নিজে ত ধর্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি, তবুও আমাকে ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলাম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব ত?

সতীশ কথা কহিল না, কেমন একপ্রকার যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই চঞ্চল

দৃষ্টি অনুসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্পলকচক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, রং অতিশয় ফরসা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, সুমুখের দিকটায় এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয় ক্ষুদ্র—অন্ধকার গর্ত হইতে ইঁদুরের চোখের মত জ্বলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট সুমুখে ঝুঁকিয়া যেন অন্তরের সুকঠোর সংকল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়, এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলাই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু,—শুধু বন্ধু নয়, ছোটভাইয়ের মত, রাজেন্দ্র। এতবড় কর্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধু-চিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। বৌদি, এঁর গল্পই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য মানুষ! অজিতবাবু, একেই আপনার তল্পি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটু বলিতে যাইতেছিল, একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, অক্ষয়বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, অক্ষয়বাবু?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁ হে হাঁ—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল, অ্যাঁ! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলেন! সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, হরি ঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাই না! তাই আসা, তা বেশ।

এ-সকল কথার কেহ জবাব দিল না, কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই, বিশ্বাসও কেহ করিল না। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেও না।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা ত চিনিনে—ভালই হল যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসংবাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, গোপন করবার আর কি আছে। পথের মধ্যে আজ সেই সেলাইয়ের কল বিক্রি-আলা পার্শী বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ি থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া-টতুয়া শেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন,—শিবনাথ ত দিব্যি গা-ঢাকা দিয়েছেন, কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই ত! তাই সে কলটা কেড়ে

নিয়ে গেছে,—আশুবাবু আজ পুরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল, কাল সকালেই লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চলছিল না, আমাদের ত সে কথা জানালেই হত।

তাহার বলার বর্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্মাহত হইল। কমলের লাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্যন্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বলবেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয়বাবু, আপনি যান এ বাড়ি থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করিনি—ইচ্ছে করিনি যে আপনি আসেন, তবু এসেছেন। মানুষের ব্রুট্যালিটির কি কোথাও কোন সীমা থাকবে না?

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছলছল করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ি সঙ্গে আছে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধ হয় শীঘ্র দেখা হবে না, আমি এখান থেকে যাচ্ছি।

কোথায়, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

॥ পনের ॥

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ছিল, গাড়ি থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ ত নয় ?

অজিত উত্তর দিল, না, এ পথ নয়।

নয় ? তা হলে ফিরতে হবে বোধ করি ?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরব।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য হইল। এক অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক, তাহার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলবার অনুরোধ ত আমি করিনি অজিতবাবু, যে সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে। ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার—আমার কর্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস করে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণায় যদি ভুল করে থাকি কমল ?

যদির ওপর ত বিচার চলে না অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তার পরে এর বিচার করব।

অজিত অস্ফুট-স্বরে বলিল, তা হলে বিচারই করুন, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার ? সেদিন ত ঠিক এমনি অন্ধকারই ছিল।

হাঁ, এমনি অন্ধকারই ছিল। এই বলিয়া সে গাড়ির দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণীহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু !

হুঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি ?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়িতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে ?

সেদিন পর্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড় অংশ, তার সঙ্গে আপস করব আমি কি করে ? পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, সূর্য যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে। কিন্তু—থাক। কিন্তু, আমি আজ কি ভাবচি তুমি বুঝতে পার না ?

কমল বলিল, মেয়েমানুষ হয়ে এর পরেও বুঝতে পারব না আমি কি এতই নির্বোধ? পথ যখনি ভুলেচেন, আমি তখনই বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্চে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সামলাতে পারবো না।

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ শান্তকণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই অজিতবাবু এমনিই হয়। কিন্তু আপনি তো কেবল পুরুষমানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষমানুষ। এর পরে ঘাড় থেকে আমাকে নাবাবেন কি করে? ততখানি ছোট কাজ ত আপনি পেরে উঠবেন না।

অজিত গাঢ়কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ আশঙ্কা তুমি কেন করচ কমল!

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্যে করিনে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্যে। পারলে ভয় ছিল না, পারবেন না বলেই ভাবনা। শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এতবড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়া হয়। আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলো অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না। চক্ষের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল,—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পার না কমল?

মুহূর্তের তরে কমলের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি।

তবে কিসের জন্যে ফিরতে চাও কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ি চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি কিছুই নেই?

না। কিন্তু আপনার?

অজিতকে ভাবিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই—তার ত দরকার।

কমল কহিল, গাড়িখানা বেচে ফেললেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ি বেচবো? কিন্তু এ ত আমার নয়,—আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি! আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ির নাম কখনও মুখে আনবেন না। কোন চিন্তা নেই চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে উপহাস করচ?

না, সত্যিই বলচি।

সত্যিই বলচ এবং সত্যিই ভাবচ পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি? এ কাজ তুমি নিজে পার?

কমল বলিল, আমার পারা না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতাম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই এবং সেজন্যে লজ্জা বোধ করিনে। এই বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাকলেই লজ্জাবোধ করতাম। আর আমার বিশ্বাস, সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এই কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশী নয়? শিক্ষিত ভদ্র-মন বলে কি কখনো কিছু দেখোনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন করব যদি সময় আসে, আজ নয়। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিদ্রূপ করে বলত যে, কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ত ভদ্র-মনের সঙ্কোচ বাধেনি? আমি কিন্তু তা বলতে পারব না, কারণ কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পার না?

এ ত ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু, আজ কি করে এর জবাব দেব?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবে না। মনে হয়, এই জন্যই শিবনাথের এতবড় নির্মমতাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচ। এই বলিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ি। প্যাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমনভাবে গাড়িগুলা রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক ত বুঝেছিলেন পথ ভুলিলেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত, সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এত ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হয়ে যাবে কবে?

অজিতবাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন? অমন করে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল?

না, তা হয় না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার ত কেবল আপনাকে নিয়েই নয়,—তা হলে ত সব গোলই চুকে যেত। এখানে আরো দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই, শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল বলে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা-প্রকাশ আর কি আছে বলুন ত?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয়? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার আত্মানুশোচনা হয়নি কমল? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল?

কমল এ প্রশ্নের বোধ হয় ঠিকমত উত্তর দিল না, কহিল, বিশ্বাস করা না-করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাই নি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও। কিন্তু ভুলের জন্যে নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাওনি?

না।

তা হলে এইটুকু মাত্র বলতে পারি, তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পরে অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এমনি ভুল যদি আবার কালও করে তখনো কি তোমার দেখা পাব?

কিন্তু, যদির উত্তর ত যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু। অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ এ মোহ আমার কাল পর্যন্ত টিকবে না এই তোমার বিশ্বাস?

অন্ততঃ, অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই, কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশী করে জানি।

অজিত কহিল, জানলে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে, আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম; এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিল না।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা ত হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। ও দুটো এক বস্তু নয়। আর মোহের বসে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চাননি তা জানি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত ত তুমিই হতে কমল। আমার রাত্রের মোহ দিনের আলোতে কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও ত সঙ্গে যেতে অসম্মত হওনি। এ কি শুধুই উপহাস?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই করে দেখলেন না কেন? পথ খোলা ছিল, একবারও ত নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না করে থাকো তবে এই কথাই বলব যে তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি ত জানতে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি করে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে? কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে শান্ত কণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়। সত্যও নয়। কোন্ আদিম কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্যকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত, ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি, হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতীফুলের আয়ু সূর্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এতবড় সত্য?

কথাগুলো যে অজিত বুঝিতে পারিল না, তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেচি। যা পেয়েচি তার বেশী কেন পাইনি, এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এমনিই নির্বিকার করে তুলেচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে?

অপরের কথা? যাই হোক, তবু ত নিশ্চিন্ত হতে পারব, অন্ততঃ আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল কহিল, নিশ্চিন্ত হলেই কি খুশী হবেন? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি, গাড়ি থামান, আমি নেবে যাই।

গাড়ি থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে?

আমি রাজেন। আজ হরেনদার আশ্রমে দেখেছেন।

ওঃ—রাজেন; এত রাত্রে এখানে কেন?

আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ি থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু?

লোকটি কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্চে। শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন, তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

রাত এখন কত?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব।

অজিত একটা কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ি চালাইয়া হরেন্দ্রের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সংবাদ দেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সোজা কথায় জানাইয়া গেল—এ তাহার কর্তব্যের অন্তর্গত। আজই সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রের মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যতকিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই মনে পড়িল। একদিকে তাহার একজামিন পাস করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তাহা ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সেই অবধি নীরব হইয়া ছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেছে শোনার পরে। কোনকিছুতেই মন দেবার শক্তি তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসংবন্ধ প্রশ্নোত্তরমালার আঘাত-অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব কেহই কিছু করিবে না,হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা, অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশী ব্যাকুল করিয়াছিল পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে শুধু অপমান করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছে সে জানে না। এই মেয়েটিকে তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কমলকে সে ঘৃণা করে এবং ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে সে যে আত্মবিস্মৃত উন্মাদের ন্যায় মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান হারাইয়াছে ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয়, এই বলিয়া সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ির শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হ্যাঁ।

যদু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচ বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন, কহিলেন, এই ঋতু-পরিবর্তনের কালটা এমনই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম-স্যারাম হঠাৎ যা শুরু হয়েছে, লোকে মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভাল নয়, যেন জ্বরভাব করে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের ত অভাব নেই!

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখে শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আসতে দেরি হতে লাগল—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখতে আছে? ঝগড়াঝাঁটি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তিন-চারদিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে যে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্যন্ত ত নাওনি? ছি, এ কাজ ভাল হয়নি, এখন একলা তোমাকেই ত ভুগতে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল, এই সরল চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেন না। সে চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ি নেই, তখনই বুঝেচি অজিত তোমাকে ছাড়েনি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে।

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল। কোন-কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতেই চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপধপ করিতেছে। স্নেহ ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু, কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজন বোধ করে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, হাসপাতাল? তবেই ত তোমার রাগ এখনো পড়েনি।

রাগের জন্যে বলচি না আশুবাবু যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বলচি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে, এটা স্বীকার করি, এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিল না। মণি জানতেন চিকিৎসা করবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারে না, ওষুধ পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত এ ভালই হয়েছে যে, খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁচেছে। তার পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল,—সেবাই সব। যত্নই সবচেয়ে বড় ঔষধ। নইলে ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষমাত্র তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়ায় বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগে ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে। আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যির ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের রোগীর গৃহ পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে, রোগীর বুকের 'পরে অবসন্ন মাথাটা রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার 'পরে পরস্পর সম্বদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। মুহূর্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

॥ ষোল ॥

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্বাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ বাড়িতে আর ত আপনার এক মুহূর্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাব।

কমল কহিল, সেই ভাল, আমিও তখনই যাব। আপাততঃ এই চেয়ারটায় বসে বাকী রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওটাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়নকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল,—ইতিপূর্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভাল ছিল না, আজ মনে হচ্ছে যেন,—আচ্ছা, বস অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারিনে, বেশ, গুডবাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্বান্তঃকরণে আমি আশীর্বাদ করেচি,—যেন, আমাদের ক্ষমা করে তুমি জীবনে সুখী হতে পার।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্বাক হইয়া গেল। নির্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এতবড় পরিবর্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখাচোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারারাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত-কি যে ভেবেচি, সে আমি কাকে জানাব ?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন, শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কান দিইনি, ভেবেছিলাম, এ তাঁর অত্যুক্তি, তাঁর বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব রহিল ; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসে-ছিলাম, কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে, আগ্রায় যদি আমরা না আসতাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার এক‌ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর !

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু।

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু একটা তুমি উপায় করে দাও। আমার বাড়িতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল, অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন, বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল ; পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চান না, কিন্তু তিনি পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাসপাতালে পাঠান, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন ; আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়, তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন ত, চিকিৎসা করাবার শক্তি নেই আমার ; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশী পারিনে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল কেন জানিনে, কিন্তু এমনি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্যে ভয় করো না, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বলবার দরকার নেই কমল, সে

আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি বেঁচে থাকতে এতবড় অন্যায় অত্যাচার তোমার ওপরে ঘটতে দেব না।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না।

কি ভাবলে কমল?

ভাবছিলাম আপনাকে বলবার প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু মনে হচ্চে প্রয়োজন আছে, নইলে পরিষ্কার কিছুই হবে না, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে। আপনার টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের জন্যে খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ করব না।

আশুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেন নি, যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো,—আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এমনি রাগই হয় বটে কমল; এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে যাচ্চি, তোমাকে অনুগ্রহ করচি নে। এ হলে হবে ত?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবে না। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারব না তখন আমার উপায় নেই। ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে না চান, হরেন্দ্রবাবুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনার যা খরচ করবার তা সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। এই বলিয়া সে যথার্থই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আশুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্যে যা করতে যাচ্চি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখচ? একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং এ কদাচার অংকুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাকবে না সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেটুকুই আমি চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেমনি করেই আবার ফিরে পাও, সেই কামনা করেই আমি এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতাবশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িল না। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা-বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি

চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়,—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারব না।

তাহার বলার মধ্যে উষ্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই সাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত পরে কহিলেন, একি কথা কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ শিক্ষা তোমাকে যে-ই কেননা দিয়ে থাক, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাঙলাদেশেরই মেয়ে, এ পথ তোমার আমার নয়,—এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জান কমল, এক দেশের ধর্ম আর এক দেশের অধর্ম। আর স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং, কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল সে লেশমাত্র বিচলিত হইল না।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন-কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বার বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেছ কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখে এসেচি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্কবাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি হত! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে ত—উঃ—শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা? এই বলিয়া তিনি স্বর্গগত মনীষিগণের উদ্দেশে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধচক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাহার সংজ্ঞা নাই,—এমনি অবস্থা।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এইজন্যেই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

শুধু কেবল এই জন্যেই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এইজন্যেই। বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেলতে বলেছিলেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হয়, তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাকতে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে

লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম, দেশের পুরাণ-ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যা বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে এ ত শুধু তাঁদেরই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ফল। জাতি হিসেবে আমরা যে ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোন মতেই রক্ষা পাব না, এ বোধশক্তি আমাদের দিলে কে বল ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এ-সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো কল্পনাও করিনি। আমার ভারী দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে, হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন, এবং পরক্ষণেই তিনি সতীশ ও রাজেন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্চেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়িটা অমনি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়াস নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। এই বলিয়া তিনি কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি। এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেছে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছে থেকে দেখা যায় না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি শিক্ষিত মনের পরিবর্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এইজন্যেই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। সেই ব্রহ্মচর্য, সেই সংযম-সাধনা, সেই পুরনো রীতি-নীতির প্রবর্তন—এসবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যম নয়? তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকী থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নতশিরে নিতে পারাই হল আমাদের চরম সার্থকতা; এই হল আমাদের কল্যাণের পথ, কমল, এ ছাড়া আর পথ নাই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রর বিস্ময়ের পরিসীমা নাই,—এই সাহেবী চাল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিল না। শুধু বলিবার শক্তির জন্যই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই,—তাঁহার মনের মধ্যে

অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষণকালের পূর্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না ? না কেন ?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখান নি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয়ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালই যে হবে তার প্রমাণ কি আশুবাবু ? কৈ, সে ত বলেন নি ?

বলিনি কি রকম ?

না, বলেন নি। যা বলছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবক-মাত্রেই ঠিক এমনি করে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধারমাত্রই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্যে কেউ শক্তি ক্ষয় করে না।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতন মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাল মনে ক'রে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলতে চেয়েছিলাম আশুবাবু, কিন্তু আপনি কান দেননি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক বা পারলৌকিক ধর্ম-কর্মই হোক, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্রীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশী করা যায় না। তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি কি বল কমল ? দেশের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকী থাকবে কি ? জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাব কোন্ পরিচয়ে ?

কমল কহিল, দাবী আপনি এসে ঘরে পেঁছিবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে ত বুঝতে পারলাম না কমল !

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এমনিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তে পদে পদে যে সত্য নিত্য-নূতনরূপ দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে ? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিনতে পারাও যাবে না। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে! কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়,—এমনিভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল,—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছি। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না। শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল, এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গেছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে করে এনেছিলেন, চলুন না পেঁাছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেন্দ্রর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু, তুমি চল না ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল তাহার পরে কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ সর্তে ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে দেবেন, আমি যথাসাধ্য করে দেখব। বাঁচেন ভালই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। এই বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন,—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

অর্ধেক পথে রাজেন্দ্র বিদায় হইল, বলিয়া গেল ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতাবশতঃই বোধ করি আপত্তি করিল না, কিংবা হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ-জাতীয়া দাসীটি তাহার কাজ-কর্ম করিয়া দিত সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদীর দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্ত প্রয়োজন ; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয় না। চারিদিকে এত যে আবর্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিনে এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল, সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল—ছাদের পুরানো চুনবালি আসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই ; চড়াই পাখির বাসা তৈরির অতিরিক্ত মাল-মসলা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদর বদলানো প্রয়োজন ; বালিশের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার ; চেয়ার টেবিল স্থানভ্রষ্ট, দরজায় পাপোশটায় কাদা জমাট বাঁধিয়াছে, আয়নাটার এমনি অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে ;

দোয়াতের কালি শ্বকাইয়াছে, কলমগ্বলো খ্বঁজিয়া পাওয়া যায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজ-গ্বলোর চিহ্নমাত্র নাই—এমনিধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মান্বষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিল না। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধ্বলামাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবেই বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শ্বধ্ব যাওয়ার দিনটারই যেন সে কেমন করিয়া নাগাল পাইতেছিল না,—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গ্বহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এতটা খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ কি ইহার প্রয়োজন হইল, এমনি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শ্বন্যচক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এমনি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দ্বই-ই শেষ হইয়াছে। কিন্তু বেলা ত রোজই শেষ হয়, শ্বধ্ব এমনি করিয়াই হতে পায় না। সন্ধ্যার পর সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উল্টাইতে বসিল। কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিল না—কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দ্বই-ই ব্বজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরে দীপের আলো নিবিয়াছে এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অর্বণা-লোকে সমস্ত গ্বহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না। অএতব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অস্বখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার ব্বকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আস্বন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, কোথাও বের্বচ্ছিলেন নাকি?

হাঁ। যে ব্বড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অস্বখের খবর পেয়েচি। তাকেই দেখতে যাচ্ছিলাম।

বেশ খবর। ও ইনফ্ল্বয়েঞ্জা ছাড়া কিছ্ব নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্ম'ই বোধ করি শ্বর্ব হল। বস্তিগ্বলোতে মরতে আরম্ভ করেছে। মথ্বরা-ব্বন্দাবনের মত শ্বর্ব হলে হয় পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ ব্বড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানিনে। শ্বনেচি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ করে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এদিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেন নি, শুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে ত কাল দেখেই এসেছেন—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জ্বর, বৌদির মুখটিও দেখলাম শুকনো-শুকনো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ-সকল খবরে সে যেন ভাল করিয়া মন দিতেই পারিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এ-ছাড়া শিবনাথবাবু। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার—বলা কিছু যায় না। অথচ হাসপাতালে যেতেও চাইলেন না। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জন-কয়েক পাঞ্জাবী আছে,—ঠিকেদারি করে। শুনলাম তারা লোক ভাল।

কমল নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেনবাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন?

পারি, কিন্তু তাকে পাব কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐদিকের কোন্ একটা মুচীদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে ত খবর দেব।

তাঁকে রিমুভ করলে কে? আপনি?

না, রাজেন। তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্চে। তবে, তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েচে তখন সহজে ত্রুটি হতে দেবে না,—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা—ওকে রোগে ধরে না। পুলিশে না ধরলে ও একাই এক শ'। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ও কাবু করে দুনিয়ায় এমন ত কিছু দেখলাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি!

আশা ত করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তা হলে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেন না কেন?

ঐটি শক্ত। বললে এমনি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবে না।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? ওকে ত জানেন না, না জানলে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায় না। আশ্রম না থাকে, সেও সইবে, কিন্তু ও-ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিট-খানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদলাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনা করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক

রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম, ব্যাপার কি? অসুখ বাড়ল নাকি? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স-বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রমবাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে,—আশ্রমের নিয়মে আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন—এই তাঁর পণ, এর আর নড়চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হল ভেতরে কি একটা গোলযোগ আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বললেন, সঙ্কল্প অতিশয় সাধু, কিন্তু ভারতে আশ্রমের ত অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিন-কতক টিকতে পারতাম। আমাকে দেখচি তল্পি বাঁধতে হল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, চুপ করিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আসচি। ভাবচি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বলব কি?

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত প্রকাশ্যে এবংস্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে যে সর্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিল না, তেমনিই নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ ইচ্ছা ছিল না, শিবনাথ তাঁর গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলে না। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য নয়। কিন্তু শুনলেন কার কাছে? রাজেন্দ্র বললে?

সে? সে পাত্রই ও নয়। জানলেও বলবে না। এ আমার অনুমান। তাই ভাবচি, মিটমাট ত হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপচাপ থাকাই ভাল। যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ত্রুটি হবে না।

কমল কহিল, সেই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজদার জন্যেই ভাবনা, ভারী অল্পে কাতর হন। সময় পাই ত কাল একবার আসব।

আসবেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেন্দ্রকে পাঠাতে ভুলবেন না। বলবেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে বলা যায় না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।

দেব, নিশ্চয় দেব, এই বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নবেলায় রাজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা দেব। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও খসল।

বেশ ত হালকা হয়ে গেল। না চাও ত বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয় না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারী করে তুলতে আমার লজ্জা করে। 'আপনি' বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী, তা যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বলতে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাট করো না।

কিন্তু এ অনুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিল না, সে স্মিতমুখে সহজভাবেই বলিল অশ্রদ্ধার জন্যে নয়,—বন্ধুত্বের প্রয়োজন, বুঝিনে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু কি কাজে লাগবে তাই ভাবছি।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা, তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনচ?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ, কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বলচ?

সত্যিই বলচি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতুহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল। 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই, 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজিও নারীমূর্তির ছায়া পড়ে নাই,—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন জান?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিল না। সবাই সন্দেহ করে নানা কথা কইলে, বললে, এ বিবাহ পাকা হল না। আমার কিন্তু ভয় হল না, বললাম, হোক গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েছে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক' পাক পড়ল আমার দেখবার দরকার নেই। বরঞ্চ, ভাবলাম এ ভালই হল যে স্বামী বলে যাকে নিলাম তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক না। মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল। কিন্তু এ-সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝবে না।

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনে যে, তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল। জানলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দাম এড়াতে পারতাম।

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে?

কমল সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বাহিরে সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তা হোক, আমাকে ওঁর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি করবেন গিয়ে?

নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাকব। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এইজন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে-ছিলাম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই। বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ, চলুন। আমি একটা গাড়ি ডেকে আনি গে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন্দ্র বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম। কিন্তু, এখানে আমার থাকা চলবে না, শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশ বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করেছে?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে—সেজন্যে নয়।

কমল হরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এঁরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বলেচেন? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যারা এমন আতঙ্কিত, ঘটা করে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু, তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবে না।

রাজেন্দ্র কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং। কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুলব না। কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায় না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাকলে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেত।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সেজন্যে নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যারই হোক আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আসবে না।

তবে যাবে কেন?

যা নিজেরই জন্যে। দেশের কাজে বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবে না।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেচে, থাক না সেখানে মতের অমিল, হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন; কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে এ কেন? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল ত সে কিসের শিক্ষা? মত এবং কর্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ, এ ঠিকই তাই হবে।

রাজেন্দ্র কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসলাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটা-

কেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে?

রাজেন্দ্র বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য এবং মহত্ত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকে মস্তবড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ-মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারে সর্বনাশ করিনে,—বন্ধুর হলেও না—তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বল?

রাজেন্দ্র কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই। শিবানী—

কমল আশ্চর্য হইয়া পড়িল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্মের জগতে মানষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক, অন্তরের বিচার অতর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কৈ, দুজনের মনে মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে! সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের ঐক্যটাই রাজার শক্তি, হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম,—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।

গাড়োয়ান রোকো রোকো,—শিবানী, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নিচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্পালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

॥ সতের ॥

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের একি চেহারা! এখানে যে মানুষে বাস করিয়া আছে সহজে যেন প্রত্যয় হয় না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো-আঠোরো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আসিয়া দাড়াইল; রাজেন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথবাবুর চাকর। পথ্য তৈরি করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত এরই ডিউটি। সূর্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমতে শুরু করেছিল, এখন উঠে আসচে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে ত একেই দিন, বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাত বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

ফগুয়া।

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটা বাঁ হাতের দুটা আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া!

আউর কুছ খিলায়া?

হু,—দুধ ভি পিলায়া।

বহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবীবাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দো পহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ুটাড়ু কিছু আছে?

ফগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল, রাজেন্দ্র কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিট্‌বেন নাকি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাশার সময়? মায়া-মমতা কি তোমার শরীরে কিছু নেই?

আগে ছিল। ফ্লাড, আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জন দিয়ে এসেচি।

ফগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন্দ্র বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসি গে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটাকে নিয়ে যা পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পেঁাছে দিয়ে যাব। ভয় পাবেন না, আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরবো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

শহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জন হইয়া উঠিল। যাহার উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা

গেল তাহার শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সংবাদ লইতে কেহ আসিল না। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝের কম্বল পাতিয়া ফগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টা শুনা গেল এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকালের মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল পরে হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনার পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন্দ্র কহিল, ইতিমধ্যে দেখছি, বিছানাটা পর্যন্ত বদলে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন,। কিন্তু তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জানলে শক্ত নয়।

কিন্তু জানলে কি করে? জানার ত কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই? ছেলেবেলায় চা-বাগানে আমি অনেক রুগীর সেবা করেছি।

তাই ত বলি! এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আসবার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বসচি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা ত তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন?

রাজেন্দ্র বলিল, খেয়াল হঠাৎই হল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হল আপনারও হয়ত খিদে পেয়ে থাকবে। আসবার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি করবেন না, বসে যান। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজাটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ির কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া একটুকরা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্চি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারও এমনি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারব না ভাই। তুমি হয়ত জান না যে, আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এই-সব দামী ভাল ভাল খাবারও খাইনে। আমার জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেমনি বাসায় ফিরে গিয়েই খাব।

তা হলে আর রাত না করে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

তুমি এখানেই আবার ফিরে আসবে?

আসব।

কতক্ষণ থাকবে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্যন্ত। ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না করে নড়ব না। একটু ক্লান্ত, তা হোক। এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি। উঠুন, এদিকে গাড়ি পাওয়া যাবে না, হাঁটতে হবে। ফেরবার পথে মুচীদের বস্তীটা একবার ঘুরে আসা দরকার? দু'ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে?

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ-লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নেই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্মে নিযুক্ত করে—কর্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন-কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জলবায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ, অন্যের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবে, কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজেও ত ডাক্তার?

ডাক্তার? না। ওদের ডাক্তারি-স্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবীশি করেছিলাম।

তা হলে ওদের দেখচে কে?

যম।

তবে তুমি কর কি?

আমি করি তাঁর তদ্বির। তাঁর গুণমুগ্ধ পরম ভক্ত আমি। এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া, তেমনি সুবিবেচনা। বিশ্বভুবনে সৃষ্টিকর্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস করচ রাজেন?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে বলেন আমাকে সিনিক্, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্রতা, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অতএব, মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি। কিন্তু তা করিনে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যান না, গেলে আমার ধারণা—আমারই মত পরম রাজভক্ত হয়ে উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে মৃত্যুরাজার গুণগান করতেন এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গাল দিয়ে আর বেড়াতেন না।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয় তোমাকে সিনিক্ বলাটা কি দোষের?

দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায়? গড়াগড়া পড়ে আছে—আজকের ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে-কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হল। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই,—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায়? তখনি কুল দেখতে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি ভয় নেই ওরে ভয় নেই,—সমস্যা যতই গুরুতর হোক, সমাধান করবার ভার যার হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমির সমস্ত ভার নিয়েছেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশী সৌভাগ্যবান্। কিন্তু কোথা থেকে কি সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

কিন্তু তোমাকে ত আবার এই পথটা হেঁটেই ফিরতে হবে?

তা হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কতদূরে?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা হলে তোমার পা-গাড়ি করে ঘুরে এসো গে—আমি বসচি।

রাজেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা! আপনার যে দুদিন খাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ খবর?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু খবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আসবার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুদ, পাত্রটির চেহারা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ দিন-দুই চলেছে নিছক উপবাস। হয় চলুন, না হয় যা এনেছি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ? কমল একটু হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

তা জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সংবাদ পেলে আপনাকে জানাব।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা করো না। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেছেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন। কিন্তু তোমাকে চিনি। সুতরাং আমাকে চিনে রাখা তোমার দরকার। অথচ, তার জন্যে সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করা হবে না। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল,

আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতি দরিদ্রের যা আহার,—সে একমুঠো ভাত-ডাল কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতেও পারি। কিন্তু দিন-দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি করব না। তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলব না, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারব না রাজেন। তাই বলে রাগ করো না যেন।

না।

কি ভাবচ বল ত?

ভাবচি, পরিচয়-পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হল না। আমি দেখচি, সহজে ভুলতে পারব না।

সহজে ভুলতেই বা আমি তোমাকে দেবো কেন? এই বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরি করো না, খাও। যত শীঘ্র পার ফিরে এস। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখব—দু'চার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাব, কেমন?

রাজেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কমল বলিল, না। কিন্তু এই লোকটি যে আমার স্বামী এ খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যে-ই দিয়ে থাক, সে তামাশা করেছে। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞাসা করলেই খবর পাবে।

রাজেন্দ্র কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক যেন এই জন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে?

শুনিয়া কমল চমকিত হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন ভাব থাকে তাহার অধিব নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে, কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানী? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেছেন!

হাঁ। আমাকেও এনেছেন এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েছেন, তিনি।

নাম?

রাজেন্দ্র।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়িতে থাকো?

সেই চেষ্টাই ত করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হুঁ। ওকে এখানে এনেছ কেন? আমাকে দেখাতে?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিল না। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই এ কথা তুমি কার মুখে শুনলে? আমি বলেচি, এই কি লোকেরা বলে নাকি?

কমল ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি, তুমি ত করতে? চলে আসবার সময় এ কথাটা বলে এলে না কেন? তোমাকে আটকাতে পারি, কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি, এই কি তুমি ভেবেছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয়, সে ত ভাল করেই জানতে? তবে, কেন করনি তা?

শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে, ব্যবসার খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি ত ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামিয়া দিয়া বলিল, থাক থাক, ও আমি জানতে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যিই অসুখ করেছিল?

সত্যি না ত কি?

সত্যিই যদি এই আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়িতে গেলে কিসের জন্যে। তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের একশেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলাম, নইলে পারতাম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জান তুমি আমার সব সইল, কিন্তু তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইল না, তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ শিবানী।

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকো না, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়, তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটিই সবচেয়ে ভালবাসতে! এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেমনিই নির্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাবচ বল ত শিবানী?

কি ভাবচি জান? ভাবচি, মানুষ কত বড় পাষণ্ড হলে তবে এ কথা মনে করে দিতে পারে।

শিবনাথের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জানতে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাকবে না। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেছি—

কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়ার কারণ ত আমি একবারও জিজ্ঞাসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম, এ কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসনি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যেও আমি ধরে রাখতাম না।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানী।

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হতে লাগল—পাথর কিনতে, চালান দিতে, স্টেশনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্যে আর দুঃখ হয় না, হয় আর একজনের জন্যে। কিন্তু আজ তোমার জন্যেও দুঃখ হচ্চে শিবনাথবাবু—

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, দ্যাখ, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন করে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা হবার তা ত হয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করো, হয়ত সুখী হতেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলো না। তোমার ভাল হোক, তুমি ভাল থাকো, এ আমি আজও সত্যি সত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।

বাহিরে পা-গাড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন্দ্র চাপা-গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি! রুগী কেমন? ওষুধ-টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়াই নি।

রাজেন্দ্র অঙ্গুলি-সংকেতে কহিল, চুপ। ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সেটা ভাল না।

না। কিন্তু তোমার মুচীরা করলে কি?

তারা লোক ভাল, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যমরাজের মহিষ এসে আত্মা-দুটো নিয়ে গেছে, সকালে ধড়-দুটো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের

হাবালা করে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা-আষ্টেক শুষচে, কাল একবার দেখিয়ে আনব। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কৈ? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচলাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটোছুটিতে ঘেমে গেছি একটা পাখা-টাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস করচি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সবদিকেই সুখবর। এই বলিয়া সে চোখ বুজিল।

॥ আঠার ॥

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাঁহার পরেই যে পারিল পলাইতে শুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না, রোগে শুশ্রূষা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। শহর ও পল্লী সর্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিল না,—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রাচীন নগরীর মূর্তি যেন দিন-কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানে কবাট অবরুদ্ধ, নদীতীর শূন্যপ্রায় শুধু হিন্দু ও মুসলমান, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব-বাহকের শঙ্কাকুলত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোনদিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছপালা বাড়ি-ঘর-দ্বারের চেহারা পর্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন শহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়,—যেন আপনি হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছলছল করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহার বা স্ত্রী ইতিমধ্যেই মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই,—কখনও কথা হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ-কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচীদের পাড়ায় লোক আর বেশী নাই। যত বা মরিয়াছে, তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলেবয়সে চা-বাগানে সে পীড়িত কুলীদের সেবা করিয়াছিল, সেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু দিন দুই-তিনেই বুঝিল সে সম্বল এখানে চলে না। মুচীদের সে কি অবস্থা! ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত,

কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই, এবং আবর্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্বে কমল জানিত না। অথচ, এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিল না। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোনকিছুকেই সে ভয় করে না, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল, ইহারও সীমা আছে। দিন কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বার বার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সামলে দিয়ে গেলেন! কিন্তু আর আবশ্যক নেই,—আপনি দিন কতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধতে পারবে না।

আর তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমিও পালাব। নইলে কি মরব বলতে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ কয়দিন একেবারে বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতেই হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক জায়গায় ফিরিতে হইবে না মনে করিয়া একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে তাহার সমস্ত পূর্ণ হইয়া রহিল। কমল রাজেন্দ্রের খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতে হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী-বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ-ছ দিন রোজ সকালে আসচি, আপনাকে ধরতে পারিনে। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচীদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল? সেখানে ত ভয়ানক লোক মরচে শুনতে পাই। এ মতলব আপনাকে দিলে কে? যে-ই দিয়ে থাক কাজটা ভাল করেনি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে ত প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ, আমরা ত ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিনকয়েকের জন্যে—নইলে বাসাটা রেখে যেতেন না,—আচ্ছা.

রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি শহরে আছে, না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেছে যে, কোন সন্ধান পাবার জো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বলতে সচরাচর লোকে যা বোঝে তা নেই। তবুও প্রয়োজনই বটে। কারণ আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি ত একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকে না। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ি থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরিয়ে গিয়ে সে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু অন্যায় কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ি নয়, আমাদের আশ্রম। সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, কিন্তু তাই বলে সে নালিশ আর এক-জনের মুখ থেকেও আমার সয় না। বেশ, আমি চললাম। তাকে পূর্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেচি, এবারও বার করতে পারব, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল, তাঁকে ঢেকে যে রাখব হরেনবাবু, রাখতে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচবে আপনি মনে করেন?

হরেন নিজেও হাসিল, কিন্তু সে হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেকে আছেন। তাঁরা কি বলবেন জানেন? বলবেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহু প্রকারের। তার প্রকৃতও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্চে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসিনি, কারণ, সংসারে যত লোকে আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই ত আপনাদের মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না, নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য কথাটাই আমি নিজেকে বারংবার জিজ্ঞেসা করি।

কোন উত্তর পান না?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাব। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি—ভালো কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সংবাদ ত আগেই দিয়েছেন।

হরেন বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায়

সুমুখে এসে দাঁড়াল যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়। এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচে, আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মামলা রুজু করেছে। এর বিচারক কোথায় মিলবে, কবে মিলবে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন করে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই সে অনুভব করলে না, তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ নাকি? দু-কানকাটার গল্প শোনেন নি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেন নি, কিন্তু আমি চা বাগানে সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলা ধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃ-সাহসের সীমা নেই; কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু?

হরেন এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি করে জানলেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাবত। অথচ, আমি জানি তা সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার পরেই নির্ভর করে না,—জগতের কাছে তার প্রমাণ কৈ?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবাই শুনেচেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন! কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে-বিষয়ে আপনি নির্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখ সকলকে উপেক্ষা করেই ঘটে চলেছে এই হয়েচে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশী পাইনি যে, অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন অনেক জেনেছেন, তেমনি এটাও জেনে রাখুন যে, অক্ষয়বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত-কঠোরতায় সে অন্তরের অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ, আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয় না এ ত আমি বলিনি হরেনবাবু! আমি বলেচি, এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহু স্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক, অশ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু, আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াই নে এই সাহসটুকুই আমার আপনাদের সমাদর লাভ করেচে।

এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ, ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে, এর জন্যেই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আসছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ কথা ত বলিনি। আমি বলছিলাম, এ-বস্তু সংসারে দুর্লভ এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখতে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পারলাম না। আপনার অনেক কথাই অনেক সময় হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন তাদেরও ডিঙ্গিয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কার জবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতাম না। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলাম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াছন্ন হইয়া আসিল, এবং সমস্ত মুখের পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে, কমলের সে মূর্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না যে, অনুদ্দিষ্ট আর কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কমল এই-সকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ্য, এবং এইজন্যই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্দম নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন—ভাল কথা, শুনেছেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা শর্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। নানা, চুক্তিপত্র লেখাপড়া করে নয়, এমনিই।

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট।

কমল কহিল, সে ত আপনার বন্ধু অক্ষয়বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিন্তু নিজের খুব বেশী নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার তো আর আপীল-কোর্ট মেলে না।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালোবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেন না?

কমল কহিল, একে ত আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিল না, আর থাকলেই

বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে সবচেয়ে বেশী বাজে। এই বলিয়া একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আনতে পারচি, হলে পারতাম না। হলেও পারতাম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতাম না। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ দেহে সংলগ্ন হয়েই থাকত এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটত। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এমনিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখতে চাইত, জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে হত। তার ভয়ংকর মূর্তি কল্পনায় আঁকতে পারে এমন কেউ নেই। এ সম্ভাবনা ভাবাও যায় না।

কমল বলিল, যায় এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুলচুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনিই অধিক, সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে, তাকে ভাল বলে মানি কি করে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দশায় হরেন্দ্রর মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল; বিরুদ্ধ-আলোচনায় সহজে যোগ দিত না এবং বিপক্ষ দল যখন নানাবিধ সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেমনি নির্লজ্জ উক্তিগুলোর নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথায় একটা নিগূঢ় রহস্য আছে, একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই। আপনারা নিতেও পারেন না ফেলতেও চান না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতি চোখা-চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূতগ্রস্ত করে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা নয় হে অক্ষয়, পূর্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান-দুই-তিন ইংরেজি তর্জমার বই পড়লেই জানা যায়। বুলির জৌলুস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জৌলুস? কমলের রূপের? অবিনাশবাবু, হরেন অবিবাহিত, ছোকরা—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে

আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েছে এই আশ্চর্য! এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো অবিনাশ-বাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ-সব ভোলাতে পারে না—সে আসল-নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয়বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাব, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করব না।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনে হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতেও চাইনে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করেও বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধুলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা কর গে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্যে ভাবতে হবে না। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে। এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেন এবং নির্মল চাপা-হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাহারও আস্থা ছিল না, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলে না, তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু, সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায় না। এই বলিয়া সে অপর দু'জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে? এতবড় একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিতও যেন ভারী এক পরিহাসের ব্যাপার!

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানই ত অক্ষয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ডজ্ঞান ওর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা ত দেখতে পাওয়া যায় না সেজদা, নইলে হাসি তামাশা কম লোকের মুখেই শোভা পেত। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাই কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওনায় লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাঁকে লোকচক্ষে ছোট করতে চাননি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? শিবনাথ তাঁর ভালবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইল না। এই ত আপনাদের ঘৃণার মূলধন? একে ভাঙ্গিয়ে যতকাল চালানো যায় চালান, আমি বিদায় নিলাম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে প্রত্যয় সুদৃঢ়

ছিল যে, কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে, যে শৈব-বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায়, সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র, অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী-নির্বিশেষে সকলের পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল,—এই জন্যই দেশের ও দশের কল্যাণে সর্বপ্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া, এ-সকলের মূলেই ছিল ঐ একটিমাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে আজ তাহারই মুখের পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম নীতি, আচার, ইহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ, সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতার ইহার ব্যতিক্রমগুলাকেও সে অস্বীকার করিত না; কিন্তু এমন স্পর্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিল না। এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা,—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, এ কথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল এখন তা হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রর মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, শুধু একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেজন্যে এসেছিলেন তার ত কিছু করলেন না।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্চেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বলবেন?

হরেন্দ্র বলিল, যদিও হয় আমি কখনও যোগ দিইনে। সে পুলিশের জিম্মায় না থাকলেই আমার যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে?

কিন্তু আপনি ত সে-সব কিছু মানেন না।

অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ মানতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। কিন্তু বন্ধুকে শুধু জানলে হয় না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

বাহুল্য মনে করি। বহুদিনের বহু কাজে-কর্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেছি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক, আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্য

দিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে না। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে রাখতে নেই, ঠকতে হয়।

কথাগুলো যে শুধু তত্ত্ব হিসাবেই কমল বলে নাই, কি-একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন তাহা অনুমান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইল না। রাজেন্দ্রর প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেছি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক, তার আমি একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্বেই মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবে না, এই জোরে সে তার মৃত-বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেছে, নিজের রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্বনাশ করেছে। আইন সে খুবই জানে, শুধু জানে না যে দুনিয়াই এই-ই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে। কমল সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল. কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেছেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

প্রস্তাবটা হরেন্দ্রের কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিল না। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল-মত নির্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও ত হতে পারে না? আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও ত মানে নেই?

কমল কহিল, তা হলে হবে কি এনে? আমাকে পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ টাকা আমি নেবো না. দ্বিতীয়তঃ সে বস্তু তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবে না? আর কিছু না হোক বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবরটা তাঁকে ত জানান দরকার।

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না না, সে করবেন না। ওতে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সইতে পারব না। কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জ্বলে মরছিলাম যে, এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল? স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতাম? তখন এই লুকোচুরির অসম্মানটাই যেন পর্বতপ্রমাণ হয়ে দেখা দিত। তার পরে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এল। সেখানে কত মরণই চোখে দেখলাম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ

দিয়ে নেমে এসেছে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিল না সেই ত আমার সম্মান। লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েছে। আর আমার নালিশ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভাল করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিল না, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয়, হরেনবাবু। আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু আমার কথা আর না। দুনিয়ার কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচজন বাস করে, তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এই বলিয়া সে নির্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প এক মুহূর্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছে খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন!

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন?

হাঁ। সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভাল। তাঁর এক জাঠ্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্যলাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দু-এক মাস দেরি হবে।

আর নীলিমা? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে? একলা ঐ খালি বাসায়?

হরেন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্যে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার সুযোগ হয়েছে।

এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশে নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা শালী নিয়ে ত জাঠ্‌তুতো ভায়ের বাড়ি ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও ত আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি,—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের,—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে, আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরছে

চারিদিকে, দাদার বাড়ি থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ!

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ি ত আছে শুনেচি?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়িও আছে শুনেচি, কিন্তু সে সকলের কোন উল্লেখই হল না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু, পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপনার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনিই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সৎচরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দিনে ছেড়ে যেতে পারেন নি, এই থাকার জন্যই হয়ত ওদিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এই-সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসচেন, না?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে। ওঁরা দুজনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন। বৌদির ত আগ্রহের সীমা নেই—একদিন যাবেন ওখানে?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুন না হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন? চলুন। আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়িতে দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন। হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে?

মানে নেই,—এমনি। চলুন যাই।

॥ উনিশ ॥

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। শয্যার উপরে অর্ধশায়িতভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেদিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিনকয়েক হইতে আর জ্বর ছিল না, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্বলতা যায় নাই। ইঁহারা ঘরে প্রবেশ করিতে আশুবাবু কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুশী হইলেন সে তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আর আসিবে না। তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস আমার কাছে এসে বস। এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন, বলিলেন, কেমন আছ বল ত কমল?

কমল হাসি মুখে জবাব দিল, ভালই ত আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্বাদ। নইলে যে দুর্দিন পড়েচে তাতে কেউ যে ভাল আছে তা ভাবতেই পারা যায় না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয়, বাসায় তালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হয়ত বা তুমি দিন কয়েকের তরে কোথাও চলে গেছ।

হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না,—এই আগ্রাতেই মুচীদের পাড়ায় সেবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখতে পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, মুচীদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখচে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন্দ্র ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিল না। তাহার তাৎপর্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ শুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবে না এ আমি জানিব না ত জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু-তিনদিনের বেশী দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু মনে হয় কি যেন এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরী। তাকে নিয়ে এলে না কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞাসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে ত সব বোঝা যায় না!

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরি আছে।

কেন?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন না, এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হলে তোমারই বা কি করে ছুটি হলো? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল!

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্যে নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে দিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন্দ্র। এক-একজনের দেহ-যন্ত্রে প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে, সে না হয় কখনো শেষ, না যায় কখনো বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হতো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি করে? ক'দিনই বা বাঁচবে? সেখান থেকে একলা যখন চলে এলাম কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচে না, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন করে যেন নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটীরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন তার ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকবে কে? আজই হরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম—

আশুবাবু এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল? শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্যেই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে—

কমল কহিল, লজ্জা সেজন্যে নয় আশুবাবু। যখন দেখতে পেলাম তাঁর কোন অসুখই নেই—সমস্তই ভান, কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পায়নি, আপনি বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন—তখন কি যে আমার হলো সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। যে সঙ্গে ছিল তাকেও এ কথা জানাতে পারিনি,—শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। পথের মধ্যে বার বার করে কেবল এই একটা কথাই মনে হতে লাগল, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ায় না আছে ধর্ম, না আছে সম্মান।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্যি নয়?

কিন্তু জবাব দিবার পূর্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতিনমস্কার করিল এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ যে দুর্বলতা কমল! এ জিনিস ত তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। আমি বরাবর ভাবতাম, যা অন্যায়, যা মিথ্যাচার, তাকে তুমি মাপ কর না।

হরেন্দ্র কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানিনে, কিন্তু মুচীদের পাড়ায় মরণ দেখে ওঁর ধারণা বদলেছে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক, এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সে-ই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশী একটা কথাও কহিত না। কহিল, এ প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। যা নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়; যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশী পারলেন না বলে রাগারাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনাদের কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি করবেন না। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন ত খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আনতে বলব?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাকলে চলবে না—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙতে আমি দেবো না।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়!

আমি ভুলিনে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়সের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বৈ কি! দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনো আপনার অনেক—অনেক বাকী। আচ্ছা কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও ঘরে গিয়ে গল্প করি গে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন? যাই?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না, তথাপি সম্মতি দিতে হইল; কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেও না, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি গে। এই বলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গীটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার

আজিকার এই গুটি-কয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল, ধরা পড়িল রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছে, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্যের কিছু নাই, সাধারণের কাছে এ কথা বলা চলে, কিন্তু সেই সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিল না। নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন ও রূপের প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে, কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে যে। সেদিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোনদিনের কোন প্রলোভনই তাহার গায়ে দাগ ফেলিতে পারে নাই। ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশী ছিল না—তখনও যৌবন অতিক্রম করে নাই ; কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মূলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উদাম-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙ্গিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় না। এ-সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ ঘরে আসিয়া অন্যমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে, দাম্পত্যের সুকঠোর নীতি অত্যাজ্য ধর্মের ন্যায় একাগ্র সতর্কতায় তিনি আজীবন যাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আসক্তির এই নবজাগ্রত চেতনায়, সে ধর্ম লেশমাত্রও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে কি না।

চাকর চা, রুটি, ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই-সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোটোখাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে,—এমনি অনেক কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্-শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না যে, বৌদিদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কিনা। এই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সু-পরিচিত সমস্ত-কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় যে প্রগল্ভ হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই এই কি না।

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটিতে দু-একবার চুমুক

দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুন্নস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলেন?

ভুলে গেলাম? তার মানে?

তার মানে এই যে, আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি ত কিছু খাইনে এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার জো নেই,—এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ এ এক গুঁয়েমির পরিবর্তন নেই। কিন্তু অত দর্প আমি করিনে, হরেনবাবু, তবে সাধারণতঃ এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই আপনার বাড়ির মধ্যে ঢুকবো না, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক-চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ অতি ঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েছে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভাল হইল না, এমন করিয়া পথ চলায় বিপদ আছে এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল এবং এই সংকটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই তাহারা বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া ত কেউ নেই?

হরেন্দ্র কহিল, না আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়িতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে খাবেন কি? আশ্রমে পাচক রাখবার ত ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ আপনি আর অজিতবাবু?

হাঁ। কিন্তু হাসচেন যে? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা জানি এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিতবাবু নেই, সুতরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন ত আমার ভারী ইচ্ছে? আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ত্রুটি করিনি যে যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাবো না তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা দেখে এসেচি তাকেই প্রচুর বলা চলে না! সুতরাং, এখানে খাবার কষ্ট যদি বা হয়, অন্যের মত অসহ্য হবে না এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুশী হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা দেখে এসেছেন তাই বটে। সত্যিই সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অসচ্ছল নয়,—কষ্ট পাওয়ার ত কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক, প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধেও এমনি ব্যবস্থাটাই ক[illegible]খেছেন। অথচ বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এ[illegible] দিতে পারেন?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি, ভি[illegible]র অনে[illegible]াককে দিতে পারব। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশী চলে না। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেন নি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজমন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়,—সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু, এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিল না যে, এতবড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহে না—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূলে তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই এবং বোধ করি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচি নে কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারিনে যে, আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ,—দুঃখের অভিনয় বলে। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নেই! এই বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারী একটা বেসুরো বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জবাব দিল, কিন্তু এটা ত মানেন যে, প্রাচুর্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে ?

কমল স্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে ওদিকেও খানিকটা সত্য থাকা চাই হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম-অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েছেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ বস্তু দেখতে পাবেন,—দৃষ্টান্তের জন্যে ভারত পর্যটন করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তর্ক থাক, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুশকিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছ-রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর আদর্শ ও চোখে তামাশা বলেই ঠেকবে। দিন, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিল না।

হরেন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা ধরুন, কেউ যদি যথার্থ-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে তখন ত অভিনব বলে তাকে তামাশা করা চলবে না ! তখন ত—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাশা নয়, তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেনবাবু কিছুকাল পূর্বে আমিও কতকটা আপনার মত করেই ভেবেচি, উপবাসের নেশার মত আমাকেও তা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেচে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক, ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ,—অভাব যে মানুষকে কত ছোট করে আনে, সে আমি দেখে এসেচি মহামারীর মধ্যে,—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আরও একজন দেখেচেন, তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ত কিছু পাওয়া যাবে না,—আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে—মণি ফেলে অঞ্চলে কাঁচখণ্ড গেরো দেওয়া,—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন ! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেন না ? আশ্চর্য !

হরেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রর বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল ; নারীত্বের শান্ত মাধুর্য ও শুচিতার আদর্শে ইঁহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না। মনে মনে

বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে বিভেদ ইঁহাদের মধ্যে যত বেশীই থাক, সেবা ও মমতায় ইঁহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ় অন্তর্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রের ক্ষুধা ছিল না, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারী ভাল লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এমনি করেই জব্দ করেচি, কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হতেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেন না।

কমল হাসিয়া বলিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষমানুষেরই এমনি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে-দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদিদির খাওয়া হতো না,—উপবাস করে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেন না।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্বাদে মোটা বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক—এতেই লাভ বেশী। আপনাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভিমানে উপোস করে মরতে আমরা নারাজ।

কমল এ কথারও জবাব দিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে দেখব।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটায় অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন, এ কথার জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন। মনে হয় যেন রাজরাণী হওয়াই যাকে সাজে, কাঙালপনা তাকে মানায় না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার উঠুন। ও ঘরে গিয়ে সারা রাত গল্প শুনবো, এ ঘরের কাজটা ততক্ষণে সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বো না, তা যত রাত্রিই হোক। বলুন।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌদিদির সমস্ত কথা ত আমি জানিনে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশ দাদার বাসায়। বস্তুতঃ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকুই জানি। কেবল একটা বোধ করি সংসারে সকলের চেয়ে বেশী জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক শুভ্রতা। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি,—তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে মোছেনি, মোছবার নয়,—জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরুষমহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে,—তাঁর নিষ্ঠাও অনন্য-সাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো, এখন ত আর বাসায় যাওয়া চলে না,—এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানেই শোব। আর তো ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল!

কমল হাসিয়া বলিল, আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনারও ভয়ের কারণ আছে নাকি?

হরেন্দ্র স্তব্ধ নির্নিমেষ চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতেও পারিল না। স্ত্রীলোক হইয়া এ কথা উচ্চারণ করিল কি করিয়া!

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকেও ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েচে হরেনবাবু, আপনি বাসায় যান। তাইতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ি। নির্জন গৃহে অনাত্মীয় নরনারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন - পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ, এর বেশী খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছায় নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান, আর দেরি করবেন না, আশ্রমে যান। এই বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

॥ কুড়ি ॥

প্রায় মাসাধিক-কাল গত হইয়াছে। আগ্রায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্তিটা শান্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে দুই-একটা নূতন আক্রমণের কথা না শুনা যায় তাহা নয়, তবে, মারাত্মক নয়। কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি, নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যেরকম খাটচেন তাতে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবে, হলো? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে, ঢের দেরি। জরুরী থাকে ত না হয় বলুন, কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরী জিনিস যে একবার ব্যবহার করেচে, সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই দেখুন না লালাদের বাড়ি থেকে, আবার এক থান গরদ, আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন?

নিই সাধে? বললাম ছ মাসের আগে হবে না,—তাতেই রাজী। বললে, ছ মাসের পরে ত হবে তাতেই চলবে। এই দেখুন না মজুরির টাকা পর্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক্ করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশী আসতে থাকলে দেখচি আমাকে লোক রাখতে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরানো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রীর তৈরী,—আমাকে দিয়ে এ রকম হবে না। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার চেয়ে বড় কারিগর এখানে কেউ আছে নাকি?

এখানে না থাকে কলকাতায় আছে। সেইখানেই পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

না না, সে হবে না। আপনি যা পারেন তাই করে দেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড়লোক, শৌখিন মানুষ, যা-তা তৈরি করে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট করে লাভ নেই, আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান!

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর?

কমল কহিল, আমি হাত গুণতে পারি। গরদের কাপড়, অগ্রিম মূল্য, অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলেও চলে,—হিন্দুস্থানী লালাজিরা অত নির্বোধ নয়, হরেনবাবু।

তাঁকে জানাবেন—তাঁর জামা তৈরী করবার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের সস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। এ পারিনে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারী ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জানতে পারেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করিনি। তাকে বলেছিলাম অল্পমূল্যে সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজী হ'লো না। বললে, এ ত আমার নিত্যব্যবহারের মেরজাই নয়, এ কমলের হাতের তৈরী জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষ্যে পর্বদিনে পরবার। এ আমার তোলা থাকবে। এ জগতে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।

কমল বলিল, কিছুকাল পূর্বে ঠিক এর উল্টো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধ করি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত?

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রের সমস্তই মনে ছিল; একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয়; কিন্তু এ ধারণা ত একদিন অনেকেরই ছিল। বোধ হয় ছিল না শুধু আশুবাবুর, কিন্তু তাঁকেও একদিন বিচলিত হতে দেখেচি। আমার নিজের কথাটাই ধরুন না, আজ ত প্রমাণ দিতে হবে না, কিন্তু সেদিনের কষ্টিপাথরে ঘষে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায়?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন?

হরেন্দ্র বুঝিল, এই-সকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, না এখনো পাইনি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাইনি, পুলিসের জিম্মায় গিয়ে পড়েচে কিনা এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, নিয়েছি। আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু স্বস্তিবোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন, মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায় না? হরেনবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ-সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ-ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে, আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুল-চক্ষে চাহিল যে, হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল! এই সময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কৌতূহলের সীমা নাই—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা

পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কি, দাঁড়িয়ে আছেন যে? একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসতেও পারেন নি?

বসতে আপনি ত বলেন নি।

বেশ যা হোক। বলিনি বলে বসবেন না?

না। না বললে বসা উচিতও নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে ত বলিনি—দাঁড়িয়ে বা আছেন কেন?

এ যদি বলেন ত আমার না দাঁড়ানই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার কর্‌চি।

শুনিয়া কমল হাসিল। বলিল, তা হলে আমিও দোষ স্বীকার করচি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, দেখুন হরেনবাবু, আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বসতে বসতে ভুলেচি, যে আদরটুকু অতিথিকে করা উচিত ছিল, করিনি,—হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ত্রুটি আপনার চোখে পড়েচে। না না, রাগ করেছেন বলিনি, তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ সংস্কার মানুষের গিয়েও যেতে চায় না—কোথায় একটুখানি থেকেই যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য বুঝিল না, একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ, এইটিই লোকে সবচেয়ে বেশি ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব আমাকে বলচেন, না আপনাকে আপনি বলচেন? যদি আমার জন্যে হয়, ত আর একটু খোলসা করে বলুন। এ হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকচে না।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয় না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হোঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখনি কেবল চৈতন্য জাগে—আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে হাঁ। অন্ততঃ আগ্রার রাস্তায় একটু হুঁশ করে চলা ভাল,—ও দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায়ই ঘটে। কিন্তু হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেল, মর্মার্থ উপলব্ধি হ'ল না।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেনবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম বোঝা যায় না। এই দেখুন, আমাকে ত কেউ বলে দেয়নি কিন্তু অর্থ বুঝতেও বাধেনি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগা। হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্চি খুলতে, তত যাচ্চে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ

য়ে যে কোথায় এসে দাঁড়াল তার কূল-কিনারা পাচ্চিনে। এ-সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারবো। নইলে এভাবে ঘুমন্ত মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসিমুখে বলিল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

দু'জনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকেই মনে পড়চে। আশুবাবু মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ,—এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল, ও চলবে না। আপনি আবার গম্ভীর হয়ে উঠছেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টানাটানি আমার সইবে না। বরঞ্চ, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা, আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন—তাই বলুন আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালবাসি;—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি আর যাই করি, আপনাকে ঠকাবো না, সংসারে আরও পাঁচজনের মত ভালবাসার গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুনতেই ভালবাসেন? তার বেশিতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা—অক্ষয়ের দল শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, না তারা খাবে না, আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেছে, যেখানেই যাই সৎপথে আমাকেই সে রাখবেই। বরঞ্চ, আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারেন না—আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি করে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটাকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়।

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পান না?

না।

পাবার কথাও না এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয় না।

কেন বিশ্বাস হয় না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেছি। কিন্তু আরও ভাল ক্যানডিডেট আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করবার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর করে দেখবেন। এইটুকু নিবেদন।

কিন্তু কেস ত অনুমানে ভর করে বিচার করা যায় না, হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির হয়।

কমল জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজগুলো একে একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুকরিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েছে হরেনবাবু, একটুখানি তৈরি করে আনি, আপনি বসুন।

হরেন্দ্র কহিল, বসেই ত আছি। কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই, কারণ পেলেই খাই, না পেলে খাইনে। ওর জন্যে কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যাননি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেছেন?

কমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, না। এ আমার মনেও হয়নি।

তা হলে চলুন না আজ আশুবাবুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যিই খুব খুশী হবেন। সেই অসুখের মধ্যে একবার গিয়েছিলেন; এখন ভাল হয়েছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারিনি। অন্যায় হয়ে গেছে।

তা হলে আজই চলুন না?

চলুন। কিন্তু সন্ধ্যেটা হোক। আপনি বসুন, চট করে এক বাটি চা নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উভয়ে পথে বাহির হইয়া হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাকতে গেলেই ভাল হতো।

কমল কহিল, হতো না। চেনা লোক কেউ হয়ত দেখে ফেলতো!

দেখলেই বা। ও-সব আমি আর গ্রাহ্য করিনে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল, পরিহাস, কহিল, কিন্তু ওই চেনা লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হতে আজকাল সঙ্কোচবোধ করেন, কি তারা ভাবে?

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অন্য কিছু ভাবতে পারে? বলুন? এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, সমস্তই দুর্বোধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভাল। রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে—এ সবচেয়ে বেশী টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হ'লো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি. আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলে না। হাওয়া-আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো, পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। এ ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখবার সময় পাইনি,—হয়ত বুঝতে দেরি হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা? কেন?

তা জানিনে।

কেহই আর কথা কহিল না—উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বোধ করি একটু ঘুর-পথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। খবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারে নাই বলিয়া বেয়ারাটাকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল বাবু ভাল আছেন?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হ্যাঁ, ভালই আছেন।

তাঁর ঘরেই আছেন?

না, উপরে সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করচেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি।

পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনেই একটু আশ্চর্য হইল। এসেন্স ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই, আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া চুরুট টানিতেছেন এবং অদূরে সোফার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আবহাওয়ার মতই কড়া ভাব—বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাংলা বলার রুচি নাই। হয়ত, অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন।

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই সমস্ত মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল? বোধ করি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেন না। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেছেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারব।

একটু থামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয় উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আর আমি?

ওহো—তাও ত বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসর অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকী পরিচয় যথাসময়ে হবে,—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসি এইজন্যে প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছটফট করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা ভারী হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে এসেচো ত?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি? এ বাড়িতে খাওয়াতে পারবো না ত।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

॥ একুশ ॥

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন. বর্ণনা আমার মিললো তো? বুড়াবয়সে extravagant বলে উপহাস করা যে উচিত হয়নি, মানলে ত?

মহিলাটি নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার-কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়েটির বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য লাগে, ভেতরটা দেখতে পেলেও তেমনি অবাক হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র, ঠিক নয়?

হরেন্দ্রও চুপ করিয়া রহিল; কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কি না তাতে সন্দেহ আছে কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাশা করে থাকেন, তিনি যে বেঠিক নন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রাজ্ঞানটা আপনার এ সংসারে অচল।

ইস, তাই বৈ কি! বলিয়াই আশুবাবু গভীর স্নেহের সুরে কহিলেন, এ বাড়িতে খাওয়াতে তোমাকে কিছুতেই পারবো না জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বল ত?

রোজ যা খাই, তাই?

তবু কি শুনিই না? বেলা ভাবছিলেন, এও আমি বাড়িয়ে বলেচি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলাচনাই হয়ে গেছে?

তা হয়েছে—অস্বীকার করবো না।

রৌপ্য-পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল এবং সকলেই আশ্চর্য হইলেন। এ গৃহে অজিত একদিন বাড়ির ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর সে আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের 'পরে ভারী একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিলেন, তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

খানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

আশুবাবু কহিলেন, ব'সো অজিত। ভাল আছ?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে, হাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে? ভাল মনে হচ্ছে ত?

আশুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলেই ভরসা পাচ্চি।

পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর এইখানে থামিল। কমল না থাকিলে হয়ত আরও দুই-একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখাচোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিল না। মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকেই এখন আসচেন?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। বলিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারিনি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আসতে হয়েছে।

আমার সন্ধানে? প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে দুপুর থেকে বোধ করি বার-চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বসতে বলেছিলাম, কিন্তু রাজী হলেন না। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত ধাতে সয় না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটিকে দেখতে কেমন? বললেন না কেন সে এখানে নেই?

অজিত কহিল, সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছি।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটিকে আমি দু'-তিনবারের বেশী দেখিনি—বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলে না, কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কি যেন একটা মহামূল্য জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ, হরেন্দ্রর মুখে শুনি সে ভারী wild,—পুলিসে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, ভয় হয় কোথায় কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে, হয়ত খবরও একটা পাবো না,—এই দেখ না হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কেউ খুঁজে পাচ্চে না।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বিপদে পড়েচে, কি করেন?

আশুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায়, এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেনের কাছ থেকে শুনেচি। পরার্থে আপনাকে সত্যি করে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি, শুনতে শুনতে যেন তার ছবি দেখতে পেতাম। ভগবানের কাছে প্রর্থনা করি যেন না তার কোন বিপদ ঘটে।

প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে সকলেই বোধ হয় এ প্রার্থনায় যোগ দিল।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাকে আজ ত দেখতে পেলাম না? বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক, দিনরাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েছেন। শরীরটা বোধ হয় একটু বেশী রকমই খারাপ হয়েছে, নইলে এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত

এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই—কতটুকুই বা পরিচয়, অথচ, আজ ভাবি সংসারে আপন-পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন। দুনিয়ায় আপনার পর কেউ নেই কমল, স্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায় তার কোন হিসাব কেউ জানে না।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু সেই অপরিচিত রমণী বেলা ব্যতীত অপর সকলেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্যন্ত সংসারে অনেক জিনিসই যেন আর একরকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জন্যই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভালমন্দর বাদানুবাদ,—মানুষে অনেক ভুল, মানুষে অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্যি আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আনন্দ ত নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমল বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়,—যেন কুয়াশার মধ্যে আগন্তুকের মুখ দেখা। কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধ হয় কমলের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

আসবো। আজ যাই।

এসো। গাড়িটা নীচেই আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিইনি। অজিত, তুমিও কেন সঙ্গে যাও না, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হলো না, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদলায়।

গাড়ির মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসিয়া। রাস্তায় মোড় ফিরিলে কমল কহিল, এমনি অন্ধকার ছিল মনে পড়ে?

পড়ে।

সেদিনের পাগলামি?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজী হয়েছিলাম সে মনে আছে?

অজিত হাসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনি যে বিদ্রূপ করেছিলেন সে মনে আছে।

কমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিদ্রূপ করেছিলাম? কৈ না।

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল বলিল, তা হলে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক, আজ ত আর তা করচি নে—চলুন না, আজই দুজনে চলে যাই?

দূৎ! আপনি ভারী দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের? আমার মত এমন শান্ত সুবোধ কে আছে বলুন ত? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল, চল যাই,—তক্ষুণি রাজী হয়ে বললাম, চলুন।

কিন্তু সে ত শুধু পরিহাসই।

কমল বলিল, বেশ, না হয় পরিহাসই হলো, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেছি বলুন ত? ডাকতেন তুমি বলে, আরম্ভ করেছেন আপনি বলতে। কত দুঃখে কষ্টে দিন চলে—আপনাদেরই জামা-কাপড় সেলাই করে কোন মতে হয়ত দুটি খেতে পাই, অথচ, আপনার টাকার অবধি নেই,—একটা দিনও কি খবর নিয়েছেন? মনোরমা এ দুঃখে পড়লে কি আপনি সইতেন? দিনরাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু সহসা হাত টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার, রোকো রোকো,—এ যে পাগলা-গারদের সামনে এসে পড়েচি। গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারা যায়নি।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সান্ত্বনা এই যে, হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার জো নেই। সে অধিকারে ও বঞ্চিত। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। শুনিয়া কমলও হাসিল, কহিল, তা বটে! কিন্তু বিচার জিনিসটাই ত সংসারে সব নয়; এখানে অবিচারেরও স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চলচে, নইলে কোন্ কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতেই কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ি যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরি হবে।

সে কি কথা! এত রাত্রে এ-অঞ্চলে আমি গাড়ি পাব কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেব।

গাড়ি চলিয়া গেল। অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবে না জানি, অন্ধকারে

তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ, আপনাকে পেঁাছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেন না। কারণ আপনাকে না খাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতাম না। আসুন।

বাসায় দাসী আলো জ্বালিয়া আজ অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া রান্নাঘরে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, স্টোভ জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে?

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাত বলতে পারেন? বলুন ত দেখি?

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্‌খানে কি ছিল এবং নাই, মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, ওদিকে সারারাত খুঁজলেও পাবেন না: আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোন দিকে বলুন তো?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সংকুচিত হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে আমি খুব বেশী করে চেয়ে দেখিনি। অন্য সবাই পেরেছে, শুধু আমিই কি জানি কেন পেরে উঠিনি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ ওইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্ভ্রম-বোধ ছিল না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলাম যেমন করে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবোই। আশুবাবুর বাড়িতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আনবোই। খাওয়ানো একটা ছোট্ট উপলক্ষ্য—তাই ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেন না। আজ রাত্রে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না—এই বাড়িতেই বন্ধ করে রাখবো।

কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

কমল কহিল, লাভের কথা পরে বলবো, কিন্তু আমাকে 'আপনি' বললে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন 'তুমি' বলে ডাকতেন, সেদিনও বলতে আমি সাধিনি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদলে দেবার মত কোন অপরাধও করিনি। অভিমান করে সাড়া যদি না দিই, আপনি নিজে কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্যে। কিন্তু সে যখন অমন করে চলে গেল, তখন সবাই ভাবলে আর

একদণ্ডও আপনি এখানে থাকবেন না। কেবল আমি জানতাম আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে ভালবাসি এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

না, করিনে।

নিশ্চয় করেন। তাইতে আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতুহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ? একটা শুনি।

কমল বলিল, শোনাবো বলেই ত যেতে দিইনি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী-গরীবদের কাপড় সেলাই করে নিজের খাওয়া-পরা চালাই—এ আমার সয়। কিন্তু দায়ে পড়েচি বলে আপনারও জামা সেলাই করার দাম নেবো—এও কি সয়?

কিন্তু তুমি ত কারও দান নাও না!

না দান আমি কারও নিইনে, এমন কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, কমল; এ কাজ তোমাকে আমি করতে দেবো না। আমি তার কি জবাব দিতাম। আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যায়, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবো?

কথাটা বাথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল, বলিল, এমন হতেই পারে না কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটা দিনও এমন করে ভেবে দেখিনি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, যে কমলকে আমরা সবাই জানি সে-ই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশি নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দুজনেই বেশি করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না! আহারে বসিয়া অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, অথচ মজা এই যে, যার যত টাকাকড়িই থাকুক তোমার উপার্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিত্রাণ নেই। অথচ, নিজে তুমি কারও নেবে না, কারও খাবে না। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান কেন? তা ছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন?

অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বহুবারই হয়েছে। আর, তোমার খাই শুধু তোমার জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি, কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, এ উঞ্ছবৃত্তি আর ক'রো না, তুমি তখনি হয়ত এমনি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বার হবে না।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা কি বলেছিলেন কোনদিন?

মনে হয় যেন বলেছিলাম।

আর আমি শুনিনি সে কথা?

না।

তা হলে শোনবার মত করে বলেন নি! হয়ত, মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হয়েই ছিল—মুখ দিয়ে তা প্রকাশ পায়নি।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি?

তা হলে আমিও যদি বলি,—না।

অজিত হাতের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই ত! তোমাকে একটা দিনও আমরা বুঝতে পারলাম না। যেদিন তাদের সুমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজেই বললে আমার ভার নিন—আবার তখনি বললে, না।

কমল হাসিয়া কহিল, এমনি ধারা একটা 'না' আপনি বলুন ত দেখি? বলুন ত যা খেয়েছেন আর কোনদিন খাবেন না, কেমন আপনার কথা থাকে।

অজিত কহিল, থাকবে কি করে? না খাইয়ে তুমি ত ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিল না। শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার সময় আজও আপনার আসেনি। যেদিন আসবে, সেদিন আমার মুখ দিয়ে 'না' বেরুবে না। রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি খেয়ে নিন।

নিই। সেদিন কখনো আসবে কিনা বলে দিতে পার?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিনে। জবাব আপনাকে নিজেই একদিন খুঁজে নিতে হবে।

সে শক্তি আমার নেই। একদিন অনেক খুঁজেচি কিন্তু পাইনি। জবাব তোমার কাছে পাবো, এই আশা করে আজ থেকে হাত পেতে থাকব।

এই বলিয়া অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। খানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেন্দ্রর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন?

অজিত কহিল, কোথাও ত থাকা চাই। তুমি নিজেই ত জানো আগ্রা ছেড়ে আমার যাবার জো ছিল না।

জানি তা হলে?

হাঁ, জানো বৈ কি।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা আমার কাছে চলে এলেন না কেন?

যদি আসতাম, সত্যিই কি স্থান দিতে?

সত্যি ত আর আসেন নি? সে যাক, কিন্তু হরেন্দ্রর আশ্রমে ত কষ্টের সীমা নেই,—সেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত কষ্ট আপনার সইল কি করে?

জানিনে কি করে সইল, কিন্তু আজ আর আমার ও-কথা মনেও হয় না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত, এই আমার সমস্ত ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ

করেও ছিলাম না। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেচি—তিন চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েচি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বার হব।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে? হরেন্দ্র বোধ হয়?

অজিত কহিল, যদি দিয়েও থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েছেন।' দেশের সর্বনাশ যারা চোখে দেখেচে—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্বল্যের একান্ত ভীরুতা—

কমল বাধা দিয়া বলিল; হরেন্দ্র এ-সব দেখেছেন অস্বীকার করিনে, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন কিছু দেখবার ত আজও সুযোগ পাননি।

কিন্তু এ সবই ত সত্যি?

সত্যি নয় তা বলিনি, কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় কি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা?

নয় কেন? ভারতবর্ষ বলিতে ত শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয়? এর প্রাচীন সভ্যতা, এর ধর্মের বিশিষ্টতা, এর নীতির পবিত্রতা, এর ন্যায়-নিষ্ঠার মহিমা,—এই ত ভারত, তাই ত এর নাম দেবভূমি—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাঁচাবার তপস্যা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে? ব্রহ্মচর্যব্রত-ধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের—জীবনে সার্থক হবার—ধন্য হবার—

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার খাওয়া হয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে ও-ঘরে চলুন—আর না।

তুমি খাবে না?

আমি কি দুবেলা খাই যে আজ খাব? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে ত ফিরে যেতে হবে।

না হবে না, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো। কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রমবাসীদের, আপনার জন্যে নয়।

কিন্তু লোকে বলবে কি?

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য থাকে না, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষা করতে পারবে না। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই,—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকে-ছিলেন—কিন্তু পারিনি, আজ আর না পারলে আমার চলবে না। চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ ঘরে আনিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যা-বস্তু দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং নিজের জন্য মেঝের উপর যেমন-তেমন গোছের আর একটা পাতিয়া রাখিয়া কহিল, আসচি। মিনিট-দশেকের বেশী দেরি হবে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

না।

তা হলে ঠেলে তুলে দেব।

তার দরকার হবে না কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে—এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া, দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গেছে,—নীচে সিঁড়ির কবাট বন্ধ করা—গৃহস্থালীর এমনি সব ছোটখাটো কাজ তখনো বাকী, সে-সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সযত্নে-রচিত শুভ্র সুন্দর শয্যাটির 'পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু যে ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভালো-লাগার তৃপ্তি। হয়ত একটু কৌতূহল মিশানো, কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নাই—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সন্তান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত; কিন্তু হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হওয়া অবধি দৈন্য ও আত্ম-নিগ্রহের সুদুর্গম পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্মোপলব্ধির একাগ্র সাধনা এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সুতা দিয়া তৈরী বালিশের অড়ের চারিধারে ছোট্ট গুটি-কয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে সাদা রেশম দিয়া বোনা কোন একটি অজানা লতার একটুখানি ছবি। একটুকু শিল্পকর্ম—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই ত আছে। অবসরকালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া সেইটি নাড়াচাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ ত!

কমল একটু আশ্চর্য হইল—কি বেশ? ঐ লতাটুকু?

হাঁ, আর এই হলদে রঙের ফুলগুলি। তুমি নিজে করেচ, না?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন। নিজে নয় ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েছি? আপনার চাই ঐ-রকম?

না না না—আমার চাইনে। আমি কি করব?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলবেন, কমল রাত জেগে তৈরি করে দিয়েচে।

দুৎ!

দুৎ কেন? নিজের জন্য এ-সব জিনিস কেউ তৈরি করে না; করে আর-একজনের জন্যে। কষ্ট করে ঐ ফুলগুলি যে সেলাই করেছিলাম সে কি আপনি শোবো বলে? একদিন একজন আসবেই,—শুধু তারই জন্যে এ-সব তোলা ছিল। সকালে যখন চলে যাবেন, সমস্ত আপনার সঙ্গে দেব।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা?

কেন ?

তুমি আমাকেই মনে করে এ-সব তৈরি করেছিলে এও বিশ্বাস করব ?

কেন করবেন না ?

করব না সত্যি নয় বলে।

কিন্তু সত্যি বললে বিশ্বাস করবেন বলুন ?

নিশ্চয় করব। তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই—কোথাও বাধে না। সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হলে আমার লজ্জার অবধি থাকে না সে আলাদা। কিন্তু যা পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন কিছুর জন্যেই মিথ্যে বলতে পারো না, এ আমি জানি।

তা হলে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করিনি, সত্যি কথাই বলচি, বিশ্বাস করবেন ?

নিশ্চয় করব।

কমল কহিল, তা যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথাই বলব। তখনো রাজেন আসেনি। অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়নি। আমারো ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘৃণায় দূর করে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইল না,—সেই গভীর দুঃখের দিনের ঐ শিল্পকাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ করে যে করেছিলাম আমি কোন-দিন হয়ত জানতে পারতাম না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিছানা পাততে এসে হঠাৎ মনে হ'লো, না না, ওতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েছে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে শুতে দিতে পারিনে।

কেন পারো না ?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হলো, ঐগুলি বাক্সে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাততে গিয়ে আজ প্রথমে টের পেলাম, সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলাম সে আপনি।

অজিত কথা কহিল না। শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের 'পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমিষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপ করে কি ভাবচেন বলুন ত ?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারছি নে।

তার কারণ ?

কারণ। তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়,—না এলো আনন্দ, না এলো আশা।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমলা একটা গল্প বলি শোনো। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীউ

পুজোর ঘরে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে সুমুখে বসে খেয়েছিলেন,—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবুও বাড়ির কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। সবাই বুঝলে এ তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু এই অবিশ্বাসের দুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত যায়নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাশা করোনি জানি, কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায় নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমারও তেমনি। এতদিন পৃথিবীর কত জায়গাতেই ত ঘুরেচি, শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা, বাবার দেওয়া। এ ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালবাসতে পার।

কমল কহিল, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আশ্রমবাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েছে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃস্ব এ খবর কি ছাই আগে পেয়েছি? তা ছাড়া, ভাল-মন্দ বুঝে দেখবার সময় পেলাম কৈ? মনের মধ্যে শুধু একটা সন্দেহের মতই ছিল,—ঠিকানা পেতাম না,—কেবল এই ত মিনিট-দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার সুমুখে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বলচো মাত্র মিনিট-দশেক? কিন্তু সত্য হলে এ ত পাগলামি।

কমল বলিল, পাগলামিই ত! তাই ত আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে তার কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ করে ঘর-সংসার করুন এ ভিক্ষে ত চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, কহিল, ভিক্ষে বলচ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালবাসার অধিকার। কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদ্বুদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও পারে এর পরমায়ু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে হবে কেন? আয়ুর দীর্ঘতাকে যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, আমি তাদের কেউ নয়।

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক। কিন্তু গাছের ফুল শুকোবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলাম যে, কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি! সেই ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহারই কাছে পূর্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। বিশ্বনাথ তাহাকে বিবাহ ক'রে নাই

ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটা দিনের জন্যও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথম দিনের জন্য অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল, এই ফাঁকির মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব করা আমার সাজে না। কিন্তু তোমার কাছে আর আমি কিছুই গোপন করব না। এঁরা বলেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালবাসার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না, মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্যন্ত জয় করতে পারবো না। অদৃষ্টে তাই যদি কখনো ঘটে, আশ্রম ত্যাগ করে আমি চলে যাবো। কিন্তু, তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে! ও ডাকে সাড়া দিতে আমি পারব না।

একে মিথ্যে বলচেন কেন?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যই কখনো আমাকে ভালোবাসে নি, তার আচরণ বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালবাসা ত আমি নিজের চোখেই দেখেচি। সেদিন তার যেন আর সীমা ছিল না, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল কহিল, আজ যদি তা গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারী-জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর 'পরেই থাক। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই—মনোরমাও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সংকীর্ণ, কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলে না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অজিতবাবু, দু'পক্ষেরই সর্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন, দুনিয়ার কম পুরুষের ভাগ্যেই তা জোটে, কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক তত বড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেছি বলে পুরুষের বিচারে এই হলো নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই সুবিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কি? যা এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশী সম্মান মানুষে দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবে না জানি। আমার উঠোনের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন একবেলার বেশী নয়। তার চেয়ে ওই মসলা-পেশা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায় ?

কমল, এ যুক্তি নয়, এ শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু ? কেবল স্থায়ীত্ব নিয়েই যাদের কারবার, তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেন নি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখত লিখে যে বন্ধন নেবে না, তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে ? ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলার নয়, ও নিত্যকালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে রগড়ে মসলা পিষে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে। ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিদ্রূপ কিসের কমল ?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেল না, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, মানুষে বোঝে না যে হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরী নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য। অথচ এ কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি সংসারে আর আছে কি ? তাই ত কেউ ভেবেই পেলে না শিবনাথকে কি করে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তিতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হলো মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হলো সত্য ?

অজিত একমনে শুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত, তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত তুমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারো না। বরং এইখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হলো কমল, এ নিষ্ফল কলহ বন্ধ করো,—এ আদর্শ তোমার জন্যে নয়।

কোন্ আদর্শ ? আপনার ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই। কিন্তু এ গূঢ়তত্ত্ব বিদেশীদের জন্যে নয়। এ তুমি বুঝবে না।

আপনার শাগরেদি করলেও পারবো না।

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল। যেন সে-মানুষ আর নয়। কহিল, আচ্ছা বলুন ত, কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি? বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েছে যেন আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেন্দ্রকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে,—তোমার কিছুই বোধ হয় মনে হলো না,—না?

কি আবার মনে হবে?

এ-সব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই করো না?

কি গ্রাহ্য করিনে, আপনাদের মতামত? না!

নিজের সম্বন্ধেও বোধ করি কখনো ভয় করো না?

কমল বলিল, কখনো করিনে তা বলতে পারিনে, কিন্তু ব্রহ্মচারীদের ভয় কিসের?

হুঁ, বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে নেই—তাকে গিলে খাবার অনেক মুখ হাঁ করে আছে। লুকানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি,—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মতো তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু যারা তাদের জাত তুমি নও। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আসচে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিতে অবজ্ঞা করার সাহস যে তুমি কোথায় পাও, তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা স্তবগানের মত শোনাচ্চে?

অজিত কহিল, আচ্ছা কমল, সত্যি বলো, আমার মতামতও কি অন্য সকলের মতো তোমার কাছে এমনি তুচ্ছ?

কিন্তু এ কথা জেনে আপনার হবে কি?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন অহংকার করিনি। বাস্তবিক, ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছুই জোর করে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার নিজের চেয়েও ঢের বেশি জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানোও আবার তেমনি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই ত। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি করে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, কিছুই হবে না। সেদিন হারানোও ঠিক এমনি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিদ্যাই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেচি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব করে কিসের?

কমল কহিল, অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেছেন, হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নরনারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। তারপর ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু শান্ত্বনার একটা কথাও উচ্চারণ করিল না।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূবের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অজিতবাবু, ঘুমোবার বোধ করি আর সময় নেই।

না, এইবার উঠি। এই বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

॥ বাইশ ॥

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র,—এর বেশী দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে একদিনও করেন নাই। পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষঙ্গিক বাত-ব্যাধিটাও তেমনি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব স্ব নিয়মেই চলে—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই; সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন। একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্য-দেবতাকে অজস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া দিল, সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই। ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া বলিতে থাকিত যে, এমনি হয়। এমনি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এবং এমনি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই, ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকে নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ, না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ববিধ দুঃখই তাহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধ-প্রসন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে পড়িতে লাগিল আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্যের অভাব বহুস্থলেই যেন চাপা পড়িতে চাহে না, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তার ধার ঘেঁষিয়া আসে, মন্তব্য প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়াবাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন ত সারিয়া আসিতেছে। কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার নিভৃত চিত্ত-তলে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে, আগ্রাবাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তার পরে হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকেলবেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, রায়বাহাদুর সদরআলা, কলেজের অধ্যাপক-মণ্ডলী—নানা কারণে স্থানত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা—হরেন্দ্র, অজিত এবং বাঙালীপাড়ার যাঁহারা আনন্দের দিনে বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ। আসে না শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ি গিয়াছে, বোধ হয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সংবাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসে না কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজলিসী লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিসে আর যোগ দিতে পারেন না, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন,—তাঁহার স্বাস্থ্যহীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে সকল কর্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া এখন বেলাকে তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও ত্রুটি ঘটে না, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা সভাশেষে পরি-তৃপ্তচিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে, অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়!

সম্ভব কি করিয়া যে হয় এই ইতিহাসটুকুই গোপনে থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইত না, অভ্যাসও ছিল না, ভালও বাসিত না। কিন্তু অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্বক্ষণ এই গৃহের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ়, তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধ করি কেহ অনুভবও করে না।

হিম-ঋতুর প্রথমার্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতে টিপটিপ বৃষ্টি নামিয়াছিল; বিকেলের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। ঘরের সার্সিগুলো অসময়েই বন্ধ হইয়াছে। আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেমনি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি-একখানা বই পড়িতেছেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্য বলিয়া বসিল, এ পোড়া-দেশের সবই উলটো। কিছুকাল আগে এ অঞ্চলে একবার এসেছিলাম—জুন কিংবা জুলাই হয়ত হবে, এই জলের জন্যে যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে, না এলে এ কখনো আমি ভাবতেও পারতুম না। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, এর কারণ কি সকলে টের পায়? পায় না।

বেলা সরলচিত্তে প্রশ্ন করিল কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহলাদেই যারা মগ্ন, এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে?

জবাবটা এমনি অভাবিতরূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন, সে তেমনি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন এ কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহপ্রিয় রমণী নয় এবং মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই,—অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি বা তেমনি আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রুক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হাস্য-কৌতুকে চপল, চঞ্চল,—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ—কোথাও কোন-কিছুতে স্থিত হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূল্যও নাই। আনন্দ উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে। সে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চা বলেই নয়, হাহাকার করে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক, সে আমি পারিনে এবং তার কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্মসম্মান বোধ বজায় থাক, তার বড় আমি কিছুই চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিল না।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারে না—কখনো পারে না তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভাল। এতদিন একসঙ্গে আছি, এ ত আমি ভাবতেই পারতুম না।

নীলিমা হাঁ না একটা উত্তরও দিল না, যেন ঘরে কেহ নাই এমনিভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশঃ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্মমত কি ছিল কেহ জানে না, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেন না। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল

হয় নাই তাহা পূর্বেই বলিয়াছিল। বেলা নামটি শখ করিয়া তাহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইল না। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাস করিয়া আসিয়াছিলেন, দিনকতক দেখাশুনা ও মন-জানাজানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেস্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশ-ভ্রমণ, আলাদা বায়ু-পরিবর্তন, এমনি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশে যেটুকু, তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বরপক্ষ হাতে হাতে ধরা পড়িলেন এবং কন্যাপক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিতে চাহিলেন। বন্ধু-মহলে আপসের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নর-নারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিল না। স্বামী-বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাই হোক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিল না, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্যমত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিল না। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা-স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিমলা, মুসৌরি, নইনি প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসর কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি ত ছিলই না, বরঞ্চ অতিশয় মর্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূর-সম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ-উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল। নিতান্ত পরের মতও সে আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়িতে ঢুকে নাই। এ তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ, অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল একেবারে অন্যরূপ। এ গৃহে কাহার স্থান যে কোথায়, এ বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্ধ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্তৃত্বও ছিল তেমনি অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যেই যে ও-কথা নীলিমা বলেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্যে বেলা?

বেলা কহিল, আপনি ত সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবে না। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও করব না। নিজের মর্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি, আজও তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু অন্যায় করিনি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাইনি, আজও আমি তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেকবুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটী।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বলছিলেন যে, বিবেকবুদ্ধিটাই সংসারের মস্তবড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয় না।

আশুবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হাঁ। বলেন, ওটা শুধু নির্বোধের হাতের অস্ত্র। সামনে পিছনে দুদিকেই কাটে—ওর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, যে বলে বলুক, ও কথা তুমি মুখে এনো না নীলিমা।

বেলা কহিল, এতবড় দুঃসাহসের কথাও ত কখনো শুনিনি।

আশুবাবু মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে। তার সব কথা সব সময়ে বোঝাও যায় না, মানাও চলে না।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই বাবার নিষেধও মানতে পারিনি—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুম না।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারিনি।

বেলা কহিল, Thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই; কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলুম যে, জিনিসটা শোভনও নয়, সুখেরও নয়; কিন্তু সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবো না।

নীলিমা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যই এই অভিমত জবাবে লিখেছেন?

সত্যি বৈ কি।

নীলিমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই স্তব্ধতায় সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য হবার ত কিছু নেই নীলিমা, বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হ'তো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি ত কমলের একজন বড় ভক্ত ; বল ত সে নিজে এ ক্ষেত্রে কি করতো ? কি জবাব দিত ? তাইত সেদিন যখন ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত করে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেচি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারা ভদ্র সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন ?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয় নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই ত টানাটানি। এইমাত্র বলছিলেন, তার সকল কথা বোঝাও যায় না, মানাও চলে না। চলে না কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া ?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষুন্নকণ্ঠে বলিলেন, যে জন্যেই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ সময়ে আলোচনা করা ভাল নয়।

নীলিমা এ কথা কানে তুলিল না, বলিল, সেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন এবং আজ অসংকোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থায় কমল কি করত তা সে-ই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী-মজুরের জামা সেলাই করে আহার সংগ্রহ করতে হতো—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না। কমল আর যাই করুক, যে-স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে বাঁচতে চাইতো না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাশা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যেন তাহার কাজ ; সে যে সহসা এমন নির্মম হইয়া উঠিতে পারে, দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিসে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের দিয়ে যে-সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে, সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি বলতাম না। কমল একটা দিনের জন্যেও শিবনাথের নিন্দে করেনি, একটি লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায় নি,—কেন জানেন ?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায় শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন ?

নীলিমা কহিল, কেন তা বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী-স্ত্রীর তুল্য অধিকার—এ একটা অত্যন্ত স্থূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে, মেয়েমানুষ হয়ে আমি মেয়েদের দাবীর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করিনে; আমি জানি এ সত্যি, কিন্তু এ কথাও জানি যে সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে মুখে, আন্দোলনে আন্দোলনে এ সত্য এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চা করবেন না।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্বেই সে সেলাইয়ের জিনিস-পত্রগুলো তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেছে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দু'জনেই অর্ধেক-অর্ধেক ভিজিয়াছে,—বৌদি কৈ?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে এ ভরসা তাঁহার ছিল না; সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন—এসো অজিত, বসো হরেন্দ্র—

বসি। বৌদি কোথায়?

ইস। দুজনেই যে ভারী ভিজে গেছো দেখচি—

আজ্ঞে হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন?

ডেকে পাঠাচ্চি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুংকার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেই ভিতরের দিকের পর্দা সরাইয়া নীলিমা আপনিই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

অজিত কহিল, একি? আপনি হাত গুণতে জানেন নাকি?

নীলিমা বলিল, গোণা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। একটি ভাঙ্গা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলেছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশসুদ্ধ লোকের চোখে পড়েচে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাতার মধ্যে দুজনে? তাইতে দুজনকেই ভিজতে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকার-তত্ত্বে বিশ্বাসী, অন্যায় করেন না, তাই চুলচিরে ছাতি ভাগ করে পথ হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো কাপড় ছাড়ো। এই বলিয়া সে জামাকাপড় হরেন্দ্রের হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চলবে না।

বেলা এতক্ষণ শুষ্ক বিষণ্নমুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল এবং নীলিমা জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি হে হরেন, আর খুঁড়ো না। দেখচো না মেয়েদের কি-রকম ব্যথা লাগলো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্তন করেছি। খোঁড়াখুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারে না। অতএব চিরস্থায়মান হিমাচলের ন্যায় ও দেহ অক্ষয় হোক, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন এবং জল-বৃষ্টির ছুতানাতায় ইতর-জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ ত আবহমানকাল চলে আসচে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দিষ্ট ধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আজ ভাগ্যে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোশামোদ না করলে ইতর-জনের মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টকথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুনতে একটু লোভ হয়।

তবে, আরম্ভ করব নাকি?

আচ্ছা এখন থাক। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড় গে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে? তার পরে?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখি গে ইতর-জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অন্নের ভাঁড়ার উথলে যাবে। চলো অজিত, আর ভাবনা নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি গে, এই বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

॥ তেইশ ॥

অজিত কহিল, জল থামবার ত কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব আবার দুজনে সেই ভাঙ্গা ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকার-তত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছানো। অবশ্য, তার পরের ভাবনাটা নেই,—এখানে তা চুকিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং আর একবার ভিজে কাপড় ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তা হলে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভরেই খেয়ে নিলে না কেন?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না, না, থাক, তাতে আর কি হয়েছে, আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগা মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও। আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, বৈরাগীগিরিতে পেকে গেছেন,—এ দিক থেকে ওঁর ত্রুটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্যে। এমন সংসর্গেও যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠতে পারছেন না, সে ওঁর আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে তাই। ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপই থাক, উনি ধরাই পড়ুন একদিন,—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা করে পুজো দেব।

তা হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বকচেন হরেনবাবু, ভারী বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারী রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব নাকি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়, আর একটুখানি বেড়েছে; এইমাত্র প্রভেদ। পরে

কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ। ব্রহ্মচর্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনামাত্রই অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে উঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মূঢ় বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুকবোধ করতেও অপারগ চমৎকার।

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করেছিলেন, আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকেই চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার রুক্ষস্বর ইঁহাদের কানে গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে। আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে আশুবাবু? সে আমাদের কে, তবুও এতবড় অন্যায় সহ্য হলো না, দণ্ড দেবার আশঙ্কায় বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল। কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে 'না'-এর মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপর হইতে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই—দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই করে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল চমকে উঠে শুধু বললে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল তার প্রতি নির্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হুতাশ নয়,—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেল।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে রাগ হয় ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি নৈতিক-অনুশাসন সবকিছুকেই উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পরধর্মের ভাব বয়ে যাচ্ছে, তবুও ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েচে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্চে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে মনে হয়েছে। তাই ওর যেমন কথা, তেমনি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে, তবু সে মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে, পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে থাকলে ন্যায়ের মর্যাদা থাকতো না। শুয়োরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হতো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এমনি মায়া-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবায় যেন লক্ষ্মী। হয়ত পুরুষদের চেয়ে অনেকদিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এমনি সামান্য করে রাখে যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্বজন্মে কোন রাজরানীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ জন্মে তার সংস্কার ঘোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হতো।

হরেন্দ্র হাসিল, কহিল, কি করব বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু জিজ্ঞেসা করুন দিকি অজিতবাবুকে, এক্ষুনি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক, কিন্তু বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ, কি করেন হরেনবাবু। আপনার আশ্রম থেকে দেখচি যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, হবে একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যের দিন-ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা হলে বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা ছাই তুলেই দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচতে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই; অন্ততঃ অক্ষয়টা বেঁচে থাকতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ি রওনা করে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন,অক্ষয়কে দেখচি তোমরা তা হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিটকিরি হজম করা অসাধ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে ত মরল না। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে!

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জ্বালা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা নয় ত কি!

বেলা কহিল, সত্যিই ত তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে আমি একটি চমৎকার গল্প পড়েচি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েন নি?

কৈ মনে ত হয় না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয় বলেছেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে পৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। ঐ ত সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েছে। এই বলিয়া সে বইখানি পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত—একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম।

বেলা কহিল, তার মানে? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেছে নাকি?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারীদেহের ক্রমশঃ বিবর্তনের যে ছবি দিয়েছেন তা স্থানে স্থানে রুচিতে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক।

অজিত কহিল, থাক। কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হলেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন,—অজিত বাদ-সাদ দিয়ে পড়ো না শুনি। জলও থামেনি, রাতও তেমনি হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ-সাদ দিয়েই পড়া চলে! গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুন না শুনি। অন্ততঃ সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভূমিকা আছে, তা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যাঁর আত্মকাহিনী, তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বড়ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিনা গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদি বা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে—সে বহুদিন পূর্বে।

সেদিন তাঁকে ভালবেসেছিল অনেকে; একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা করে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেল বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলে না। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে, জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাব পায়ও নি। তার পরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠলো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে,—যাকে পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েচে, এ ধারণাই যেন তার ছিল না। কুশল প্রশ্ন অনেক হলো, অভিযোগ-অনুযোগও কম হলো না; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার

চোখের কোণ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হতো, উন্মত্ত-কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ-দ্বার ভেঙ্গে বাইরে আসতে চাইত, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, কিন্তু এ যায় না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া অজিত বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন, না না, ইংরেজি নয় অজিত, ইংরেজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাংলায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগল, তুমি এমনি করেই বাকীটুকু বলে যাও।

আমি পারব কেন?

পারবে, পারবে। যেমন করে বলে গেলে তেমনি করেই বল।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মত আমার জ্ঞান নেই; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ি ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ একান্তমনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন,—এই নিষ্ফল প্রণয়ের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ আশ্বাসে আর যেন না সে যন্ত্রণা পায়। দেখা গেল, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হ'লো না, তবু নিঃসন্দেহে বুঝা গেল, সে ক্যানাডায় ফিরে যাক বা না যাক, সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবে না, তাকেও দুঃখ দেবে না। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একেবারে উলটো দিক থেকে। দুয়ের মধ্যে যে এতবড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবেনি। মানবের লোলুপ-দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে; আজ ঠিক সেই-দিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শরীরধর্ম-বশে অবসিত প্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তির আজ গতিরোধ করে থাকে, অভিযোগের কি আছে? অথচ বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়—এ-সব অন্য কথা। বড় কথা। কিন্তু যা বড় নয়—যা রূপজ, যা অশুভ, অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী,—সেই কুৎসিতের জন্যেও যে নারীর অবিজ্ঞাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্মম অপমানে আহত করতে পারে আজকের পূর্বে সে তার কি জানত?

হরেন্দ্র কহিল, অজিত কেশ ত বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। তার পরে অজিত?

অজিত বলিতে লাগিল,—মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, কেবল ঐ মানুষটিই ত নয়, বহু লোকে বহুদিন ধরে তাকে ভালবেসেছে, প্রার্থনা করেছে,— সেদিন তার একটুখানি হাসিমুখের একটিমাত্র কথার জন্যে তাদের আকুলতার শেষ ছিল না। প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই যে তারা কোন্ মাটি ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিলতো না। তারাই আজ গেল কোথায়? কোথাও ত যায়নি, এখনো ত মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগড়ে? তার হাসির রূপ বদলে? এই ত সেদিন—দশ-পনেরো বছর, কতদিনই বা, এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুতেই অজিত, হয়ত শুধু তার যৌবন—তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁর প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক তাই। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন?

না।

নইলে ঠিক। এই কথাটিই জানলেন কি করে?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তার পরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের মস্ত বড় আরশির সুমুখে আলো জেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোশাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদলে গেল। এমন করে ধাক্কা না খেলে হয়তো এখনো চোখে পড়তো না যে, নারীর যা সবচেয়ে বড় সম্পদ,—আপনি যাকে বলছিলেন তার মা হবার শক্তি,—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় সে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য যে এমন স্বল্পায়ু, এ বার্তা পৌঁছিল তাঁর কাছে আজ শেষ বেলায়।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমনিই হয় অজিত, এমনিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আরশির সুমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনান্ত দেহের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। একদিন কি ছিল এবং আজ কি হতে বসেছে। কিন্তু সে বিবরণ আমি বলতেও পারবো না, পড়তেও পারবো না।

নীলিমা পূর্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, না না না, অজিতবাবু, ও থাক। ঐ জায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেছেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এর বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না, একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা বয়েস, তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলে না নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ ও তো কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসেব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ কথা আর যেই ভুলুক মেয়েদের ভুললে ত চলবে না।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটি তিনি নিজে দিয়েছেন। বলেছেন—"আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা করে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটি মাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো। ঐশ্বর্যের ভগ্নস্তূপ হয়ত আজও কোনো দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেমনি মিথ্যে। যে রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানা-ভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয়নি' বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।

আর কেহ কিছু কহিল না, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারী সুন্দর লাগলো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল; সেই মন্তব্যে খুশী হইল না, কহিল, এ আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুল ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছোয় না। রমণীর দেহ কি এমনিই তুচ্ছ জিনিস যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজনই নেই।

নীলিমা কহিল, নেই এ কথা তো লেখিকা বলেন নি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেটে না, এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বলছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাকলে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্ দিকে চেপেছে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাকলেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হবেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন,—কিন্তু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ কথা জগৎ সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেননা মনে করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহুদূরে চলে গেছে,—তাই ত সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এত দুরূহ। একে চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায় না বলেই ত তার মর্যাদা আশুবাবু।

তাও বটে, গল্পের বাকীটা শুনি অজিত!

হরেন্দ্র ক্ষুন্ন হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবে না আশুবাবু, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না, হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ,—আপনার এই অনির্দিষ্ট ঢিলেঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বেঁচে যেতে যাবেন, সে আমার সইবে না। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ,—রূপের বিচারে হারলে ত তোমার লজ্জা নেই হরেন।

না, সে আমি শুনবো না।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ, নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাক সেই ভাল হরেন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আমার বহুকাল পূর্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী; ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী,—আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা করতাম। নিশ্চিত জানতাম, এদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘটলো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁর নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কথা কারও মনেও উদয় হয়নি। এমনি তাঁর দেহের গঠন, এমনি মুখের সুকুমার শ্রী, এমনি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশী হতে পারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য। আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বৈ কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমারই সমবয়সী—তখন বোধ করি আটাশ-উনত্রিশের বেশী ছিল না।

তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক

নিমেষেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেল। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধাসাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু পরিমাণও নড়ানো গেল না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারলে না।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উলটো হলে বোধ করি অসম্ভব হতো না?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও-রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয় না? তেমন পুরুষ কি সেদেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ করি দুর্ভাগা বিশেষণটা বিশেষ করে সেই পুরুষদেরই স্মরণ করে লিখেছেন। কিন্তু রাত্রি ত অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পেব কথাই ভাবছিলাম। অত ভালবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে না, এতবড় সত্য বস্তুটাও কোথা দিয়ে যে একনিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেছেন,—একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম। নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারে কবে ঘটে এর পূর্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শ্রান্তভাবে কহিল, আজ থাক। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি—নিজেব এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অন্যদিন বলব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্তই থাক।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পরছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়ে,—তাই বোধ হয় সকল দেশেই মানুষে এদের এড়িয়ে চলতে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আশুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ, স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এতবড় সংকটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায়, টেরও পান না।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যবতীদের ঈর্ষা করিনে আশুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌঁছোয় নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে যাঁরা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল

আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁদের পথের নির্দেশ কোন্‌ দিকে আমাকে বলে দিতে পারেন ?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনিমাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশী শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারে দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসম্ভাব নেই। এ-সব আমিও জানি, কিন্তু এর মাঝে নারীর অবিরুদ্ধ কল্যাণময় সত্যকার আনন্দ আছে কি না আজও আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল ?

আশুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন, দিন দুই-তিন হ'লো মানারমা চলে গেছেন, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ করে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর করে ডেকে কাছে বসালাম। আমার ব্যথার জায়গাটা সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতেই চাইল, কিন্তু পারলে না। কথায় কথায় এই ধরনের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়ল, তখন আর তার হুঁশ রইলো না। তোমরা জানোই ত তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার 'পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেলাই যেন তার Passion। মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও প্রবৃত্তি ত তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ও তো স্বভাব না—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কানাকড়ি বিশ্বাস করিনে আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, তবু বললাম, কমল, হিন্দু-সভ্যতার মর্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা এবং এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বললে, করতে দেখেছেন ? একটা নাম করুন তো ? সে এ-রকম প্রশ্ন করবে, ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত সে মেনে নেবে। কেমনধারা যেন ঘুলিয়ে গেল--

নীলিমা বলিল, বেশ! আপনি আমার নামটা করে দিলেন না কেন? মনে পড়েনি বুঝি ?

কি কঠোর পরিহাস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল এবং বেলা আর এক-দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেন না; কহিলেন, না,

মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়,—তেমনি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হতো, কিন্তু সে যখন মনে এলো না, তখন কমল বললে, আমাকে যে-শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনাদের নিজের সম্বন্ধেও কি তাই ষোল-আনায় খাটে না? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ-বুলিই ত তারা সদর্পে আবৃত্তি করে ভাবে, এই বুঝি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বললে, সহমরণের কথা ত আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরত এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিত, দুপক্ষের দম্ভই ত সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকত যে, বৈধব্য-জীবনের এতবড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সে অপেক্ষাও করলে না, নিজেই বললে, উত্তর ত নেই, দেবেন কি? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, প্রায় সকল দেশেই এই আত্মোৎসর্গ কথাটায় একটু বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য-অবস্তু ইহলোকের সংকীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নরনারী কারও জীবনেরই শ্রেয়ঃ আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়,—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই, কিন্তু আর না, আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বললাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েছে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বললে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বললাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ কথা কি তিনি কখনো শেখান নি যে, নিঃশেষে দান করেই তবে মানুষে সত্য করে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা?

কমল বললে, তিনি বলতেন, মানুষকে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ ত ও নয়—ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে ডেকে আনা। অর্থহীন শৌখীন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা। তার বড় নয়!

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বললাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন? এবং জগতের যা-কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে

এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বললুম, তুমি যা বলচো, সত্যিই এ শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাঁকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালবাসতে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে; এ চিত্তের অক্ষমতা, এবং অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলে না। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ বলে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থই সেদিন তুমি দেখতে পাওনি—

কমল বললে, আজও পাইনে আশুবাবু, সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। ও ত কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা,—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম—শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতিসংযম যে আর-এক ধরনের অসংযম, এ কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেন নি আশুবাবু?

ভেবে দেখিনি সত্যি। তাই; চিরদিনের ভেবে-আসা কথাটাই খপ করে মনে পড়ল। বললাম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস করে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা ত মেটে না,—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেচেন,—ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় বাবাভিবর্দ্ধতে? আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশী জ্বলে উঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বলতে গেলেন কেন? তার পরে?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বললে, শাস্ত্রে ঐ-রকম আছে নাকি? থাকবেই ত। তাঁরা জানতেন জ্ঞানের চর্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্মের সাধনায় ধর্মের পিপাসা উত্তোরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যোলোভ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকী—এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ-ক্ষেত্রে তাঁরা আক্ষেপ করে যাননি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার স্পর্ধায় যেন হতবাক হয়ে গেলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, না, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হয় না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বললে, জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা-শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে—আর না। এর

আসল সত্তা ত বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।

বললাম, তা হতে পারে, কিন্তু ও যে রিপু, ওকে ত মানুষের জয় করা চাই।

কমল বললে, কিন্তু, রিপু বলে গাল দিলেই ত সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা খাতায় লিলে সে দখলদার—তাদের কোন্ সত্ত্বাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই ত দুঃখকে জয় করা নয়? অথচ ঐ ধরনের যুক্তির জোরেই মানুষে অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়? শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হলো, ও বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে! এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হ'লো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মত কিছুই ত তার নেই,—কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য হ'লো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না। শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু, দুঃখ যে পাইনি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্তদাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি, শুক্‌নো ঝরণার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালবাসার আয়ু যখন ফুরলো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তিই হলো না। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাবলেন এতবড় অপরাধ কমল মাপ করলেন কি করে? কিন্তু অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হলো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিলে। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠল—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু! বললাম, কমল, এমনি মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় আমারো আছে—সেই ত সাতরাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো ত?

কমল চুপ করে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে কমল? এমনি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিত-কণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই ত বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতে আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বলব এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলে-খেলা করেই কি সাঙ্গ করে দেবো?

বললাম, রাত্রি ত কেবল একটি মাত্রই নয় কমল, প্রভাতের আলো শেষ করে সে ত আবার ফিরে আসতে পারে?

সে বললে, আসুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন করব।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম,—কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেছে। দেখলাম, না তা নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র,—আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখে পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তাই,—যা আজও এসে পেঁছোয় নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য মেয়ে! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলো না, কিন্তু এ কথাও ত মনে মনে স্বীকার না করে পারলাম না যে, এ ত কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা শিখেচে, কতটুকুই বা বয়স, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়সেই সম্যক্ উপলব্ধি করে নিয়েছে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। জীবনটা সত্যিই ত আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান ত সেজন্য আসেনি। আর একজন কেউ আর একজনের জীবনে বিফল হলো সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, একথাই বা তাকে বলব কি করে?

বেলা আস্তে আস্তে বলিল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হলো, বৃষ্টিও কমেছে—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিল না—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোটখাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকী ছিল, কিন্তু আজ সে-সকল তেমনই অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল,—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়নকক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন নির্জন নিঃসঙ্গ গৃহের মধ্যে আসিয়া তাহাদের কাছে ঝাপসা হইয়া গেল; অথচ পরামাশ্চর্য এই যে, কাপড় ছাড়িবার পূর্বে দর্পনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যেদিন নারী ছিলাম।

।। চব্বিশ ।।

দশ-বারো দিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কম-বেশি সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাঁধিল হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র-অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এমনিই শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইত না। অবশেষে তাহারাই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ, ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুনডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর-দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে, অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছেন। অপরাহ্নে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিস্ট্রেটের বাটীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে-ও গাড়ির অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারোদিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেন না।

নীলিমা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে-ভেজা প্রশ্নই ওঠে না; খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙ্গাবার সমাজ নেই—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেমনি অফুরন্ত। সেই রাজেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনের বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তাঁর ঠাঁই হলো না, ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তাকে নিজের কর্তব্য বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না, ও তাই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হলো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে,—অথচ মেয়েদের কত কথাই ত ভাবতে হয়!

আশু বলিলেন, ভাবাই ত উচিত নীলিমা?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বেপরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে ত আমরাও পারি!

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আপনিও না। কারণ জগৎ-সংসার যে-কালি গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেকদিন থেকেই এ কথা ভেবে দেখেচি। পুরুষের তৈরি সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেচি,—কত যে জ্বলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েছে,—কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি: মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা আজকাল নরনারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশী আর এক-পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ব-বিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলে না—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না,—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখলেই দেখা যায়, এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে যে মুক্তি পায় না,—মরে। আমদের সঙ্গে তার তফাত ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে সে দশ-বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইল না, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হলো না যে, এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্যাদা হানি হয়। বলুন ত, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিত কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্যি নীলিমা। বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কী করত?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা করতো, রাঁধতো-বাড়তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ করতো; বস্তুতঃ একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাব তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারত না।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া, কহিল, কাজকর্ম করব না শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার ত কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ এই ধরনের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাকতে ত জানে না, তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্মের মধ্যে, একেবারে তলিয়ে যেতো—আনন্দের ধারার মত সংসার তার

ওপর দিয়ে বয়ে যেতো—ও টেরও পেতো না। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেচে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কেউ একটা দিনও সে সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারত না।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন,—তাই বটে, তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদেরই গাড়ি।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন-সংবাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ খবর পাওয়া মাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলাম আমার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। কে জানতো আমাকে আপনারা এত ভালবাসেন,—তা হলে যাবার আগে নিশ্চয়ই একটা খবর দিয়ে যেতাম। এই বলিয়া সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেমনই রহিল একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলচি আমার দোষ হয়েছে, আমি ঘাট মানচি। কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেন না, তখন সে সত্যই ভারী আশ্চর্য হইল এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-বচনে কহিল, আপনি আসবেন জানলে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতাম না, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারী হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী,—নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, সত্যিই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবে না,—তবে ভারী ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চার জনকে আহ্বান করেছেন। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। এই বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েছে যে আজ ওঁর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা

খুলে বলতে বাধত। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বলতাম, না তুমি বলে ডাকতাম?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্বাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটা খটকা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে থাক। সাত-আটদিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম। আমার কিন্তু ঠিক খোঁজা নয়, পাবার জন্য যেন মনে মনে তপস্যা করছিলাম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য তাহার মুখে নাই, তাই অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্টি একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু? আমি ত সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্রসমাজের কেউ ত আমাকে চায় না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয়ত এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি করে চেয়ে থাকে ত এই নীলিমা। এতখানি ভালবাসা হয়ত তুমি কারও কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্য নহে, এই ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত। বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এমনিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ ত, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই, আমিই ভার নিয়েছি বলবার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দুজনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন, আগ্রায় এত লোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেন না কেন? জ্ঞানতঃ, কোনদিন কোন অন্যায় করেননি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বলতে পারেন নি এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেছেন। বোধ হয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পার।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল, আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে, হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর ত এই, আর একটা ?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যে-মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন এবং পরে দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন,—এইমাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমাকে খুঁজছিলেন কেন ? এর কোনটাই ত আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি ত তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়মনে ভগবানকে ডাকছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙ্গালাদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবো না ; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি দুটোই ত খুইয়েছি—এর ওপর উপরি-লোকসান যা ভাগ্যে ঘটেছে সে বিবরণ দিতে পারবো না,—এখন ভগ্নীপতির আশ্রয়টাও ঘুচল। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই,—যে-কটা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাইনে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বলব, না পাই মরব। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জনার মত আর ঘাটে ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাসলে যে ?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ বলে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও, সেই ত আমার ভয়।

কমল কহিল, হলাম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবে না দিদি, আমিই পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এমনি করে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন আমি কি করতে পারি।

তোমাকে কিছুই করতে হবে না কমল, যা করবার আমি নিজেই করব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্তব্যে অপরাধ না করি। এ বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেন না কি করে? মেয়ে ত আপনার বড় হয়েছে।

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেন না, কারণ, অস্বীকার করার জো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশি পাক খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায় না। শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আশুবাদ্যিয় দুর্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে,--সেটা লোকে ভুলেছে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু। কিন্তু তাও যদি না হয়, সে পরিচয়টা কি সর্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ একমাত্র সন্তান, কি করে মানুষ করেছি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃহৃদয় সৃষ্টি করেছেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি তাঁকে পর্যন্ত উপহাস করবে। তা ছাড়া তুমি বুঝবেই বা কি করে? কিন্তু পিতার স্নেহই ত শুধু নয়, কমল, তার কর্তব্যও ত আছে? শিবনাথকে আমি চিনতে পেরেছি। তার সর্বনেশে গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ-ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ে না। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো, এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দকও আশা করে।

কিন্তু এ চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশী দিন থাকবে না,—সেদিন নিজে অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন তা হলে?

তা হলে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, কিন্তু বিশ্বাস করার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যিই স্থির করেচেন?

হ্যাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব-প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ করে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না?

কৈ, প্রশ্ন ত কিছুই করেন নি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে

যে শক্তিমান, দুর্বলকে সে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসচে। এতে বলবার কি আছে?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিল না, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল? সন্তানের সঙ্গে পিতার ত শক্তি-পরীক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি। কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে, তবু যে এতবড় কঠোর সংকল্প করেছি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই ত? সত্যিই কি এ তুমি বুঝতে পারোনি?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেছি। কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে। কিন্তু দুঃখ নিবারণ করতে পারলেন না বলে কি রাগ করে তার দুঃখের বোঝা সহস্র-গুণে বাড়িয়ে দেবেন?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেছেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় করে বিসর্জন দেবেন,—ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেন না?

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁর মুখে আসিল না—শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ করে যে-ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখতে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়। বরঞ্চ, আমি কামনা করি, ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেন না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এমনি করেই মানুষে আপনাকে শোধরাতে শোধরাতে আজ মানুষ হতে পেরেছে। ভুলকে ত ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকে পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেকচে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়ে না। কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারো না?

আমি? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল। এবং ইহা স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধকণ্ঠ মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, না, এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবো না। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে

সে ভয় পাবে কি না জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বলবো যে খাইয়ে পরিয়ে ইস্কুল-কলেজে বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেন নি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হন্তারক হতে যাব কিসের জন্যে ?

কথাটা আশুবাবুর ভাল লাগিল না, কহিলেন, তুমি কি তা হলে বলতে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য নয় ?

কমল কহিল, অন্ততঃ ভয় দেখিয়ে নয়—এইটুকুই বলতে পারি। আমি আপনার মেয়ে হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে এইভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এদিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু, আমিও পিতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালবাসা দিতে পারে না,—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এই ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের অন্ত থাকবে না। কিন্তু তখন তাঁকে বাঁচাবে কিসে ?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাবনা ছিল, কিন্তু সে ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষে করবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এ-সব কথার মারপ্যাঁচ কমল, যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় করেই পেতে হবে,—ওকালতির জোরে তার থেকে অব্যাহতি মিলবে না।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করিনি আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই। মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি, ভুল ভেঙ্গে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আসতে হবে না—এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু ত ভরসা পাইনে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙ্গবেই কিন্তু তার পরেও যে তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে, তখন সে থাকবে কি নিয়ে ? বাঁচবে কোন্ অবলম্বনে ?

অমন কথা আপনি বলবেন না। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হ'তো, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের মস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ করে তোলে, নইলে, আমিই বা আজ বেঁচে থাকতাম কি করে ? বরঞ্চ, আপনি আশীর্বাদ করুন, ভুল যদি ভাঙ্গে তখন যেন সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত করে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন ! জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশী বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকার দেখতে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্তব্য ?

আমি মা হলে মেনেই নিতাম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত

কষ্ট পেতাম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন করতাম না। মনে মনে বলতাম, এ জীবনে যে রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েছে, সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলাম না কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ বাড়িতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে ত যথার্থ ভালবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ; এ মিথ্যে যেমন করে হোক নিবারণ করাই পিতার কর্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতি-গত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারে সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিতবোধ, সেই ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বুনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা—অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিত তথাপি আজিও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই,—সংসারে ইহার তুলনা বিরল, এ সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন-জাতীয়।

ইহার ভাল-মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্বিঘ্ন শান্তি ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ত মাহাত্ম্যকে খর্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধ-চিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে; এমনি দুর্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন স্পর্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃসময় পরিণাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ-বিবাহে সম্মান নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার, পরে ইহার ভিত্তি, এই স্বল্পকালব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই রহিবে না,—হয়ত এ সবই সত্য, কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে-বস্তু বাকী থাকিবে সে যে পিতার শান্তি-সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড়, এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একবার ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার

চিত্তাকাশে মুহূর্ত উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাও হয়ত পিতার অনির্বাপিত দীপ-শিখাকেও দীপ্তির পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে,—কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেমনি বসিয়া আছে; বেশ বুঝা গেল, এ লইয়া সে আর বাদানুবাদ করিতে চাহে না। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজন মৌনাবলম্বন করিলে ত অপরের মন শান্তি মানে না। বস্তুতঃ, এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার, মুখে যাই কেন না বলুক, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা। কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত; ভদ্রসমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটে না, অথচ, এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচে না।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তবু তুমি কখনো দেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেচি। অনেক ভালবাসার বিবাহ উৎসবে যখন ডাক পড়েছে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে বিবাহ যখন অনাদরে উপেক্ষায় অনাচারে অত্যাচারে ভেঙ্গেচে তখনও চোখ মুছেচি। তুমি গেলেও ঠিক এমনি দেখতে পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখতে পাই আশুবাবু। ভাঙ্গার নজির সে দেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠেচে, উঠবারই কথা,—এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝতে যাওয়াও তেমনি ভুল। ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না, বলিলেন, সে যাক, কিন্তু আমাদের এই দেশটার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি যে প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসচে তার সৃষ্টিকর্তাদের দূরদর্শিতা! এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের' পরে নেই, আছে বাপ-মা গুরুজনদের' পরে। তাই বিচারবুদ্ধি এখানে আকুল-অসংযমে ঘুলিয়ে ওঠে না, একটা শান্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি ত মঙ্গলের হিসেব করতে বসেনি, আশুবাবু, সে চেয়েছে ভালবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তর্ক করে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্ত্যক্ত করছি; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্যের প্রত্যুষের আবির্ভাব দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান! কিন্তু সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাকলে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌঁছুবে না। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়া ছিল, এতক্ষণে এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই। এখন কহিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্যান্য জানালাগুলোও খুলে দেওয়া চাই। এ ত চোখের দোষ নয়, দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে যে-দিকটা খোলা আছে সেদিকে দাঁড়িয়ে আমরণ চেয়ে থাকলেও এ-ছাড়া কোন-কিছুই কোনদিন চোখে পড়বে না।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না কমল, আর একটুখানি বসো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই,—অবিশ্রাম বুকের ভেতরটায় যে কি করেচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝতে পারি। তুমি কি যথার্থই বলছ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক?

কমল বলিল, মণি যদি তাকে ভালবেসে থাকে আমি তা কুশ্রী বলতে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশো বার বোঝাতে চাচ্চি কমল, এ মোহ, এ ভালবাসা নয়, এ ভুল তার ভাঙ্গবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙ্গে তা নয়, আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙ্গে পড়ে। তাই, অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও-দেশের এত দুর্নাম, এত বিবাহ ছিন্ন করার মামলা।

শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বল কমল, তাই বল। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখে এসেচি।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ দেশের বিবাহ-প্রথা? তাকে তুমি কি বলো? সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙ্গে না কমল?

কমল কহিল, ভাঙ্গবার কথাও নয় আশুবাবু। সে ত অনভিজ্ঞ যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়—চোখ চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ না থাকলে তাতে সহজে ফাটল ধরে না। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারী মজবুত, সারাজীবন বজ্রের মত টিঁকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইল না।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙ্গে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?

কমল বলিল, যে স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু তার বেশী ওঁর পূঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকুমাত্র দিয়েই বিদায় করেছে আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে—বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে, তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়েও যা হাতে থাকে মণিক্যের মত তা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে—বলে ঐ ত সর্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলা হেতু আছে কমল। মণি-মাণিক্য সকলের জন্যে নয়, সাধারণের জন্যেও নয়। আপাদমস্তক সোনা-রূপোর গয়না না পেলে যাদের মন ওঠে না, তারা তোমার ঐ একফোঁটা হীরে-মানিক্যের কদর বুঝবে না। যাদের অনেক চাই, তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার, অনেক আয়োজন, অনেক জায়গা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে কমল, এ আলোচনা বন্ধ থাক।

আশুবাবুর মুখ দিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ চুপ করেই না হয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেন না। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভবুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারে না। ওর পক্ষে যা সত্যি মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক, বেলার স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই, আমি জোর করে বলতে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক করে তার ঠিকানা মেলে না।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে-যাওয়াটাও এমনি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হতো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠত না—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারব না কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস,—কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না—অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ম-ধী কমল একনিমেষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোক নীলিমার এলোমেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া

গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্যোদয় অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ জিজ্ঞাসা বৃথা,—আরক্ত আভায় আকাশের যে দিকটা আজ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব-পশ্চিম দিক্‌নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখব, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এভাবে অবজ্ঞা করো না। বহু বহু মানবেই এক সত্য বলে স্বীকার করেছে; মিথ্যে দিয়ে কখন এত লোককে ভোলানো যায় না।

কমল অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল, পুত্রের জন্যই ভাষার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং সেই অসত্যের পরেই ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হলো না।

কিন্তু এ কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ, আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটুবাক্যের নানা অলংকার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করে ছিল মাতৃত্বেই নারীর সার্থকত, সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মনে নেবেন না। এই আমার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বৈ কি কমল। কিন্তু সে ত মনিবের ফরমাস মত কাটা-ছাঁটা মানন-করা মিল নয়, বিধাতা সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরের মধ্যে দিয়ে বয়। তাই, বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা বলে দিচ্চি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেন না, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরাজিতে emancipation বলে একটা কথা আছে, আপনি ত জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়া তার একটা

বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরি করেনি, করেছিল আপনাদের মত যাঁরা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন-দড়ি আলগা করে যাঁরা সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যানসিপেশনের জন্যে যত কোঁদলই মেয়েরা করিয়ে দেন, দেবার আসল মালিক যে আপনারা, আমরা মেয়েরা নই, জগৎব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমার নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদাল করে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জন করেনি। এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই নিয়ম ; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি, নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব ত তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে ত সন্তানের মুক্তি থাকে না, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেন না। উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্যাদার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

যে লোকটি তাহার পিতা, তাহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইহারই উদ্দেশে দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন এবং কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

॥ পঁচিশ ॥

শীতের সূর্য অস্ত গেল। সায়াহ্নে-ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপসা হইয়াছে, একটা জরুরী সেলাইয়ের বাকীটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্বেই সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা শিবনাথের ব্যাপারে বন্ধুমহলে জানাজানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা শুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এমনিই একটা-কিছু যে শেষ পর্যন্ত গড়াইবে, তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

তাহার পরে হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া অবশেষে এমন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে সেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলে না।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল, যেন মাথা তুলিবার সময়টুকুও নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইলে, বলিল, আশ্চর্য এই যে শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়ল না।

কমল মুখ তুলিল না, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ তুমি এতই সাদাসিধে যে কোন সন্দেহই করনি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে-না-পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও কি পারবেন না?

অজিত বলিল, হয়ত পারি,—কিন্তু তোমার মুখের পানে চেয়ে, এমনি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা হলে চেয়ে দেখুন, বলুন পারেন কিনা।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোমার কথাই সত্যি, তাকে অবিশ্বাস করনি বলেই তার ফল দাঁড়াল এই।

দাঁড়িয়েছে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করা সুফল কি পরিমাণে হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন? এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পরে অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনের অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া তুমি কথা বলতে জানো না?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালবাসে, ওটা স্বভাব।

তা হলে সে স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বলতে একটু শেখো, নইলে সংসারে কাজ চলে না।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে ও-পক্ষের অসুবিধেও এমনি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুকুরিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশী, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হলে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা প্রকাশ পেলে না, হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালবাসলে যে কি করে সেইটে শুধু জানিনে। কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জ্বেলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং, তাদের হয়ে কৈফিয়ত দিতে পারব না, কিন্তু তারা ভালবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটে না—স্পষ্ট পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্তমানে অন্যের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্যে বাড়িওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে হয়েছে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট মজবুত করে গড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখে না। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনুরোধ আসিল, আসিল, আমরা ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর। কিন্তু আমরা কারা?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটি দিন মাত্র দেখেচ, তবু আশা করি তাকে ভোলনি?

কমল হাসিমুখে কহিল, না। শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা সাদা, আজ হয়েছে হলদে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণামাত্র আর কিছু না! ও' কাশীধাম থেকে সদ্য-প্রত্যাগত—ঘণ্টা দুয়ের বেশী নয়। ক্লান্ত, তদুপরি, ও তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়; তথাপি আমি আসছি শুনে ও আবেগ সংবরণ করতে

পারলে না। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য, আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্বাহ্নেই সমুপস্থিত। যাক আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি ত ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠল বলে! এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতয় চৌকীটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, বসো এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে দ্বিধা করিতেছিল, হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও সহাস্যে কহিল, বসো হে সতীশ. জাত যাবে না কাশী-ফেরত যত উঁচুতেই উঠে থাকো, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে এ কথাটা ভুলো না।

না, সেজন্যে নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজে না হরেনবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মোহান্ত মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়সেও ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও খাটো ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা, সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহান্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের ছিল সাধ্যমত আমাকে না-মেনে চলা। একজনের ত পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশী তত্ত্ব সঞ্চয় করে। ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠবো না! এখন ভাবনা কেবল ঐ অর্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী-কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকে ও ফিরিয়ে এনেচে। ইতিমধ্যে আচারনিষ্ঠার যে লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি; শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ি ভাড়াটা আমার আর লাগতো না।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা! আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি-একটা নাম আছে—সতীশ জানতেও পারে, কিন্তু আধুনিককালের আঁকা শুক্রাচার্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেচ? দেখনি? তা হলে ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবে না। দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার ত হঠাৎ মনে হয়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকচে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙ্গে গেলে তারা না খেয়ে মারা যাবে না, দেশের কোন একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্চেন, এ কি সত্যি?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য-বস্তুটিকে তুমি চিনতেই পারো না। সেইটি তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে

কিনা সে তুমিই জানো ; কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, আমি যাই করি না কেন ওদের ভয় নেই। কারণ চতুর্বিধ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সংবাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রমে নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু ভারতের সত্য বস্তুটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে ? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুলতেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ করব না। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি ?

সতীশ বিনীতকণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবে না। কিন্তু তর্কের জন্যে নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটা কয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবো না ?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিল না, বলিল হরেনদা এইমাত্র তামাশা করে বললেন আমি কাশী-ফেরত, যত উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে ! সে এই ঘর। আমি জানি আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই—আশ্রম ভাঙ্গলে ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙ্গে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভাল করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাকলে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারত না। তার মত ভারতের সর্বাঙ্গীন মুক্তির মধ্যে দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য ! এরই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠবাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া ত কখনো সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় না। আর শুধু ছেলেরাই ত নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেচি ! কষ্ট ওখানে আছে,—থাকবেই ত। বহু কম করে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই ত আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের ত কিছু নেই।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হোক না কেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব না, কারণ, সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ায় ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয় আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ ত অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য, সংযম এ-সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম নয় ; জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ যুগেও সে উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা এই

বিশ্বাস এই শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত হোমাগ্নি-প্রজ্বলিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি-জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল ; সে প্রয়োজন আজও যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এ সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে ?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকভাবে একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদু-কণ্ঠ সতেজ উদ্দীপনায় কালো-মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেইদিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক-বক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক, আশ্রমের বিগত গৌরবের বিবরণে বিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেনদা, আমরা মরেছি, কিন্তু আশ্রমের মধ্যে দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম-লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে ? আপনি ভাঙ্গতে চাচ্ছেন, কিন্তু ভাঙ্গাটাই কি বড় ? গড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশী বড় নয় ? আপনিই বলুন !

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন ? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে ?

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে ?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায় ? আপনাদের আশ্রমে শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তু লাভের ব্যাপারটা যে আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করচেন।

তাহার ক্ষুব্ধ মুখের চেহারাটা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ উপহাস নয়, উনি রহস্য করচেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব ! স্বভাব বললেই ত কৈফিয়ত হয় না হরেনদা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখান হয়। একে ত উপেক্ষা করা চলে না।

হরেন্দ্র কমলাকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ওর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দায় নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্মে, কিন্তু তাকে ভাল হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠে না। যে বর্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো, আজও যদি সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্তব্য নির্দেশ করতে চায় তাকে ত ঠেকান যায় না সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে ত বর্বরের তুলনা হয় না হরেনদা।

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জান আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করাই যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল অপমান করিনি হরেনদা। আপনি ত জানেন, আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা ; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে উপাদান যে সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি, বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখতে পাই, সেই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম,—সে আমাদের আপন জিনিস। সেই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নাই।

হরেন্দ্র কহিল, না-ও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই-রকম কথার উত্তরেই কমল বলেছিলেন জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল ; তাই নিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল—সেদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধায় এনে দিলে তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যে উপাদান হয়ে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিল। এতটুকু দ্বিধা করলে না। সেই অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব-পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত। তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণে সত্য ছিল না ?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে হাজির করে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেনদা এ-সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল ; আর কিছু নয়।

হরেন্দ্র বলিল অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিককালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, আমি লজ্জায় দেখিনে সতীশ।

সতীশ বহুক্ষণ নির্বাক স্তব্ধভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার, সহস্র

লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের ত জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু; বলিল, সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হতো না যে ভাবের জন্যে, বিশেষত্বের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার সমাদর, মানুষের জন্যেই তার দাম? মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হলো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় ত হবে! তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নর-নারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন ত নবীন তুর্কীর দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরানো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরে ছিল, ততদিনই তার হয়েচে বারংবার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে সে সত্যকে পেয়েছে,—তার সমস্ত আবর্জনা ভেসে গেছে; আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিল, তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বিগত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করেনি তারও বিবর্তন আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠলো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরও হবে। সতীশবাবু, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-অহংকার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে—এত ত না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এও ত সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু মন্দ ত ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভাল,—সে। এইখানেই ভারতের ভয়। এবং সেই আরও ভাল যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হূন, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকী রয়ে গেল, ফরাসী-ইংরেজ এসে পড়ল বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে।

সে প্রশ্ন থাক, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এমনি করে বলতে থাকলেই হবে সর্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এই-ভাবেই একদিন বাঙলায়—সে বেশীদিন নয়, বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে করে সত্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট জন-কয়েক অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিজাতীয় স্পর্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত, কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সইল না। প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়ল। সেই বিষম দুর্দিনে মনস্বী যাঁরা স্বজাতির কেন্দ্রবিমুখ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাঁরা শুধু দেশের নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য। এই বলিয়া সে দুই হাত জোর করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। সুতরাং হরেন্দ্র অজিত উভয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে যখন নমস্কার জানাইল তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে খুব বেশী লোকে হয়ত সে সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যেই সেটা হতে পারেনি। কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ, চুপ করিয়াই আছে। হয়ত, জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিল না। অজিতকে সে চিনিত,—কিন্তু হরেন্দ্রও যখন ইহারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্বের কথাগুলোর সহিত এই সসংকোচ জড়িমা এমনি বিসদৃশ শুনাইল যে, সে নীরবে থাকিতে পারিল না। কহিল, হরেনবাবু, এক-ধরনের লোক আছে তারা ভূত মানে না কিন্তু ভূতের ভয় করে। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। এমন অন্যায় আর কিছু হতেই পারে না। এদেশে আশ্রমের জন্যে টাকার অভাব হবে না, ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবে না; অতএব, সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওঁকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া কহিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি সে খোঁজ তিনিও করেন নি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল না, আমার মনে ছিল না। কামনা করি, ধর্মকে যেন আমরণ এমনি ভুলেই থাকতে পারি, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী বলে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন, এবং নমস্য বলে যাঁদের নমস্কার করলেন, সর্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারী, এ প্রশ্নের জবাব একদিন লোক চাইতে ভুলবে না।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এদের নাম? কখনো শুনেছেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে সেইটে আগে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ বলে আমি ভাবতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভান করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানে হয় মানুষের ভুল। ওঁর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে, পেটের বত্রিশ নাড়ীতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো বলে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এ কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

কমল কহিল, পারি, শুধু দাম নেবার বেলাতেই একটার বদলে অন্যটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেচি। ও শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমার সন্দেহ জন্মেচে। কিন্তু, দীন হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘরছাড়া করে এনেছে তাদের দিয়ে যে কি করব আমি তাই ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও ত তাদের পারব না।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই। কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ অলৌকিক কিছু একটা করে তুলতেও চাইবেন না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন করে তাদের বড় করে তোলে, তেমনি করেই এদের মানুষ করে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি কমল। মাস্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয়ত পারব, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কিনা, সেই আমার ভয়।

কমল বলিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত করে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পান না। সন্দেহ আসে, হয় ওরা দেবতা গড়ে উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সামনে থাকে না। পরায়ত্ত মনগড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত মলিন করে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা দেখে এসেচি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েছে কি? পেয়েছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েছে অনধিকার, পেয়েছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে

মেয়েদের পা ছোট করা হয়। পুরুষেরাও তাকে বলে সুন্দর—সে আমায় সয়, কিন্তু মেয়েদের সেই নিজেদের পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয়, তখন আশা করার কিছু থাকে না। আপনাদের নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবারা কেমন আছ বল ত? ছেলেরা একবাক্যে বললে, খুব সুখে আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে,—এমনি শাসন। নীলিমাদিদি আমার পানে চেয়ে বোধ করি উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক চাপড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ কথার জবাব খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতে এরাই আনবে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক, কিন্তু রাজেন-সতীশ এরা ত যুবক? এরাও ত সর্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেন না, সুতরাং সেও যাক। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই ত বেশী পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ-শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ করো না কমল, কিন্তু তোমার রক্তে ত বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেচে। মা এদেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভাল। দেহের রূপ ছাড়া বোধ হয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি। তাই, পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় বলে জেনেচ।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেন না। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় করে নিয়ে কোন জাত কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুটলো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম ত আর জগৎ-ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা করে কারও বাঁচবার জো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বলবার দিন পাবেন,—কেমন! বলেছিলাম ত! দিন-কয়েকের নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জানতাম। কিন্তু চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে সুবিমলহাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেইদিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বলতে নেই হরেনবাবু। অতবড় জাত যদি মাথা নীচু করে পড়ে, তার ধুলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজের দুর্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিব-নিব হয়ে আসচে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখোনি। আচ্ছা, চললাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি-উঠি করিল, কিন্তু উঠিল না।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না পড়ে চোখের ওপর পড়লে খানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেভায় তাকে বন্ধু বলে জানবেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময়ে মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার আর নেই, তবু বলতে পারি, যত বিদ্যে; বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক, ভারতের কাছে সে-সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাসে প্রমোশন না-পাওয়া ছেলের এম. এ. পাস করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্যাদাবোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা বলেও তেমনি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু এই ভারতই একদিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াতো। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতে সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিল না, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। কিন্তু কোন্ মহা-অতীতে একজনের পূর্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল এবং কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে এ আলোচনায় সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার। আজ আসি। বলিয়া বিষণ্ণ-গম্ভীরমুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

আট-দশ দিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাঁহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাঁহাদের জীবনে এই কয়দিনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেছে। অথচ, আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল; ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিল না,—ঘটিলও তাই।

ফটকের দরোয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ কেহ বসিত না, তথাপি খানকয়েক চৌকি, সেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙান ছিল, আজ সেগুলো অন্তর্হিত। শুধু, ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখান লণ্ঠনটা এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জনা জমিয়াছে, সেগুলা পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিল না। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্নের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিল না, পর্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই; একটু বেশীমাত্রায় খুশী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন—কমল যে! এসো মা, এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল, এ কি? আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসলেন, বুড়ো? সে ত ভগবানের আশীর্বাদ কমল। ভেতরে ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও ত ভাল দেখাচ্চে না।

না।

কিন্তু আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ কমল?

ভাল আছি। আমার ত কখনো অসুখ করে না কাকাবাবু।

তা জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ, তোমার লোভ নেই। কিছুই চাও না বলে ভগবান দু'হাতে ঢেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখলেন বলুন ত?

আশুবাবু কহিলেন, এ ত ডেপুটির আদালত নয় মা, যে ধমক দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি যে দুনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি।

তাই ত আজই সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, শূন্যের অংকগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে দেখেচে—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েছে,—ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোকে শুধু ভুল করেই ভাবে, মা, গণিত-শাস্ত্রের নির্দেশে শূন্যের দাম আছে। আমি ত দেখি কিছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটী হয়, শূন্যের সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্য কোটী হয়ে ওঠে না। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিল না, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই ত যাবার সময় হলো, কাল-পরশু যে চললাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাবতে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুলবে না।

কমল কহিল, না, ভুলব না। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য ঠেকচে বলে, আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি সত্যিই পদার্থ,—মায়া নয়।

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েছে তা বাড়িতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবে না। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়। এবার একটু-খানি দূরে যাবো কল্পনা করেচি। পুরনো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবে না। এই অকর্মণ্য দেহটার দাম ত ভারী, এটাকে বয়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াবো না। কিন্তু কে জানত, কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন করেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এতবড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাবতে পেরেছে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাদিদিকে দেখচি নে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন—কাল সকাল থেকেই আর দেখতে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার-পাঁচজন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে এই তার কল্পনা। তুমি শোননি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুনবে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যাবেলায় ভদ্রলোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড় একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ করে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম,—হয়ত এই আমার শেষ উইল,—এটর্নিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের জন্যে এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল। নীলিমা কি-একটা সেলাই করছিল, ভাল-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েচে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। কি যে হ'লো হঠাৎ ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল—চোখেমুখে ঝাপটা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম,—চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশী নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বস্‌লো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না? মনে হলো বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম,—কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়ল,—আমার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্ত নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই-তিন। এ অবস্থায় তারে কি যে বলব আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়াল, একবার চাইলেও না,—ঘর থেকে বার হয়ে গেল। না বললে সে একটা কথা, না বললাম আমি। তার পরে আর দেখা হয়নি।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আপনি আগে বুঝতে পারেন নি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কেউ হলে সন্দেহ হতো এ শুধু ছলনা,—শুধু স্বার্থ। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণদেহ, এই অক্ষম অবসন্নচিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্নবেলায় জীবনের দাম যার কানাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ, এ সত্য, এর এতটুকুও

মিথ্যে নয়। এই বলিয়া সেই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে, বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না। ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকী দিন-কটা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা।

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ-বিচ্ছেদের যখন মামলা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিল। তারপর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। নিজের স্বামীকে এমনি করে সর্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ করে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলে না। ও বলে, তাঁকে ত্যাগ করাটাই ত বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও ত কষ্টিপাথর, ওতে যাচাই করেই ভালবাসার মূল্য ধার্য হয়। আর এ কেমনতর আত্মসম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেছি, তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলো না? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়,—এ বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজ ভাবি ভালবাসায় পারে না কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই সত্যিকার প্রাণ। ও যেখানে নেই, সেখানে শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্মমর্যাদা-বোধের টগ্-অফ্-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তুমিই ওর আদর্শ,—কিন্তু, চাঁদের আলো যেন সূর্য-কিরণকে ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্যে কতদিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দুটো দিনে আমি দু'শো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি, কমল। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালবাসার সে কেবল একটিমাত্র দিক,—এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত বাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে, মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে সকল দিক আঁধার করিয়া ছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভাল কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙ্গাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অনুমতি দিতে ত পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্বাদটুকু রেখে যাবো, দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে

পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি-ভালবাসা,– ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেক পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমাদিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন ?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল ; বলিলেন, দেখ মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারব না। হয়ত আজ আমার সামর্থ্যও নেই। কিন্তু কখনো এ সংশয় আসেনি যে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালোবাসাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আমার তেমন সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আত্ম-বঞ্চনা বলতে পারব না। এ তর্কে মিলবে না, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষ এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে, সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকী দিনগুলোকে শূলের মত বিঁধবে। ভাবি, সে আর যদি কাউকে ভালবাসত। এ তার কি ভুল !

কমল কহিল, ভুল-সংশোধনের দিন ত তার শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি রকম ? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে করো ?

অন্ততঃ, অসম্ভব ত নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘটতে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে করেছিলেন ?

কিন্তু নীলিমা ? তার মত মেয়ে ?

কমল কহিল, তা জানিনে। কিন্তু যাকে পেলে না, পাওয়া যাবে না, তাকেই স্মরণ করে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক এই কি তার জন্যে আপনি প্রার্থনা করেন।

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রার্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবে না, কমল। আমি যা পারি, তুমি তা পার না। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেছে তাদের অপেক্ষা করা চলে না,—balance of yarning—তৃষ্ণার শেষবিন্দু জল তাদের নিঃশেষে পান করে না নিলেই নয় ; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত,—উপুড় হয়ে শুষে খাবার প্রয়োজনই হয় না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ কথা মানি কাকাবাবু। কিন্তু তাই বলে ত আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারব না। আকাশকুসুমের আশায় বিধাতার দোরে

হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ-বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালকে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এমনি করেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ করে দিয়েছে। নীলিমা-দিদির দেখা পাবো কিনা জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—যাচ্চো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে ত আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনে। দেহে-মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসিনে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া নীলিমা,—এই কি সহজ বিস্ময়। কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল স্মিত-মুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই, তাই। চোরাবালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারে না, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নিরেট মাটি লোহা-পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার ওপরেই চলে। নীলিমাদিদিকে সব মেয়েতে বুঝবে না কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায়, তারা ওকে বুঝবে।

হুঁ বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি করে বুঝেচি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে—জ্বালা নিবেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই ত তাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে চেয়েছিলাম। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ্য—নইলে, ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দুভাগ করে নিয়ে চলে ওদের দুদিনের লীলা, তার পরে সেটা ফুরোয় বলেই সুর গলায় ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে, নইলে বাজতো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি ত জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায়নি; মণি আপনি ভুলেছে। সূর্যাস্ত বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বলবে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলে না, মা, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি বল ত?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাই ত ঘুরে ঘুরে একটা

প্রশ্নই বারে বারে আসচে কাকাবাবু, শেষ আর হচ্চে না। বরঞ্চ; যাবার সময় আপনার ওই আশীর্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা—তার বেশী নয়; ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। দেশান্তরে যাবার পূর্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান, কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌঠাকরুনকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন, আমি গাড়ি আনতে পাঠিয়েচি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি! কিন্তু বেলা ত নেই?

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূরে নয়, মিনিট পাঁচেকেই পেঁাছে যাবেন।

তাঁহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়,—আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন। উনি লিখেছেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পার আমাকে জানিও। কিন্তু কাল বলো না যে আমাকে জানান নি কেন?—নীলিমা।"

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট আত্মীয় বলে আমি দাবি করতে পারিনে, কিন্তু ওঁকে ত আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয় না।

তোমার বাসাতেই ত থাকবেন?

হাঁ,—অন্ততঃ, এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ-বাড়িতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে ও-বাড়িতেও দোষ হবে না।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ কথা বলিলেন না যে এতকাল এ সুযুক্তি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেমসাহেবের জিনিসপত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাও গে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ বাড়ি থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী ওঁর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেছি কমল। বেলার স্বামী এসেছেন নিতে,—বোধ হয় ওঁদের একটা reconciliation হলো।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না; শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেন না যে?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্মগরিমায় বাধলো। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামলা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য হচ্ছ কেন কমল? চরিত্র-দোষে যে স্বামী অপরাধী, তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মানতে পারিনে।

কমল নির্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির একই সুরে বাঁধা—এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিল না, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিল না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমল তেমনিভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্তা কিছুই হইল না। যাবার পূর্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ বাড়িতে পুরনো আর কেউ রইল না।

যদু?

হাঁ, আপনার পুরনো চাকর।

কিন্তু সে ত নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন-পাঁচেক হলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে রাজেন ছেলেটির কোন খবর জানো কমল?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাই-বোন, যেন একই গাছের দুটি ফুল। এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকাকড়ি, ঐশ্চর্য-সম্পদ অপরিমিত, কোথায় যেন অন্যমনস্ক সে-সব ফেলে এয়েচ। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই,—এমনি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু! রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি দু'পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি!

আশুবাবু বলিলেন, সে শুনতে পাই। তাই, বসে বসে ভাবি।

ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি, আজ সে ছেড়ে থাকবে না। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, সহজে উপরে যাইবার জো নাই, রাশিকৃত বাক্স-তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল, পাশের রান্না ঘরে কলরব হইতেছে; উঁকি মারিয়া দেখিল, অজিত হিন্দুস্থানী মেয়েলোকটির সাহায্যে স্টোভে জল চড়াইয়াছে এবং চা চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দিকে আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—চা-চিনি কি তুমি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ না কি? জলটা ফুটে ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরি করে দিচ্চি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাক্স-তোরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটলি এ-সব কার?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েচেন। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতেই দিন কেটেছে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বের করেছি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন। কিন্তু ওগুলো কি নীচেই পড়ে থাকবে? চুরি যাবে যে।

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—যায়নি ত? একটা চামড়ার বাক্সে অনেক-গুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভাল। এক জাতের মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরে সাবালক হয় না। তাদের মাথার ওপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভগবান কৃপা করে করেন। চা থাক, নীচে আসুন। ধরাধরি করে তোলবার চেষ্টা করা যাক।

॥ সাতাশ ॥

বাড়িওয়ালা এইমাত্র পুরো-মাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে সুখের লেশ মাত্র নাই। কমল বাঁধা-ছাদা জিনিসগুলোর ফর্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতে ছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই,—যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশী নীরব।

সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রের নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়,—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায় উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেকেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা কমল, নিশ্চয় এসো ভাই।—নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখিয়াই প্রশ্ন করিল, যাবে নাকি?

যাবো বৈ কি। নিমন্ত্রণ জিনিষটা তুচ্ছ করতে পারি আমার এত দর নয়। কিন্তু তুমি?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা তেমন—

তবে, কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনো চিঠির 'পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুকহাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক, বাঙালী মহলে খবরটা জানাজানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কিভাবে ও কোথায়, এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পেঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ জানা কঠিন ছিল না,—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত তাহাদের গম্যস্থানটা আপাততঃ অমৃতসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখেদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙলো বাড়ি তৈরী করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাড়িটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে; এই বাটীতেই দুজনে কিছুকাল বাস করিবে। মালপত্র যাইবে লরিতে এবং পরে শেষরাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি,—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রের ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি?

যাই না। আশ্রমের দোর ত তোমার খোলাই রইল, যবে খুশি দেখা করে যেতে পারবে। কিন্তু আমার ত সে আশা নেই,—শেষ দেখা দেখে আসি গে,—কি বল?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্টই দেখিতে পাইল, সেথায় নানা ছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারায় আজ শুধু একটিমাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে ইহারই সম্মুখে এই একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মত কাপুরুষতা আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ি কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রের বাসায় দ্বিতলের সেই হল ঘরটায় নূতন দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেকগুলো, কোলাহলও কম হইতেছে না। মাঝখানে আশুবাবু, ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জন কয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন—তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল এবং ঘরে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময়ে কলস্বরে সংবর্ধনা করিল,—কমল যে? কখন এলে? অজিত কৈ?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল, যে ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ দেখার হয়ত আর সুযোগে ঘটিত না। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেন নি,—শরীরটা ভাল নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। দেখছিলাম, ধর্মকে ত ফাঁকি দিলেন, কর্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কি না? এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বন্য লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার তার ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই,—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বসিল,—কতটুকুই বা! তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রের কথায়। আর দুটি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগভরে বলিয়া ফেলিল,—এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হলো। কমল ছাড়া ঠিক এমনি কথাটি আর কেউ বলতে পারতো না।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন-শাস্ত্রের কোন্ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এতে পরিস্ফুট হলো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিনতে পার ত?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হলো। চিনতে তুমি পারচ ত অক্ষয়?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওঁর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে, এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিল না, কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিৎ কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিল না, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই শহর থেকে, হয়ত বা এদেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্চেন; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা-কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সংকোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েছ বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা আর নেই। রাজেন্দ্র আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে-ক'টি ছেলে বর্তমান আছে, হরেন্দ্রর অভিলাষ জগতের সোজা-পথেই তাদের মানুষ করে তোলেন। তোমরা সকলে অনেকদিন অনেক কথাই বলেছ, কিন্তু ফল হয়নি। তোমাদের কর্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফলল বুঝি ওর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য হয়ে যাইনি। এইটি অনেক পূর্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই ত। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আবার মনে হয় ভাঙবার প্রয়োজন ছিল না। সকল

ধর্মমতই ত মূলতঃ এক, সিদ্ধিলাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলা। যারা মানে না বা পারে না, তারা না-ই পারল, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ করেই বা লাভ কি? কি বল অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার ত এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হলো না আশুবাবু, বরঞ্চ, হলো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন করে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতাম না। কিন্তু তা ত নয়—আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্মের চেয়েও বড়,—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা যেন হলো, কিন্তু তাই বলে কি তোমার উপমাকেই যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল পরিহাস যে করে নাই তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশী নয়? সকল ধর্মই যে আসলে এক, এ আমি মানি। সর্বকালে, সর্বদেশে ও-সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। মুঠোর মধ্যে ওকে ত পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে—তাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল করে বংশধরের জন্যে রেখে যাওয়া চলে। তাই ত জীবনের প্রয়োজনে ও ঢের বড় সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ ত সবাই জানে, কিন্তু তাই বলে কি মানতে পারে? আপনিই বলুন না অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল। ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাইল না।

আশুবাবু বলিলেন, অথচ তোমরাই যে কমল, আচার-অনুষ্ঠানেই ভারী অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না? তাই ত তোমাকে বোঝা এত শক্ত!

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সামনের পর্দাটা সরিয়ে দিন, আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝতে বিলম্ব হবে না। নইলে, আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি করে? মাঝখানে কুয়াশার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু ত পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্তন। কালের ধর্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতেই চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি বলেই ত। মিথ্যে বলে জানলে মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিথ্যে-শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারাজীবন মেনে মেনেই চলতাম—একটুও বিদ্রোহ করতাম না।

একটু থামিয়া কহিল, ইউরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচর-অনুষ্ঠানে। পুরনোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার পুজো,

ভেতরে গেল না শেকড়, শখের ফ্যাশন গেল দু'দিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এমনি করেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সামলেছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিকমত আজও সার পায় না, মনের মধ্যেটা রহিয়া রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুশকিল এই যে, তুমি ভগবান মানো না, মুক্তিতেও বিশ্বাস কর না। কিন্তু যারা তোমার ওই অজ্ঞেয় বস্তুর সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার-পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেললেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করিনে। সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেল আমি নিজের দুর্বলতাই অনুভব করেছি।

তা হলে ভাল করেন নি হরেনবাবু। বাবা বলতেন, যাদের ভগবান যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশী জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট করে আনলেও লাভ হয় না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাবতেন, দুনিয়ার বয়স থেকে হাজার-দুই বছর মুছে ফেললেই আসবে পরম লাভ। এমনি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলাতের পিউরিটান একদল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুলবে বাইবেলের সত্যযুগ। তাদের লাভের হিসাবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানে না শুধু মঠধারীর দল যে, বিগত দিনের দর্শন দিয়ে চলে যখন বর্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙ্গার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেচি, কিন্তু ভাঙ্গা আশ্রমে বাকী রইলেন যাঁরা তাদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়,—ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল, এবার সে শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে-যুগের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল,—যত উজ্জ্বল হোক, তবু সে ছবি, তার বড় নয়। এমন বই সংসারে আজও লেখা হয়নি আশুবাবু, যার থেকে তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনায় গর্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগকেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগকেও না। রামায়ণ-মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়াও যাবে না। পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি নিয়েই ত মানুষ? তারা যে আপনার চারিদিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতিই তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখোমুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারিনে, তাকেও অন্তরে অবজ্ঞা করিনে। এই গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল শুনেচি, একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল। কিন্তু আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোশাক, মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বললেন, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বৈ কি হে। বল গে, রাতও ত হলো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌঠাকরুণ আসা পর্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয় না। ওঁর ত কোথাও জায়গা ছিল না,—কিন্তু সতীশ রাগ করে চলে গেল।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্তের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ সতীশেরও অন্য উপায় ছিল না। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী,—এ সম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন। কিন্তু আমারই যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভাল হলো সব সময়ে ভেবে পাইনে।

কমল অকুণ্ঠিত-স্বরে বলিল, এই কাজটাই হবে হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্বহ। এই বলিয়া সে পলকের জন্য আশুবাবুব প্রতি চাহিল,—হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু হরেন্দ্রকেই পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকে সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানেব পুজো বারে বারেই ঘাড় হেঁট করে আত্মপুজোয় নেমে আসে। এ-ছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ ত শুধু কেবল নরও নয়, নাবীও নয়,—এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখনি দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও ক্ষোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্যে দুশ্চিন্তা রাখবেন না, হরেনবাবু, ওঁদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিত না, তাই শেষ কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল—আত্মদর্শন। অর্থাৎ আপনাকে নিগূঢ়ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা, সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবাবও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানো না, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না রাখলে তারা একাগ্র

চিত্ত-যোজনার সফল হয় না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার, কমল। এই ত যোগ। আসমুদ্র হিমাচল ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দু-চিত্ত নির্বাতদীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সংকোচে বাধিল। সংকোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়? তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না আশুবাবু, সত্যি নয়। শুধু ত হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই ত কোন-কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যু-বরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাতে জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করেচে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্মচিন্তাই হয় ত এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্বার আসিয়া জানাইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

॥ আটাশ ॥

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্চেন। পরিচিত সকলের বাড়িতেই আপনি এক-আধবার গেছেন, শুধু আমার ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কন্ঠস্বরের পরিবর্তনে নয়, 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করে না, অভিমানও করে না। কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃকপাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি ত কখনো যেতে বলেন নি।

না। সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবে না?

কি করে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্চি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদলালো কি করে? বরঞ্চ, আরও ত কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ তাই হতো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ বুঝলেন কিনা জানিনে—না বোঝাও আশ্চর্য নয়—কিন্তু আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা ত সেই দেড় হাজার বছরের পুরনো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান,—কিছুই ত ব্যত্যয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় ত কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে ওঁদেরও ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে কোন একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মানতে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

না, আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেছেন একবার তাঁকে দেখবেন না?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও প্রশ্ন কেউ করে না। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখাপড়া শেখাবার সময় পায়নি, দরকারও হয়নি। রাঁধাবাড়া, বার-ব্রত, পুজো-আহ্নিক নিয়ে আছে; আমাকেই ইহকাল-পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হলে ওষুধ খেতে চায় না, বলে, স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে, বুঝবে স্ত্রীর আয়ু শেষ হয়েছে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি ত ভাগ্যবান, অন্ততঃ স্ত্রী-ভাগ্যে। এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই, ঠিক জানিনে। হয়ত একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, একটা অনুরোধ করব?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন,—এই সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাববো। আচ্ছা, চললাম—নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দ বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে, এই সেই অক্ষয় এবং মানুষের জানার বাহিরে এইভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্বিঘ্ন শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে। একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা।

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। এ তাহার স্বভাব,—বিশেষ কেহ কিছু মনে করে না। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বলছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষে বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখে না। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিরোধের সৃষ্টি।

কমল বুঝিল, ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিল না যে, উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়। দুর্বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষবেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে কহিলেন, কিছু মনে করো না মা, এ ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রর সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন; কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্যা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা, বেশভূষায় আপ-টু-ডেট। এটুকু ভুললে যে ওঁদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওঁদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ ত করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবে না তা জানি। রাগ আমাদেরি হলো না, শুধু হাসি পেলে। কিন্তু তুমি বাসায় যাবে কি করে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবো?

বাঃ, নইলে যাবো কি করে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু, আর দেরি করাও হয়ত উচিত হবে না, কি বলো।

সকলেরই স্মরণ হইল যে, তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল, হ্যালো। বেটার লেট দ্যান নেভার। একি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলো সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে ত আর দেখা হতো না। আমরা আজ ভোর-রাত্রেই দু'জনে চলে যাচ্চি।

আজই? এই ভোরে?

হাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখানে থেকে আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁহার গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমরা স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হতো আমি দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, বাগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বার বার বলেছি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা-কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব সমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্বত্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে ত আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র করে বাড়ি গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল? কৈ সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান ত মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়াল রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই, কমল। ঐ একই কথা, মা। এই আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার মান বেশী।

সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্বাদ নিষ্ফলে যাবে না।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে ত আসোনি, নীচে চল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এমনি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হলো—যা কখনো করে না।

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া গলা খাট করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে, কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি চুপি জবাব দিল, পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না। কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না, তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনি বিধান।

দ্বারের আড়ালে থাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল আমাকে ভুলো না যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিল না।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসব, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাবো, জীবনের কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেন না। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এইরূপে সে দেখা দেয়, তাকে আর কিছুতেই চেনা যায় না। আর যাই কেন না কর দিদি, অবিনাশবাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজী হয়ো না।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়িতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি কমল। অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষে করো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার। ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেচি, ভালবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু, শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলবো না। আমার ক্ষোভের নিশ্বাসে তোমাদের বিদায়-ক্ষণটিকে মলিন করে দেব না। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল শুধু দু-চারজনের জন্যেই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধদের যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবদের দিন পর্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির

পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম, কাকাবাবু।

ধর্ম? তোমার ও ধর্ম?

কমল কহিল, হাঁ। যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই ত মানুষের মুক্তির পথ। দেখতে পান না কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনি জ্বলচে? তেমনি করেই ছাই করে আনচে? এ নিভবে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বলিয়া উঠিলেন, কমল, মণির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারিনি—তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্বলতা,—কি জানি সে কি, কিন্তু এ-মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানিই সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন। আচ্ছা, আসি। বাসুদেও, চল।

টেলিগ্রাফ-পিওন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরী তার। হরেন্দ্র গাড়ির আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার একটি ছোট সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ—গ্রামের এক ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহমূর্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন্দ্র মূর্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্তা। দুই দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোকে কীর্তনাদি-সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সংবাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ এবং অনাবিল জ্যোৎস্না-রাত্রি সকলের চক্ষেই এক-মুহূর্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দু'দিন। আটচল্লিশ ঘণ্টা। এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলে না?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিছু করতে পারা ত যেতো না, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে চায়নি।

আশুবাবুর যুক্তহাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন্

মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধুই দেশ,—এই ভারতবর্ষটা। তবু বলি, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত করো না। বাসদেও, চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশী বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল, বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত গিয়া সকলের বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন এবং সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়িতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন, চলো…

॥ সমাপ্ত ॥